সুখের সন্ধান

আব্দুল হামীদ ফাইযী

https://archive.org/details/@salim_molla

সুখের সন্ধান

প্রণয়নে ঃ-
আব্দুল হামীদ মাদানী

প্রত্যেক সুখ-সন্ধানী বন্ধুর হাতে
যে চায় সুখী জীবন ও শান্তির সংসার।
প্রত্যেক সেই দুঃখী বন্ধুর হাতে -
যার হৃদয়-মন ও জীবন জুড়ে আছে দুঃখের কালো অন্ধকার;
যার জীবনে হাসি আনয়নকারী হাওয়া ঝড়ে পরিণত হয়েছে।
প্রত্যেক সেই প্রবঞ্চিত বন্ধুর হাতে
যে ঝুটা, ভুয়ো ও কৃত্রিম সুখের পশ্চাতে ছুটে চলেছে।

প্রারম্ভিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

'সুখ স্বপনে, শান্তি মরণে' -এ কথা সত্য না হলেও তা এ বাস্তবতারই দলীল যে, পৃথিবীর বুকে সুখ-শান্তি খুব কমসংখ্যক মানুষই লাভ করে থাকে।

সুখের জীবন দুটি ঃ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পরিপূর্ণরূপে ইহলৌকিক অনাবিল সুখ কারো পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। মুমিন এ জগতে সুখ না পেলেও পরকালের সুখ পাওয়ার আশা করে। পরকালের সুখকে প্রাধান্য দেয়। পরকালের সুখ অনন্ত সুখ। ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী সুখের বাসা নষ্ট করে না।

এই নৈতিক বাস্তবকে মেনে নিয়েই মুসলিমকে সংসার করতে হয়। জীবনের উত্থান-পতনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেই সুখের সন্ধান করতে হয়।

এই পুস্তকটি আমি আমার থেকে বয়োকনিষ্ঠ দুঃখিত, শোকাহত, মর্মাহত, শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, পদদলিত, অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্থ, ভাই-বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সুখের সন্ধান, দুঃখের মাঝে থেকেও সুখের আস্বাদ গ্রহণ কিভাবে সম্ভব তারও সন্ধান দিয়েছি। সুখ অর্জনের জন্য করণীয় কর্তব্য এবং বর্জনীয় চরিত্র সম্বন্ধেও কুরআন-হাদীস এবং সলফে সালেহীন তথা বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীজনের বাণী থেকে বিবিধ আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন আরবী বই-পুস্তক পড়েছি তার জন্য। সুখের নিদ্রা ও আরাম বর্জন করেছি সেই মানসে। বইটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য কিছু মূল্যবান নীতিকথা চয়ন করেছি জনাব মোহাম্মাদ হাদীউয্যামান কর্তৃক সংকলিত 'সাগর সেচা মাণিক' এবং আমার সঞ্চিতা 'মণির খনি' থেকে।

'জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।'

এর দ্বারা যদি তাদের উপকার হয়, যাদের জন্য লিখা, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আর তারই অসীলায় আল্লাহর কাছে আশা রাখব নেক প্রতিদানের এবং ইহ-পরকালের সুখী জীবনের।

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾
﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

বিনীত

আবূ সালমান আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
২৫/৯/২০০৩

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি ও শান্তি প্রত্যেক মানুষের বরং প্রত্যেক প্রাণীর অভীষ্ট ও ঈপ্সিত জিনিস। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচ - প্রতিটি প্রাণীর ধর্ম। সকল মানুষ চায় তার জীবন সুখের হোক। এর জন্য সে মেহনত করে। কষ্ট স্বীকার করে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য। সন্ধান করে শান্তির আধার। রচনা করে সুখের নীড়। কিন্তু সকল মানুষ কি সুখ পায়? অবশ্যই না।

মুমিন ঈমানের মাঝে সুখ চায়। কাফের কুফরীর মাঝে সুখের স্বাদ গ্রহণ করে। মাতাল মদের মাঝে শান্তি কামনা করে। চোর চুরির মাঝে সুখের আশা করে। ব্যভিচারী ব্যভিচারের মাঝে সুখ লুটতে চায়। অর্থোপার্জনকারী অর্থের মাঝে সুখের সন্ধান আছে মনে করে। নেতা তার নেতৃত্বে সুখের খোঁজ করে। ভ্রমণকারী ভ্রমণের মাঝে সুখের আমেজ আস্বাদ করে। কিন্তু সত্যিই কি তারা সুখের অধিকারী হতে পারে?

অধিকাংশ মানুষই সুখী নয়। বেশীর ভাগ মানুষের সুখের স্বপ্ন বাস্তব ও সফল নয়। শান্তির আশা পূর্ণ নয়।

আসলে সুখ তো কোন একটি জিনিসের নাম নয়। সুখের উৎস, কারণ, অবস্থা, কাল ও পাত্র এক নয়। তাই কোন মানুষ এক বিষয়ে সুখী হলেও অন্য আরো কয়েকটি বিষয়ে সে দুঃখী। আর তার মানেই হল সে পরিপূর্ণ সুখী নয়। পরিপূর্ণ সুখী মানুষ দুনিয়াতে আছে কিনা তা অবশ্য বলা মুশকিল।

বাইরে থেকে অনেক মানুষকে দেখে সুখী মনে করা হয়। যাদের সুখের বাগান ফুলে-ফলে সুশোভিত দেখে অনেক মানুষ তাদের মত সুখ কামনা করে অথবা তাদের প্রতি হিংসা করে। কিন্তু তারা কি সত্যপক্ষেই সুখী? যাদেরকে সুখের তারকা মনে করা হয়, তারা কি আসলেই সুখ আকাশের সু-উজ্জ্বল তারকা, নাকি তাদেরও পশ্চাতে রয়েছে দুঃখের কালো অন্ধকার? তারা এমন মানুষ নয় তো, যাদের ব্যাপারে এক উর্দূ কবি বলেন,

"দুনিয়া মেঁ এ্যায়সে ভী কুছ লোগ হোতে হ্যাঁয়,
যো মাহফিলুঁ মেঁ হাঁসতে হ্যাঁয় মাগার তানহাঈ মেঁ রোতে হ্যাঁয়।"

আসলে সুখ হল হৃদয়ের সেই স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ অনুভবের নাম, যা দৈহিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক কল্যাণ বর্তমান ও ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত বলে অনুভূত হয়।

বলা বাহুল্য, মানুষ এ জগতে সুখ অনুভব করে ঃ

১। পূর্ণ ঈমান নিয়ে।
২। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে।
৩। মান, খ্যাতি, যশ ও গৌরব নিয়ে।
৪। নিরোগ দেহ ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে।
৫। ধন ও ঐশ্বর্য এবং হালাল রুযী নিয়ে।
৬। প্রশস্ত বাড়ি ও বিল্ডিং নিয়ে।

৭। পতিব্রতা নারী (স্ত্রী) নিয়ে।
৮। ভালো গাড়ি নিয়ে।
৯। দাস-দাসী নিয়ে।
১০। নেক প্রতিবেশী নিয়ে।
১১। বিশ্বস্ত বন্ধু নিয়ে।
১২। (হিংস্র মানব-দানব ও জন্তু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে) নিরাপদ পরিবেশ নিয়ে।
১৩। বসন্তের মত যৌবন নিয়ে।

এ সব কিছুই পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস। কিন্তু মুসলিমের জন্য পার্থিব জগৎই শেষ জগৎ নয়। মুসলিমের জীবন আরো দীর্ঘ, চিরস্থায়ী। তার দৃষ্টি কেবল পার্থিব সুখ-বিলাসেই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। তার জীবন - বরং আসল জীবন হল মরণের পরপারে। আর সেই জীবনই চিরস্থায়ী অনন্তকালের। তাই তার দৃষ্টিও অতি দীর্ঘ, অতি প্রশস্ত। ভাবনাও লম্বা বা দীর্ঘ দিনের। তাকে শুধু দুনিয়ার সুখেই ক্ষান্ত হলেই চলবে না। বরং দুনিয়াতে সুখ না পেলেও, এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর কয়টি দিনে সুখ না পেলেও পরকালের সুখকে সে কোন মতেই দৃষ্টিচ্যুত করতে পারে না।

বলা বাহুল্য কিছু লোক আছে, যারা পার্থিব জগতের সুখ-সামগ্রী নিয়ে খোশ। আসলে তারা কিন্তু প্রকৃত সুখী নয়।

পক্ষান্তরে আরো কিছু লোক আছে, যারা পরকালের সুখ-সামগ্রী নিয়ে খোশ। তারা ইহকালে সুখ অর্জনে সমর্থ না হলেও, আসলে তারাই কিন্তু প্রকৃত সুখী।

অবশ্য আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ইহকালের সুখ ভোগ করেও পরকালের সুখ লাভ করে। বাস্তবে তারাই কিন্তু পরম ও চরম সুখী।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! তোমাকে সেই পরম ও চরম সুখের কথাই বলব। কারণ, সাময়িক সুখ সুখ নয়। তবে জেনে রেখো যে, সুখ লাভের পূর্বে তোমাকে জানতে হবে সুখের উপায়, পথ ও উৎস। জানতে হবে চিরসুখী থাকার কৌশল।

অতএব সর্বপ্রথম ভেবে দেখ সুখের জিনিস কোন্‌টি?

অতঃপর জানার চেষ্টা কর তা পাওয়ার পথ কি?

তারপর সেই পথে চলতে শুরু করে দাও।

তদনুরূপ সুখের বিপরীত ও শত্রু হল দুঃখ। জীবন থেকে দুঃখ দূর করতে না পারলে সুখ তোমার গৃহে বাসা বাঁধবে না। সুতরাং সেই সাথে ভেবে দেখ দুঃখের জিনিস কোন্‌টি?

অতঃপর জানার চেষ্টা কর তার সাথে সাক্ষাতের পথ কোন্‌টি?

তারপর সেই পথে চলা হতে দূরে থাক। তবেই পাবে খাঁটি সুখের সন্ধান।

প্রিয় বন্ধু! সুখ হল মনের জিনিস। যে নিজেকে সুখী মনে করে না, সে কখনো সুখী হতে পারে না। একমাত্র মনের শান্তিই পারে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে।

আর জ্ঞানী লোকেরা কখনো সুখের সন্ধান করে না, বরং তারা কামনা করে দুঃখ-কষ্ট থেকে অব্যাহতি। অন্ধকার দূর করতে পারলেই যেমন জীবন আলোকিত হয়, তদনুরূপ দুঃখ থেকে রেহাই পেলে সুখ লাভ হয় এমনিই।

মিথ্যা সুখ

পার্থিব কিছু সুখ আছে যা আসলে ভুয়ো ও মিথ্যা। অপরের দৃষ্টিতেও ঐ সুখের সুখীকে প্রকৃত সুখী বলে মনে হয় যে, সেটাই জীবনের চরম সাফল্য। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। যেমন ঃ-

ধনসুখ

অনেকে মনে করে যে, প্রকৃত সুখ আছে ধন-ভান্ডারে। অর্থ উপার্জন করে সিন্দুক ভর্তি করা, ব্যাংক ব্যালেন্স করা অথবা গাড়ি ও বাংলা বাড়ি করা, তলার উপর তলা বিল্ডিং করাই হল সুখের মূল কারণ। শত বিঘা জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান আছে বলে, বড় কারখানা বা দোকান আছে বলে, লোকে এ সবের মালিককে সুখী ভাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যে সুখী তার নিশ্চয়তা কোথায়? সুখ যে মনের জিনিস। মনের ভিতরকার খবর বাহির থেকে কে জানতে পারে?

ধন থাকলেই যে ধনী সুখী তা নয়। কারণ ধনী অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে মেহনত করে, স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, কত কষ্ট পায়।

কষ্ট পায় ধন হিফাযত করতে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় তার সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করে মুনাফা লাভের ফিকিরে।

ধ্বংস ও চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সদা ভীত-শঙ্কিত থাকে।

কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও ধনী মনে শান্তি পায় না। রাত্রে ঠিকমত ঘুমাতে পারে না। ভয় হয়, কখন তার ধনে ডাকাতি পড়ে অথবা সরকারী কোন খপ্পর এসে পড়ে।

বলা বাহুল্য, এ জীবন কিন্তু সুখের জীবন নয়। যে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য নেই, নিশ্চিন্ত ঘুম নেই, চিন্তাহীন আনন্দ নেই, সে জীবন কি সুখের জীবন?

কথায় বলে, মাল জানের কাল। মাল অনেক সময় মানুষকে বিপদে ফেলে, এমনকি জান নিয়েও টানাটানি শুরু করে দেয়। ধনের অহংকার মানুষের পতন ডেকে আনে।

কুরআন কারীমে বর্ণিত কারূনের ইতিহাস তোমার জানা আছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

“---কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, ‘আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমরা পেতাম। প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান!’ আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলল, ‘ধিক্ তোমাদের! যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত তা কেউ পাবে না।’ অতঃপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদ সহ ভূগর্ভস্থ করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল না।” *(সূরা কাসাস ৭৯-৮১)*

যার পরিণাম ছিল এই, তার সুখ কি সুখ বন্ধু?

কিয়ামতের দিন বড় বড় ধনীরা যখন আল্লাহর আযাব দেখে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তারা আফশোস করে বলবে, "আমার মাল আমার কোন উপকারে আসল না।" *(সূরা হা-ক্কাহ ২৮ আয়াত)* বলাই বাহুল্য যে, যে ধন দ্বারা ধনী উপকৃত হতে পারে না, সে ধনে সুখ কিসের?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী মহিলা ক্রিষ্টিনার কাহিনী হয়তো তুমি পড়ে বা শুনে থাকবে। গ্রীসের এই মহিলা পিতার ওয়ারেস সূত্রে মালিক হয়েছিলেন প্রায় পাঁচ শ' কোটি টাকার! এ ছাড়া তিনি ছিলেন সমুদ্র জাহাজের মালিক, একটি দ্বীপের জমিদার। তাঁর ছিল এরোপ্লেন কোম্পানীও। এমন মহিলা নিশ্চয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুখী মহিলা।

কিন্তু না। এত কিছুর মালিক হয়েও তিনি সুখী ছিলেন না। তাঁর মা বাবার নিকট থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে মারা যান।

তাঁর ভাই এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে খেলতে খেলতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মারা যান।

ক্রিষ্টিনা পিতা বেঁচে থাকতেই একজন আমেরিকান পুরুষকে বিবাহ করেন। কিন্তু দাম্পত্য-জীবন সুখের না হওয়ার কারণে কয়েক মাস পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর একজন গ্রীসবাসীয় লোককে স্বামী বলে বরণ করেন। কিন্তু সে স্বামীর সাথেও সুখের সংসার গড়ে না উঠলে কয়েক মাস পরেই তাকেও বর্জন করেন।

অতঃপর কিছুদিন অপেক্ষা করে সুখের সন্ধান করতে থাকেন। ধনকুবের হয়েও স্বামী ছাড়া মহিলার সুখ নেই ভেবেই পুনরায় একজন রাশিয়ান কমিউনিষ্ট পুরুষকে স্বামী বলে বেছে নেন। একজন পুঁজিবাদিনী হয়েও একজন কমিউনিষ্টকে বিবাহ কেন করলেন - এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন, 'তিনি সুখী জীবন চান।'

বিবাহের পর তিনি রাশিয়ায় যান স্বামীর সংসার করতে। অথচ রাশিয়ার আইনে দুটি রুমের বেশী কিছুর মালিক হওয়া যাবে না। সেখানে দাসী রাখা যাবে না। তবুও তিনি দুটি রুমে বাস করেই স্বামী-সংসার করতে লাগলেন। এখানেও সাংবাদিকরা তাঁকে এত সংকীর্ণতা স্বীকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ একই কথা বলেছিলেন, 'আমি মনের শান্তি চাই।'

কিন্তু সুখ-শান্তি তাঁর মনে বাসা বাঁধল না। এক বছর পর সে স্বামীও তিনি ত্যাগ করলেন।

এর কিছুদিন পর ফ্রান্সে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী মহিলা?' উত্তরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী মহিলা। কিন্তু আমিই বিশ্বের সবচেয়ে বেশী হতভাগ্য মহিলা!'

পরিশেষে আবারও সুখের সন্ধানে তিনি ফ্রান্সের একজনকে বিবাহ করেন। চার চারটি দেশের বাছাই করা পুরুষকে বিবাহ করার পরেও তাঁর ভাগ্যাকাশে সুখের তারা ফুটল না। অবশ্য ফ্রান্সের এই ধনীর সাথে বিবাহের পর তিনি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর অল্পদিন পরেই তাকেও বর্জন করেন।

তারপর তিনি অতিবাহিত করেন দুর্ভাগ্যের দুঃখময় জীবন। কিছুদিন পর আর্জেন্টিনার এক শহরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। কি জানি স্বাভাবিক মরণে তাঁর মৃত্যু হয়, নাকি কেউ তাঁকে খুন করে অথবা তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেন?

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী মেয়ে হয়েও ভাগ্যে তাঁর সুখ মিলল না। আসলে সুখ হল সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ধন হলেই যে সুখ হবে, তা জরুরী নয়।

সুখী বন্ধু আমার! ধন থাকলেই যে সুখ থাকবে তা সত্য হলেও তোমার ধন যে নিরাপদে চিরস্থায়ী থাকবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? 'দিয়ে ধন দেখে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ?' মহান রাজাধিরাজ নিজ ইচ্ছায় ফকীরকে বাদশা করেন, বাদশাকে করেন ফকীর। অবহেলিতকে সম্মান দান করে, সম্মানিতকে করেন অপমানিত লাঞ্ছিত। তিনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রুযী দেন। আর যাকে ইচ্ছা আশানুরূপ রুযী দান করেন না। সুতরাং যে ধন আজ আছে কাল চলে যেতে পারে, সে ধনের সাথে সুখ কোথায় বন্ধু?

এক দম্পতি মাংস দিয়ে খানা খাচ্ছিল। দরজায় এক ভিক্ষুক এল। স্বামীর হুকুমে স্ত্রী উঠে গিয়ে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে এল। কিছু দিন পর মনোমালিন্য হয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটল। অতঃপর ঐ মহিলার পুনর্বিবাহ হল। একদিন মাংস নিয়ে স্বামীর সাথে খানা খেতে বসেছে। এমন সময় দরজায় ভিখারীর শব্দ এল। স্বামী হুকুম করল, 'এই মাংস সহ খানা ভিক্ষুককে দিয়ে এস।' স্ত্রী তা দিয়ে এসে স্বামীর সামনে কান্না আর রোধ করতে পারল না। স্বামী বলল, 'কাঁদছ কেন? আমরা তো আল্লাহর দেওয়া রুযী থেকে আল্লাহরই পথে ব্যয় করলাম।' স্ত্রী বলল, 'ভিক্ষুকটা কে জান? আমার প্রথমকার স্বামী! ঐ একদিন এক ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু আজ সে নিজেই ভিখারী!' স্বামী বলল, 'ও, তাই বুঝি? আর ঐ বিতাড়িত ভিক্ষুক কে ছিল তা জান? তোমার বর্তমান স্বামী, আমিই! আল্লাহ যাকে যখন ইচ্ছা ধনী-গরীব করে থাকেন।'

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ। ধন থেকে নিধন হলেও মানুষের মন থেকে সুখ যায় না। এমনও লোক আছে, যারা ধনী নয়। তবুও বড় সুখী। আসলে ধন চাইতে মান বড়। অতএব বন্ধু আমার ধনের ঐ কৃত্রিম সুখকে আসল সুখ মনে করো না। আসলে যার মন ধনী, সেই প্রকৃত ধনী। নচেৎ সারা পৃথিবী পেয়েও তার ধন-পিপাসা মিটবে না। ধনী হয়েও নিজেকে সে দরিদ্র মনে করবে। তাছাড়া একজন দরিদ্র লোক যত বেশী নিশ্চিন্ত, একজন রাজা তত বেশী উদ্বিগ্ন। আর ধনী লোকের ধন তার স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় শত্রু। আর তুমি জান যে, ভালো স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদ বেশী মূল্যবান নয়। তাহলে ধনী হয়ে সুখ কোথায়? ধনের বর্ধনশীল লোভ তোমাকে সুখ দেবে না, স্বস্তি দেবে না। বিশ্রাম দিবে না, বিরতি দেবে না। কারণ,

"এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।"

ধন কামাতে গিয়ে পাপে পড়লে আর এক মুশকিল। পাপ করে সুখ অর্জন করায় কি আসলে সুখ আছে? পাপ করে পয়সা উপার্জন করার চেয়ে একজন স্ত্রীলোকের দাস হওয়া অনেক ভাল। দাস হয়ে সুখ আছে। কিন্তু পাপী ধনী হয়ে মন ও বিবেকের কাছে কারো সুখ নেই। তাছাড়া অনেক সময় পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। আর তখনই যত সুখ দুঃখে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

খ্যাতি সুখ

অনেকে মনে করে যে, যাদের প্রসিদ্ধি আছে, লোকমাঝে যারা খ্যাতনামা তারা অবশ্যই সুখী মানুষ। কিন্তু এমন ধারণা ভুল। কারণ, যে খ্যাতির সাথে আল্লাহর তাকওয়া বিজড়িত থাকে না, সে খ্যাতি সুখ্যাতি নয়। পরন্তু আল্লাহর কোন মুত্তাকী বান্দা মানুষের কাছে খ্যাতি ও লোকমাঝে প্রসিদ্ধি কামনা করে না। যেহেতু মহান আল্লাহ মুত্তাকী ধনী ও সেই সাথে গুপ্ত বান্দাকে ভালোবাসেন। *(মুসলিম ২৯৬৫নং)* তাছাড়া যে খ্যাতির সাথে অকৃত্রিম ভিত্তি যুক্ত নয়, সে খ্যাতি অতি সত্বর অপসারিত হয়। আর খ্যাতি অপসারিত হলেই, খ্যাতি-লোভী মানুষের জীবন থেকে সর্বসুখ বিলীন হয়ে যায়।

অনেক দুনিয়াদার মানুষ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে মনে করে যে, একজন খেলোয়াড় যখন বিশ্বকাপে খ্যাতি অর্জন করে সারা বিশ্বে সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করে, তখন তার জীবন হয় বড় সুখোজ্জ্বল ও তৃপ্তিময়।

কিন্তু এমন ধারণা ভ্রান্ত। যেহেতু অধিকাংশ খেলোয়াড়ই মানসিক কোন না কোন পীড়া নিয়ে কালাতিপাত করে। কেউ তো সফরের পর সফর করে, স্ত্রী-সন্তান হতে দূরে থেকে, খেলার সয়ম বিরোধী টিমের কাছে হার-জিতের টেনসন নিয়ে, আর হারার পর মানসিক পরাজয় নিয়ে কে আর সুখের আস্বাদন পায়?

তাছাড়া শারীরিক ব্যথা-বেদনা নিয়ে, বিশ্বজনমতে নিজের পজিশন টিকিয়ে রাখার টেনসন নিয়ে মনঃকষ্ট বোধ করে থাকে এমন খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়। আর পজিশন নেমে গেলে অথবা খেলা থেকে অবসর নিলে যখন বিশ্ব তাকে ভুলতে বসে, তখন সুখের আমেজ আর কোথায় থাকে?

তদনুরূপ অনেকে ধারণা করে যে, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী বা চিত্র-তারকাগণও বড় সুখী। কিন্তু অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, তাদের জীবন সাধারণ মানুষের চাইতেও অধিক দুঃখময়, তিক্ত ও জ্বালাময়। যাদেরকে আমরা আকাশের উজ্জ্বল তারকা মনে করি, তারা আসলে লোকের চোখে উজ্জ্বল থাকলেও তাদের অনেকের জীবনের আকাশ কিন্তু নিরেট অন্ধকার। বিশেষ করে তাদের দাম্পত্য জীবন বড় তিক্তময়, রহস্যময় ও সন্দেহময়।

বলা বাহুল্য, তারা যে সুখী, তা নয়। আর এ কথা তারা অবশ্যই জানে, যারা তাদের দুনিয়ার সংবাদ রাখে।

বিখ্যাত এক অভিনেত্রী আত্মহত্যা করে মারা যায়। মরার আগে একটি চিঠি লিখে যায় তার বান্ধবীকে। সেই চিঠিতে তাকে উপদেশ দিয়ে অভিনয় জগৎ থেকে দূরে থাকতে বলে। বলে, 'এমন খ্যাতি থেকে সাবধান হও। ---এমন চমক থেকে দূরে থাক, যা তোমাকে ধোকা দেবে। ---আমি হলাম এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় হতভাগিনী নারী। ----আমি 'মা' হতে পারলাম না। ---আমি ভালো ঘরের মেয়ে। ---নারীর জন্য পবিত্র পারিবারিক জীবনই সবচেয়ে উত্তম ও সুখী জীবন। ---পবিত্র পারিবারিক জীবনই নারী তথা মানবতার জন্য সুখের একমাত্র উৎস।'

এক রেডিও সাক্ষাৎকারে একজন শিল্পীকে বলা হল, 'আশা করি আপনি বড় সুখী মানুষ।'

কিন্তু তার উত্তরে সে বলল, বরং আমি জীবনে সুখের স্বাদ চিখতেই পারি নি!'

তারকাদের উজ্জ্বল জীবনে অবৈধ প্রেম ও অর্থ নিয়ে কত যে ক্যালেঙ্কারি, কত যে ঝামেলা-ঝঞ্চট তা পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতে পাই। আর তার মানেই হল, যারা মনে করে খ্যাতিমান তারকারা সুখী মানুষ, তাদের আন্দাজ সঠিক নয়।

ডিগ্রি সুখ

যাদের বড় বড় ডিগ্রি আছে, তারাও কিন্তু সুখী নয়। তারা উচ্চ শিক্ষিত সত্য। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার সনদ তাদের সুখের সার্টিফিকেট নয়।

যাদের চাকুরী নেই, তাদের তো সুখ নেই। যাদের চাকুরী আছে, তারাও যে সুখে খায়, সুখে থাকে, তা নয়।

এই ডিগ্রিতে বিশেষ করে একজন মহিলার সুখ মিলা ভার। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের অনুকূলে যে মহিলা একজন পুরুষের অনাবিল ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতা, সে মহিলার জীবনে আবার সুখ কোথায়?

একজন মহিলা ডক্টর তাঁর সাক্ষাৎকারের শেষে বড় আবেগ ও আফশোসের সাথে বলেন, 'আপনারা আমার সার্টিফিকেট ও ডিগ্রিগুলো নেন এবং আমাকে একজন স্বামী দেন।'

অপর আর একজন মহিলা ডক্টর বলেন, 'ভেবেছিলাম আমার এই উচ্চ ডিগ্রি আমার জন্য পরম সুখ আনয়ন করবে। কিন্তু যখন ত্রিশের ঘর অতিক্রম করে ফেললাম, তখন আমার জীবনে যেন নিরাশার সন্ধ্যা নেমে এল। এখন আমি বলি, আপনারা আমার সার্টিফিকেট ও ডিগ্রিগুলো নিয়ে নিন, আর আমাকে তার বিনিময়ে 'মা' শব্দ শোনার সুযোগ করে দিন!' (আল-য়্যামামাহ ডেলি)

পদ সুখ

রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব এ সব কিছুই যদিও মানুষের জন্য লোভনীয় ও শোভনীয় সুখের জীবন, তবুও তাতে প্রকৃত সুখ নেই। আর এ কথা বিশেষ করে তারা জানে, যারা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করে। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে অনেক সময় নেতৃত্ব হাতছাড়া অথবা বিরোধী দলের হাতে খুন হওয়ার যে একটা আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা নেতাদের থাকে, তাতেই বুঝা যায় নেতারা কত সুখী। আর ভোটের মারকলে গদি উল্টে গেলে তো সুখের স্বপ্নই ভেঙ্গে যায় তাদের। বিভিন্ন দেশের রাজা-মন্ত্রীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস পড়লে ও শুনলে আমরা সে কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি।

নারী-স্বাধীনতায় মহিলার সুখ

কোন কোন মহিলার ধারণা যে, নারী-স্বাধীনতায় তার চরম সুখ রয়েছে। কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর মহিলার মতেই তথাকথিত নারী স্বাধীনতায় কোন সুখ নেই। বরং তাতে নারীর কষ্টই আছে। নারীর শান্তি হল স্বামীর অধীনে চলে পবিত্র সংসার করায়। সেই পরাধীনতায় আছে,

চরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। মুরগীর কোল তা ছেড়ে যেমন ডিম ঘোলা হয়ে যায়, তেমনি নারী স্বামীর আদেশ-অনুমতির বাইরে গেলে নষ্ট হয়ে যায়, কষ্ট পায়। স্বাধীনতায় আনন্দ আছে, সুখ নেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনকুবের মহিলা ক্রিষ্টিনা স্বাধীনতায় কোন সুখ পায় নি। অন্য কোন মহিলাও পেতে পারে না।

আর এ কথা বিদিত যে, আমীর-গরীব, নারী-পুরুষ কেউই স্বাধীন নয়। সকলেই কোন না কোন উর্ধ্বপক্ষের পরাধীন। আর তা না হলেও সকলে আল্লাহর আইনের পরাধীন অবশ্যই।

আর এ কথাও সকলেই জানে যে, মানুষ যদি সকলেই স্বাধীন হয়, তাহলে অবশ্যই আপোসের স্বাধীনতায় সংঘর্ষ বাধবে। একজনের স্বাধীনতা সফল করতে গিয়ে অন্য একজনের স্বাধীনতা অবশ্যই খর্ব হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ হলে অশান্তি সৃষ্টি হবে, শান্তি নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সুখ

অনেক অদূরদশী মানুষ মনে করে যে, পাশ্চাত্যের মানুষরা নিতান্ত সুখী। তাই তাদের অন্ধ অনুকরণ করার জন্য তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু আসলে যে তারা সুখী নয়, তা প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষ মাত্রেরই জানা।

ব্রিটেনের ২০ থেকে ৩৫ বছরের ৮০ শতাংশ মহিলা ধর্ষণের ভয়ে শহরের রাস্তা-ঘাটে একাকিনী চলতে পারে না।

উক্ত বয়সের প্রত্যেক ৪ জনের একজন মহিলা পথে চলার সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যাগে চাকু অথবা অন্য কোন অস্ত্র রেখে চলে।

লন্ডনে ধর্ষণের মাত্রা হল ৫০ শতাংশ, আর অন্যান্য শহরে ২৪ শতাংশ।

আমেরিকায় অপরাধের স্বীকার হওয়ার ভয়ে ছোট বাচ্চাদেরকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হয় না। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সনের মধ্যে শিশুদের প্রতি অপরাধের মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। এ দেশের অর্ধেকের বেশী শিশু স্বীকার করেছে যে, অপরাধের স্বীকার হওয়ার ভয়ে তারা প্রায় সময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

খুন অপরাধের মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশে।

চুরি অপরাধের মাত্রা হল ৫২ শতাংশ।

ধর্ষণ অপরাধের মাত্রা ২৭ শতাংশ।

তালাক হওয়ার কারণে যে সব পরিবারের শিশু কেবল মা অথবা কেবল বাপের কাছে থেকে মানুষ হচ্ছে, সে সব পরিবারের মাত্রা বেশী হয়ে পৌঁছেছে ২০০ শতাংশে!

এ ছাড়া আমরা যদি আত্মহত্যার একটা সমীক্ষা নিই, তাহলে দেখতে পাব যে, ঐ সব দেশেই আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেশী।

সুতরাং বুঝতেই পারছ বন্ধু, সুখের লেবেল লাগানো সমাজে আসলে শান্তি নেই।

দুঃখ কি?

সুখের বিপরীত হল দুঃখ। আর তা হল মনের ব্যাপার। জীবনের প্রত্যেকটি অসাফল্য, প্রত্যেকটি কষ্ট, প্রত্যেকটি আঘাত, প্রত্যেকটি বঞ্চনা, প্রত্যেকটি লাঞ্ছনা এবং প্রত্যেকটি বিপদই হল দুঃখ।

দারিদ্র কিন্তু দুঃখের নাম নয়। যেহেতু দরিদ্র হয়েও সুখী হওয়া যায়। তদনুরূপ খ্যাতি, ডিগ্রি, পদ ইত্যাদি না থাকলেও সুখী হওয়া যায়। অতএব যাদের এসব নেই, তারাই যে দুঃখী মানুষ, তা নয়।

প্রকৃত দুঃখ হল, পাপের দুঃখ। মানুষ যখন পাপ করে, তখন সে সমাজের চোখে ঘৃণিত এবং নিজ বিবেকের কাছে অপরাধী থাকে। আর এমন মানুষ সুখী হতে পারে না।

কিছু জিনিস আসে, যা অল্প হলেও বেশী লাগে। তার মানে অল্পতেই মানুষ কাতর হয়ে পড়ে। আগুন ও শত্রুতা তেমনই দুটি জিনিস। আর অপর দুটি হল দারিদ্র ও দুঃখ-বেদনা।

দুঃখ মানুষের জীবন বৃথা করে। একজন দুঃখী মানুষ জ্ঞানী হতে পারে না। কারণ, দুশ্চিন্তা মানুষের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। অপর দিকে জীবনে কষ্ট না পেলে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। জীবনে যাঁরা বিজ্ঞ হয়েছেন, তাঁদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বেশী ছিল।

দুঃখ আসে মনের গহীন কোণে। আঘাত দেয় অন্তরের অন্তস্তলে। আর দেহের আঘাতের চেয়ে মনের আঘাতের বেদনা খুব বেশী। দৈহিক বেদনার চেয়ে অন্তরের বেদনা অত্যন্ত কঠিন, যার কোন ওষুধ নেই। 'ব্যাধির চেয়ে আধিই হল বড়।'

অন্তরাভ্যন্তরে দুঃখের বরফ জমাট বেঁধে ওঠে। মনের গগণে দুঃখের মেঘমালা ঘনীভূত হয়। অনেক সময় একবার কাঁদতে পারলে সে বরফ গলে যায়, সে মেঘ সরে যায়। কান্নায় অনন্ত সুখ আছে, তাইতো দুঃখের সময় দুঃখী মানুষ কাঁদতে এত ভালোবাসে।

দুঃখ কখনো একা আসে না। সে যখন আসে, তার দলবল নিয়ে আসে। কখনো গোদের উপর বিষফোঁড়া দেখা দেয়। কেউ বা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটান দেয়। কেউ দেয় মড়ার উপর খাড়ার ঘা। কখনো বা কানার পা খালে পড়ে। কখনো বা যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। কেউ বা আগুনে ঘি ঢালে। বিপদে দেখে শত্রু হাসে। হাতি যখন কাতে পড়ে, চামচিকেতেও লাথি মারে। কিন্তু এ সবই সয়ে নিতে হয়, সহসায় বরণ করে নিতে হয় দুঃখী মানুষকে।

যাদের জীবনে দুঃখই সম্বল, দুঃখই কম্বল, চিরকাল যারা দুঃখই পেতে থাকে, দুঃখেই যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে?

দুঃখ কেন আসে?

মহান সৃষ্টিকর্তা কিছু মানুষ দ্বারা কিছু মানুষকে সাহায্য করে থাকেন। গরীব-দুঃখীদেরকে সাহায্য করেন ধনী ও সুখীদের মাধ্যমে। তাদেরকে সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুখের আস্বাদন গ্রহণ করিয়ে থাকেন। যেহেতু সুখের সাগরে ডুব দিয়ে দুঃখকে উপলব্ধি করা যায় না।

'যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার মত,
শুনে না শুনিবে বুঝে না বুঝিবে
জানাইব আমি যাতনা যত।
চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?'

বলা বাহুল্য, মহান সৃষ্টিকর্তা তাই তার চিরসুখী বান্দাকে কখনো কখনো দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে থাকেন।

দুঃখ আসে কৃত পাপের কারেন্ট্ শাস্তি স্বরূপ। খাঁচার বাঘ যদি বেশী গুঁতাগুঁতি করে, তাহলে সে তো খাঁচার শিক ভাঙতে পারে না। আর তার বাড়াবাড়ি দেখে তার খাবার কমিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর দুনিয়া-খাঁচায় বাস করে মানুষ যদি বাড়াবাড়ি করে তবে তার সমস্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

দুঃখের বোঝা বহন করতে হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। তাতে বান্দার পাপক্ষয় হয়। বিপদ বান্দার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং তখন তাকে বর্জন করে, যখন তার জীবনে আর কোন পাপ থাকে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮- নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

দুঃখ দিয়ে বান্দার ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এমন ভীষণ কঠিন পরীক্ষা যে, তাতে বান্দার পাশ করা মুশকিল হয়ে যায়। একটি মানুষ অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়ে মানুষের অনুগ্রহের দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে বড় আশা নিয়ে বড় হয়। কিন্তু সমাজে অন্ধের আর কি বৃত্তি আছে যে, তার জীবন চলবে অনায়াসে। অন্ধের যষ্ঠি থাকলেও কিছু করতে পারত। কেউ অনুগ্রহ করে সওয়াবের আশায় তাকে কাছে টেনে নিলেও ভাগ্য দূরে ঠেলে দেয়। কোন পুণ্যময়ী তাকে জীবন-সাথী বলে মেনে নিয়ে তার দুঃখের সহায়িকা হবে বললেও, তকদীর তার পরীক্ষা আরো কঠিন করে। দেখা যায়, তাদের ঔরষে জন্ম হয় মেয়ের পর মেয়ে। লাঠি স্বরূপ একটা ছেলে হলে কষ্ট অনেকটা লাঘব হত। কিন্তু তা হলে পরীক্ষার খাতা খালি থেকে যায়। আর হয়তো বা ছেলের তুলনায় মেয়েই তার জন্য মঙ্গলময়। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝার উপর বোঝা চেপে বসে মাথার উপর। কথায় বলে, 'অদৃষ্ট করলা ভাতে, বীচি কচ্কচ্ করে তাতে, পড়ল বীচি বুড়োর পাতে।'

দেখা যায়, সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল যুবক হঠাৎ করে মারা গিয়ে মা ও ছোট ছোট ভাই-বোনদেরকে দুঃখ ও শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

দেখা যায়, কোন যুবতীর বিবাহ হয় না। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও বহু কষ্টে বহু খরচ-খরচার পরে যদিও তার বিবাহ হয়, তবুও তকদীর তার দুঃখের অন্ধকার ঘুচায় না। স্বামী কোন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। আর চাওয়া জিনিস পাওয়ার পর যদি তা হারিয়ে যায়, তাহলে তার আঘাত যে কত বড়, কত বেদনাময় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানবে?

যার যত বড় ঈমান, তার তত বড় পরীক্ষা ও দুঃখ হয়। যে যত উঁচু হয়, তাকে তত বেশী ঝড়ের মোকাবিলা করতে হয়। স্বর্ণকে আগুনে দিয়ে তার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা হয়। আগুনে পোড়ালেই ধূপ তার সুগন্ধ বিতরণ করে।

"আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
দেয় না আলো আমার এ দীপ আগুন দিয়া না জ্বালালে।"

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

দুঃখ আসে মুমিন বান্দার মর্যাদাবর্ধনের জন্য। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এইভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!" *(আহমদ, সহীহ আবু দাউদ ২৬৪৯ নং)*

দুঃখ আসে মানুষকে নতুন করে গড়ার জন্য। গাফলতি থেকে সতর্ক করার জন্য, নিদ্রাভিভূতকে জাগ্রত করার জন্য, উদাসীন মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য। 'মহান আল্লাহ কখনো কখনো মানুষের চক্ষুকে অশ্রু দ্বারা ধুয়ে দেন; যাতে সে তাঁর বিধি-বিধান সঠিকভাবে পড়তে পারে।' মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর দু-একবার বিপর্যস্ত হয়? এর পরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। *(সূরা তওবা ১২৬ আয়াত)*

বালা-মসীবত মানুষকে কষ্ট দিতে আসে না, আসে নব আকারে সুশোভিত করতে। স্বর্ণকার স্বর্ণকে এবং কর্মকার লোহাকে আগুনে দিয়ে আঙ্গার করে হাতুড়ি দিয়ে পিটায় তা নষ্ট করে ফেলে দেওয়ার জন্য নয়; বরং তা দিয়ে নতুন করে কোন অলংকার, কোন অস্ত্র বা কোন পাত্র গড়ার জন্য। আর এ জন্যই দুঃখ মানুষের জীবনে নতুনত্ব আনে। মানুষ শুরু করে জীবনের নতুন পাতা, নব অধ্যায়। মানুষের পতন অনেক সময় সত্যকে উপলব্ধি করতে সহযোগিতা করে। দুঃখ-কষ্ট অনেক সময় তুচ্ছ মানুষকে বড় মানুষ করে তোলে।

আর এ জন্যই মুমিন বান্দার জন্য দুঃখ কোন সময়ই দুঃখ নয়। বরং যেমন সুখ আল্লাহর তরফ থেকে আসা অনুগ্রহ, তদনুরূপ দুঃখও। যে কোনও বিপদ আপাতদৃষ্টিতে বিপদ মনে হলেও তা আসলে বিপদ নয়। তার দুর্ভাগ্য অনেক সময় সৌভাগ্যের মূল। মসীবতে অনেক সময় মানুষের জন্য আযাবের লেবাসে রহমত থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন (তাদের মঙ্গল চান), তখন তাদেরকে বিপন্ন করেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৭০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "মু'মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।" *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

মুমিনের জন্য ধৈর্য হল আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক বড় নিয়ামত ও দান। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

দুঃখ দিয়ে মহান আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে গুণগান শুনতে চান। খাঁচার ভিতরে বন্দী পাখীর মধুর কণ্ঠ শুনতে চাইলে তাকে খাবার না দিয়ে ভোকে রাখলেই তো বলতে শুরু করবে।

কথিত আছে যে, একদা মূসা ﷺ আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন যে, কি ভালোই না হত, যদি পৃথিবীতে ৪টি জিনিস থাকত এবং অপর ৪টি জিনিস না থাকত; যদি অনন্ত জীবন থাকত এবং মরণ না থাকত। যদি জান্নাত থাকত এবং জাহান্নাম না থাকত। যদি সচ্ছলতা থাকত এবং দরিদ্রতা না থাকত। যদি সুখ থাকত এবং অসুখ না থাকত।

তখন মহান আল্লাহ মূসা ﷺ-কে অহী করে জানালেন যে, "হে মূসা! যদি অনন্ত জীবন থাকত এবং মরণ না থাকত, তাহলে আমার দর্শন লাভ কিভাবে হত? যদি জান্নাত থাকত এবং জাহান্নাম না থাকত, তাহলে আমার শাস্তিকে কে ভয় করত? যদি সচ্ছলতা থাকত এবং দরিদ্রতা না থাকত, তাহলে আমার শুকরিয়া জ্ঞাপন কে করত? আর যদি সুখ থাকত এবং অসুখ না থাকত, তাহলে আমাকে স্মরণ কে করত?"

বিপদ এসে অনেক সময় আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেন মহান

আল্লাহ। বঞ্চনায় আমরা দুঃখ পাই ঠিকই, কিন্তু সেই বঞ্চনায় থাকে আমাদের বিপদ থেকে মুক্তি। ছোট শিশু পানির ভিতরে পাখির ছায়া দেখে তা ধরার জন্য 'উই-উই' করে। কিন্তু তাকে ঐ নকল পাখি খানাকে ধরার সুযোগ দিলে সে চরম বিপদে পড়বে। পাখি তো সে পাবেই না, শেষে প্রাণও হারাবে।

আসলে বিপদ আসে আল্লাহর তরফ থেকে, আল্লাহর লিখিত তকদীর অনুসারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ খুবই সহজ। *(সূরা হাদীদ ২২ আয়াত)*

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না। *(সূরা তাগাবুন ১১ আঃ)*

তাই বিপদের সময় আর্তনাদ করে যে অস্থির হয়, সে যেন তীর-ধনুক নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

শেখ সা'দী বলেন, 'সৃষ্টিজগৎ থেকে যদি কখনো কোনও আঘাত লেগে থাকে, তাহলে তাতে দুঃখ করো না। কেননা, মূলতঃ সুখ-দুঃখ সৃষ্টির কাছ থেকে আসে না; আসে আল্লাহর তরফ থেকে। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইঙ্গিতে সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে ছুটলেও জ্ঞানীরা তীরকে নয়; বরং ধনুকধারীকেই দায়ী মনে করে থাকেন।'

কিন্তু কিছু বিপদ আসে মানুষের কৃতকর্মের ফলে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের স্বকৃত কর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মাফ করে দেন। *(সূরা শূরা ৩০ আয়াত)*

দুঃখী বন্ধু আমার! 'একমাত্র মানুষই কাঁদতে কাঁদতে জন্মায়, অভিযোগ করতে করতে বাঁচে, আর আক্ষেপ করতে করতে মরে।' 'মনুষ্য-জীবন মনোরম গোলাপের মতন। তার চতুর্দিকে শুধু কাঁটা আর কাঁটা।' অতএব তোমার জীবনে দুঃখের কাঁটা থেকে থাকলে সেটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার ভাই। আসলে 'প্রকৃত দুঃখ থেকেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়ে থাকে।' মানুষের সুখের জন্য দুঃখের মত এত বড় পরশপাথর আর নেই।

তবে বন্ধু আমার! আনন্দ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো না এবং কষ্ট পেয়েও নিরাশ হয়ো না। কারণ, 'অনেক আনন্দের মধ্যে বেদনা, অনেক বেদনার মধ্যে আনন্দ লুকিয়ে থাকে।'

ধৈর্য ধর

দুঃখ-পীড়িত বন্ধু আমার! দুঃখ আসার আগে খবরদার দুঃখ কামনা করো না। দুঃখ আসার আগে আল্লাহর কাছে ধৈর্য চেয়ো না। বরং তাঁর কাছে সরাসরি সুখ কামনা কর। আর দুঃখ যদি এসেই থাকে তাহলে ধৈর্য ধর। তাছাড়া আর উপায় কি বল?

মসীবত টালার, দুঃখকে সুখের বাগানে পরিণত করার ক্ষমতা তোমার আছে কি? যদি না থাকে, তাহলে ধৈর্য না ধরলে আর কি করতে পার বন্ধু?

দুঃখের পথে ধৈর্য যদি তোমার সম্বল না হয়, অশান্তির কন্‌কনে শীতে সবর যদি তোমার কম্বল না হয়, বর্ষণশীল কষ্ট-মেঘের মুষলধারার বৃষ্টিতে ধৈর্য যদি তোমার বর্ষাতি না হয়, দুঃখের তীর-তরবারি-বর্শার মোকাবিলায় ধৈর্য যদি তোমার ঢাল না হয়, তাহলে বল তুমি কি টিকতে পারবে, বাঁচতে পারবে?

দুঃখী বন্ধু আমার! ধৈর্যের তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা ছাড়া দুঃখের আর কোন ওষুধ নেই। আর দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাছে দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয় না।

ধৈর্য ধর। আর জেনে রেখো যে, তোমার ধৈর্য হবে কেবল আল্লাহর সাহায্যেই; তাঁরই তওফীক ও প্রয়াস দানের ফলে। ধৈর্য ধর তোমার প্রতিপালকের মহব্বতে, তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায়। ধৈর্য ধর আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এক করে।

ধৈর্য ধারণ কর এই আশা নিয়ে যে, কষ্টের পর আসান আছে, দুঃখের পর সুখ আছে, অমাবশ্যার পর পূর্ণিমা আছে, রাত্রির পর সকাল আছে, বর্ষার পর ফর্সা আছে, আর আল্লাহর উপর তোমার ভরসা আছে। অতএব বেদনা তোমার বিদূরিত হবেই। পরাজয়ের পর আবার বিজয় আসবেই। সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা আসবেই। যেহেতু মহান প্রতিপালক বলেন, "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।" *(কুরআন ৯৪/৫-৬)*

কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও মনের বাইরে তা প্রকাশ না করে নিজেকে সামলে নেওয়া, কোন প্রকার অভিযোগ ও প্রতিবাদ না করা এবং তার সাথে সেই কষ্ট দূর হয়ে যাওয়ার আশা করার নাম হল ধৈর্য।

গায়রুল্লাহর কাছে বিপদের অভিযোগ আনা থেকে জিহবাকে, ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে মনকে এবং কপাল, গাল বা বুকে আঘাত করা বা চুল অথবা কাপড় ছিঁড়া থেকে হাতকে বিরত রাখার নাম হল ধৈর্য।

ধৈর্য হল, ভ্রূ কুঞ্চিত বা মুখ বিকৃত না করেই অতি তিক্ত কিছু পান করার নাম। ধৈর্য বলা হয়, বিপদের সময় অনুচিত কর্ম করা থেকে দূরে থাকা, বালার তিক্ত পিয়ালা পান করার সময় কোন প্রকারের তিক্ততা প্রকাশ না করা এবং অভাব ও দারিদ্র নিষ্পিষ্ট করলেও জীবন-যাপনে ধনবত্তা প্রকাশ করাকে।

যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দৈন্য সহ্য করেও আল্লাহর আদেশের উপর অটল থাকার নাম ধৈর্য।

অপরের প্রতি দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকার নাম ধৈর্য।

দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করার যে শক্তি, সেটিকে মন্দের প্রতি যে প্ররোচিত করে, সেই শক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার নামই ধৈর্য।

ধৈর্য হল মনের লাগাম। যা মানুষের সেরকশ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মনের কুপ্রবৃত্তি, কাম ও কামনার উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ব্রেকের কাজ করে এই ধৈর্য।

দেহের সঙ্গে মস্তকের যেমন সম্পর্ক, ঈমানের সঙ্গে ধৈর্যেরও ঠিক তেমনি একটা সম্পর্ক আছে। যে মানুষের ধৈর্য আছে, সে মানুষ সুখী এবং ভাগ্যবান। ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা মানুষকে সুষমামন্ডিত করে গড়ে তোলে।

নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হলে অথবা শারীরিক রোগ-বালা হলে অথবা হঠাৎ কোন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে অথবা দাওয়াত বা জিহাদের ময়দানে শত্রুর সম্মুখীন হলে অথবা কোন অত্যাচারীর অত্যাচারের শিকার হলে অথবা পারিবারিক কোন ঝঞ্ঝাটের শিকার হলে অথবা আপনজন কেউ হারিয়ে গেলে ধৈর্যের দরকার। যেমন ধৈর্যের দরকার ষড়্‌রিপুর তাড়নার কাছে।

ধৈর্য ধারণ করা কোন আদর্শভিত্তিক কাজ নয়। বরং তা একটি ওয়াজেব কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)*

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না; করলে তোমরা সাহস (শক্তি) হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের মনোবল বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" *(সূরা আনফাল ৪৬ আয়াত)*

বিপদগ্রস্ত বন্ধু আমার! ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধারণ করার তাকীদ দেন তোমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রুযীদাতা। কুরআন কারীমের প্রায় নব্বই জায়গাতে ধৈর্যের কথা আলোচনা করেছেন তিনি। আর ধৈর্য ধারণ করলে তুমি নানা সুফল পাবে। যেমন ঃ-

(১) ধৈর্য ধরলে বিপদে সাহায্য পাবে। দুঃখ, বিপদ ও পরীক্ষার দুনিয়ায় ধৈর্যই হবে তোমার সহায়ক। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। বিনীতগণ অন্য সকলের জন্য নিশ্চিতভাবে তা কঠিন কাজ। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং ধন-প্রাণ

ও ফল-ফসলে নোকসান দিয়ে পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দাও; যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।) এই সকল লোকেদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশিস ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫- ১৫৭ আয়াত)*

(২) ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর মুত্তাকী, পরহেযগার ও নেককার লোকদের একটি মহৎ গুণ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾

অর্থাৎ, পুণ্য আছে----- (ঈমান ও ইসলামের বিভিন্ন কাজে) এবং দুঃখ-কষ্ট ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী (মুত্তাকী)। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ নেক লোকদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।" *(সূরা হূদ ১১৫ আয়াত)*

(৩) ধৈর্যে রয়েছে শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার উপায়। ধৈর্যে আছে বিজয়ের সুসংবাদ। শক্তির চেয়ে ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী সফলতা আনতে পারে।

﴿ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا

يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা (শত্রুরা) দুঃখিত হয়, আর অমঙ্গল হলে তারা আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। *(সূরা আলে ইমরান ১২০ আয়াত)*

(৪) ধৈর্য অবলম্বনের ফলেই মানুষ নেতৃত্ব ও উন্নতি লাভ করতে পারে। অধৈর্য মানুষরা নেতৃত্ব দিতে পারে না। ধৈর্যহীনরা কোনদিন কোন প্রতিষ্ঠান বা জামাআতের সম্পাদক, পরিচালক, আমীর বা নেতা হতে পারে না। দুনিয়ায় যারা ধৈর্য ধরেছে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওরা যখন ধৈর্যশীল হয়েছিল, তখন আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম; যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। আর ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। *(সূরা সিজদাহ ২৪ আয়াত)*

(৫) ধৈর্যশীল ব্যক্তি মহান প্রতিপালক আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৬ আয়াত)*

অতএব বিপদ এলে অধৈর্য হতে হয় না, হতে হয় না আল্লাহর প্রতি ক্ষুব্ধ। প্রকাশ করতে হয় না তাঁর প্রতি কোন প্রকার রাগ। করতে হয় না তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা অভিযোগ। কারণ, "বালা যত বড় হয়, তার প্রতিদানও হয় তত বড়। অবশ্যই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি সেই জাতিকে বালা দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে, তার লাভ হয় (তাঁর) সন্তুষ্টি। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, সে পায় (তাঁর) অসন্তুষ্টি।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)* আর 'যারা বিপদকালে অধৈর্য হয়, আসলে তারা আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করে।'

(৬) মহান আল্লাহ হন ধৈর্যশীলদের সাথী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫ আয়াত)*

(৭) ধৈর্যশীলদের প্রতিদান ডবল। তাদের বদলা হল জান্নাত।

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "ওদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল, ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে এবং আমি ওদেরকে যে রুযী দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। *(সূরা ক্বাসাস ৫৪ আয়াত)*

﴿ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾

অর্থাৎ, আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। (সূরা দাহর ১২ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, "--- এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, নামায কায়েম করে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে - এদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; স্থায়ী (আদন) বেহেশ্ত। ওতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তারাও। ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে উপস্থিত হবে এবং বলবে, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। এ পরিণাম কত সুন্দর!' *(সূরা রা'দ ২২-২৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "যারা ঈমান এনে নেক কাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সৎকর্মপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।" *(সূরা আনকাবূত ৫৮-৫৯ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, ধৈর্য ধারণ করার বিনিময় হল বেহেশ্ত। বিশেষ করে কোন শিশু-সন্তান মারা গেলে তার উপর ধৈর্যধারণ করার প্রতিদান ও মাহাত্ম্য বেশী।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে মুসলিমের তিনটি শিশু-সন্তান মারা যাবে সে আল্লাহর কসম বহাল

রাখার মত সামান্য ক্ষণ ছাড়া জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, وإن منكم إلا واردها অর্থাৎ, তোমাদের (দোযখের) উপর দিয়ে যেতে হবে। এ তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(সূরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত, বুখারী ১২৫১নং, ফাতহুল বারী ৩/ ১৪৮, মুসলিম, প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "যে মহিলার ৩টি শিশু-সন্তান মারা যাবে সে মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা-স্বরূপ হবে।" একজন মহিলা বলল, 'আর দু'জন হলে?' তিনি বললেন, "দু'জন হলেও।" *(বুখারী ১২৪৯নং, মুসলিম, প্রমুখ)*

আর এ জন্যই শিশুর জানাযায় আমরা এই বলে দুআ করি, 'হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিরূপে ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও।' *(শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী, বুখারী)*

তবে হ্যাঁ, পরকালে বিনিময় নেওয়ার জন্য ঈমানের সাথে শর্ত হল দুটি; ধৈর্য এবং সওয়াবের আশা। সওয়াবের আশা ও নিয়ত না থাকলে তা পরকালে পাওয়া যাবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর মুমিন বান্দার জগদ্বাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (সন্তান)কে তুলে নেন; কিন্তু এর ফলে সে তাতে ধৈর্য ধরে ও সওয়াবের আশা রাখে, তখন তিনি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব প্রদান করতে পছন্দ করেন না।" *(নাসাঈ, আহকামুল জানায়েয ২৩ পৃঃ)*

মহানবী ﷺ-এর নাতি ইন্তিকাল করলে এক সাহাবী দ্বারা কন্যাকে সালাম দিয়ে এবং এই বলে পাঠালেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তো তাঁরই ছিল। আর যা দিয়েছিলেন তাও তাঁরই ছিল। (জন্ম-মৃত্যু) সব কিছুই তাঁর নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসারে ঘটে থাকে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশা রাখে।" *(বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ৯২৩নং, আহমাদ ৫/ ২০৪, ২০৬, ২০৭, প্রমুখ)*

রোগ-বালাতে ধৈর্য ধারণ করলেও বেহেশ্ত্ পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেশ্ত্ দান করি।" *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

একদা এক মহিলা এসে মহানবী ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মূর্ছা (মৃগী/জিন পাওয়া) রোগ আছে। আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যাতে তিনি আমার এ রোগ ভালো করে দেন।' মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি চাইলে সবর কর, তার জন্য তুমি বেহেশ্ত্ পাবে। আর যদি তা না চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করি, যাতে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন।"

মহিলাটি বলল, 'বরং আমি সবর করব। কিন্তু সে সময় আমি বেপর্দা হয়ে যাই। তার জন্য আপনি দুআ করুন, যাতে আমি তা না হই।' তিনি তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী৫৬৫২, মুসলিম ২৫৭৬নং)*

প্রিয় বন্ধু আমার! তুমি যদি তালেবে ইল্ম, আলেম বা দ্বীনের আহবায়ক হও এবং ইল্মের পথে চলার দরুন কষ্ট পাও, কারো কাছে ব্যথা পাও, মন বেদনাহত হয়, তাহলে ধৈর্য অবলম্বন কর। চলার পথে তুমি একাকী হলে তোমার সাথী হবেন মহান আল্লাহ। ঐ দেখ না, সওর গুহায় শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ব্যাকূল স্বরে আবূ বাক্র ؓ যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-

কে বললেন, 'ওদের কেউ যদি তার নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাদেরকে দেখে নেবে।' কিন্তু শতমুখী ভরসা ও আস্থা নিয়ে মহানবী ﷺ বললেন, "আমরা তো কেবল দু'জন নই।

﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾

অর্থাৎ, তুমি দুশ্চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। *(সূরা তাওবাহ ৪০ আয়াত)*

অতএব ভয় কিসের তোমার? তোমার বিপদ বা কষ্ট কি নবীদের থেকে বেশী? না তা তো হতেই পারে না। মহান আল্লাহ তাঁর মহানবীকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ। আর ওদের বিষয়ে ত্বরা করো না। *(সূরা আহক্বাফ ৩৫ আয়াত)*

কষ্ট বরণ করে গেছেন নূহ নবী, সহ্য করেছেন আগুনে পড়ে ইব্রাহীম নবী, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ইসমাঈল নবী যবেহ হতে গিয়ে, কত শত কষ্ট স্বীকার করেছেন যাকারিয়া, মূসা, ঈসা এবং আরো সকল আম্বিয়াগণ। কত কষ্ট সহ্য করে শত ধৈর্য ধারণ করে গেছেন আয়্যুব নবী; মহান আল্লাহ তাঁর কথা বলেন,

﴿ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীলরূপে। কত নেক বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। *(সূরা স্বাদ ৪৪ আয়াত)*

ইউসুফকে তাঁর ভাইরা যখন কুঁয়োতে ফেলে দিয়ে তাঁর জামায় মিথ্যা খুন লাগিয়ে নিয়ে এসে পিতা ইয়াকুবকে খবর জানাল, তখন তিনি বললেন,

﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, বরং তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লহই আমার সাহায্যস্থল। *(সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াত)*

পুনরায় রাজা হওয়ার পর আপন ভাই বিনিয়ামিনকে ইউসুফ বিশেষ কৌশলে আটকে রাখলেন, তখন তাঁর ভাইরা পিতাকে এসে বলল যে, বিনিয়ামিন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে, তখনও তিনি বললেন, "বরং তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ ওদের উভয়কে এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(ঐ ৮৩ আয়াত)*

তেমনি ধৈর্য ধরলেন ইউসুফ কুঁয়োতে, ধৈর্য ধরলেন মাতা-পিতা ও আপন ভাই-এর বিচ্ছেদে, ধৈর্য ধরলেন আযীযের রাজ-প্রাসাদে রাণী যুলাইখার প্রেম নিবেদনের মুহূর্তে এবং ধৈর্য ধরলেন কারাগারে। ফলে সকলেই সেই ধৈর্যের সুফল পেলেন। লাভ করলেন পরম সুখ ও চরম তৃপ্তি এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। এই সকল ধৈর্যের স্কুল-কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করে পরিশেষে জেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থমন্ত্রী হয়ে পাশ করে বেরিয়ে

এলেন। এই দীর্ঘ ধৈর্যের প্রতিফল স্বরূপ তিনি ঐ দেশের মন্ত্রীত্ব পেলেন।

ধৈর্যচ্যুত হননি ইউনুস নবী। মাছের পেটে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন, তবুও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অভিযোগ আনেন নি। বরং ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলেছিলেন,

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

তাঁর মত ক্ষুব্ধ না হয়ে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে আমাদের নবী ﷺ-কে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلۡحُوتِ إِذۡ نَادَىٰ وَهُوَ مَكۡظُومٞ ٤٨ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছ-ওয়ালা (ইউনুসের) মত অধৈর্য হয়ো না। সে বিষাদ-আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। *(সূরা ক্বালাম ৪৮ আয়াত)*

আমাদের নবী ﷺ ধৈর্য ধরলেন তায়েফে, বদর, উহুদ ও আরো যুদ্ধ ক্ষেত্রে। উক্ববাহ বিন আবী মুআইত্ব তাঁর পিঠে/ঘাড়ে উঁটনীর ফুল চাপিয়ে দিলে, উম্মে জামীল তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখলে, কুরাইশদের আরো কত শত নিপীড়নের সামনে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। দাওয়াতের কাজে কত লোকের কথার বাঁধুনির বিঁধুনিতে তিনি ধৈর্য ধরেছেন। তাঁকে লোকেরা যাদুকর, কবি ও পাগল বলে ব্যথা দিয়েছে। তাঁকে ধৈর্য ধরতে আদেশ করেছেন তাঁর প্রতিপালক।

﴿ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠ ﴾

অর্থাৎ, লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। *(সূরা মুয্যাম্মিল ১০ আয়াত)*

তিনি আরো নির্দেশ দিয়ে বলেন, "যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহর সাহায্যে। ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকেন যারা মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ। *(সূরা নাহল ১২৮নং)*

ধৈর্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে সূরা আসরে মহান আল্লাহ বলেন, "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"

দ্বীনের কাজে ধৈর্যশীলতা প্রয়োগ করলে তার ফল ফলে সুন্দর। যেহেতু ধৈর্য বড় তিক্ত, কিন্তু তার পরিণাম ভারী মধুর। বৃক্ষের ছাল তিক্ত হলেও তার ফল বড় মিষ্টি। ধৈর্য ধরা খুব কঠিন হলেও তার পরিণাম বড় শুভ।

অতএব চেষ্টা করে দেখ, তোমাকে কেউ চড় মারলে, তার বিনিময়ে চড় না মেরে তার হাতে ব্যথা লেগেছে কি না জিজ্ঞাসা কর। তোমার পথে যে কাঁটা বিছায়, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার

বাড়িতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সান্ত্বনা দাও। যে তোমাকে গালি দেয়, তার বোঝা বয়ে দাও। দেখ না তাতে ফল কি দাঁড়ায়?

সিরিয়ার একজন আলেম একজন ধনীর কাছে মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে হাত পাতা মাত্র তার হাতে সে থুথু মারল। আলেম সেই থুথু বুকে লাগিয়ে নিয়ে বললেন, 'এটা হল আমার প্রাপ্য, আল্লাহর জন্য কি?' তারপর আবার হাত পাতলেন। এবার অহংকারী লজ্জিত হয়ে বলল, 'মসজিদের সকল খরচ আমার দায়িত্বে।'

বলা বাহুল্য, উক্ত আলেমের ধৈর্য বৃহৎ ফল দিল। নচেৎ চাঁদা করেও হয়তো ঐ বড় মসজিদ সম্পন্ন করতে পারতেন না।

তদনুরূপ একজন দ্বীনের আহবায়ক আমেরিকায় গিয়ে এক সউদীকে নামাযের দাওয়াত দিলে সে তাঁর মুখে থুথু মেরে তার দরজা ছেড়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু ধৈর্যশীল আহবায়ক সেই থুথু মুখে মেখে নিয়ে বললেন, 'আল-হামদু লিল্লাহ! এ তো আল্লাহর নবীর পোতাদের (আওলাদে রসূলের) মক্কা-মদীনার থুথু।'

এ কথা শুনে সউদীর মনে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। চট্ করে বলল, 'আমাকে মাফ করে দিন। রাগের বশে ভুল করে ফেলেছি।'

আহবায়ক বললেন, 'মাফ করব একটি শর্তে, নচেৎ না। আপনাকে আমার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে হবে।'

হলও তাই। কেবল এত বড় ধৈর্য ধারণের ফলে একটি লোক নামায ত্যাগের কুফরী থেকে বেঁচে গেল। আসলে যার ধৈর্য আছে, সে সব কাজেই হুঁশিয়ার হয়।

মানুষ ধৈর্য ধরতে পারে না বলেই রেগে যায়, গরম হয়, মারপিট করে, ভাঙচুর করে, তাড়াহুড়া করে, বিরক্ত হয় ও করে, জ্বালাতন করে ও জ্বলে, অত্যাচার করে, লোকের ক্ষতি করে।

কিন্তু বন্ধু আমার যে তোমার থেকে সর্বদিক দিয়ে নিচু তার উপর ধৈর্য ধরা প্রকৃত ধৈর্য ও সহনশীলতা, যেখানে সত্য বললে তোমার ক্ষতি হবে, সেখানে সত্য বলাই প্রকৃত সত্যবাদিতা। যার কাছে কিছু আশা কর না এবং যাকে মোটেই ভয় কর না, তার সহিত সততা বজায় রাখা হল প্রকৃত সততা।

জীবনে চলার পথে বিচার-মীমাংসা করার সময়ও ধৈর্য ধারণ করো। প্রকৃত ঘটনা শোনার আগে বিচার বা মন্তব্য করো না। যেমন দুই তরফ থেকে সত্যাসত্য না জানার আগে কোন পক্ষকে দোষারোপ করো না। নচেৎ এই অধৈর্যের ফলে তুমি অশান্তির একটি দ্বার উদ্‌ঘাটন করে বসবে।

ধৈর্য ধারণ করো লাগানো কথা শোনার সময়। কারণ, তার সুর, তার ভাষা ভিন্ন হতে পারে। অতএব চট্ করে অধৈর্য ও গরম হয়ে কারো প্রতি কোন কুমন্তব্য অথবা বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসো না। নচেৎ তোমার আপন পর হয়ে যাবে।

ভদ্রতা হল অসার ও ফালতু বিষয় ত্যাগ করা, বিচক্ষণতা হল সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, ধৈর্য হল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা, কঠিন হল ক্রোধ সংবরণ করা এবং অতিরঞ্জন হল অতি ভালোবাসা অথবা অতি ঘৃণা করার নাম।

জেনে রেখো যে, একটি মিনিটের ধৈর্য কয়েক বছরের নিরাপত্তা দান করতে পারে।

সহ্য করা কঠিন হলেও, সহ্য তোমাকে নিরাপদের সুখ দান করতে পারে। অভ্যাস করলে, চেষ্টা করলে সহ্য করা যায়। তাছাড়া উপায় না থাকলে আর কি করতে পার? বন্ধু আমার! অসহ্য বলে কোন কিছু নেই। কারণ, সময়ে সবই সহ্য হয়।

বিপদে ধৈর্য ধর। হীনতা বরণ করো না। একান্ত আপন পর হলে, দুঃখ করো না সহ্য করে নিও।

"দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস,
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।"

প্রিয় বন্ধু আমার! জীবনের সংগ্রামের পথে তুমি একা নও। তোমার সাথী হল ধৈর্য। এ সংগ্রামে তুমি অবশ্যই জয়লাভ করবে। ধৈর্য আর অধ্যবসায় থাকলে পাহাড়ও ডিঙানো যায়। সংগ্রামে যে সৎসাহসের দরকার তা যোগাবে তোমার ধৈর্য। ধৈর্যশীল মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী। জীবন-সংগ্রামের মূল হল শক্তি। যাবতীয় আনন্দ ও শক্তির মূল উৎস হল ধৈর্য। ধৈর্য ও নম্রতায় শক্তি বিরাজ করে।

ধৈর্য ও সবর এক সম্পদ। যার দ্বারা ধনী না হলেও মহাসুখে জীবন যাপন করা যায়। সবর ও শুকরে উভয় জগতের রত্নলাভ হয়। আর সবর হল ৩ প্রকারের;

(১) আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্যধারণ ঃ আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করায় মন সব সময় সাথ দেয় না। অনেক সময় তাঁর আদেশ ও ফরয পালন করতে কষ্ট লাগে। তাই তাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজেব। নিজের জান ও মাল কুরবানী দিয়ে জিহাদ করতে, অতি শীতের রাতে গোসল-ওযূ করে নামায আদায় করতে, উপার্জিত অর্থের একটা অংশ আল্লাহর হক হিসাবে হকদারকে দিতে, সারাদিন উপবাস থাকতে, বেপর্দা পরিবেশে পর্দা করতে, ঈমান এনে ইল্‌ম শিখার পর তা শিখাতে ও আমল করতে তথা দাওয়াতের কাজ করতে এবং আরো অন্যান্য ইবাদত করতে অনেক মুসলিম কষ্টবোধ করে। সুতরাং সেখানে চাই ধৈর্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَٰدَتِهِۦ ﴾

অর্থাৎ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্য ধর। *(সূরা মারয়্যাম ৬৫ আয়াত)*

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾

অর্থাৎ, তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং তাতে ধৈর্য ধারণ কর। *(সূরা ত্বাহা ১৩২ আয়াত)*

বান্দা তিন অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যের মুখাপেক্ষী হয়;

(ক) আনুগত্য বা ইবাদত শুরু করার পূর্বে নিয়ত ঠিক করার সময়, তা সম্পন্ন করার মত দৃঢ় সংকল্প করা ও প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এবং তাতে যেন কোন প্রকার লোক প্রদর্শন

(রিয়া) অনুপ্রবেশ না করে তার চেষ্টা রাখার সময়।

(খ) আমল বা ইবাদত করার মাঝে ঔদাস্য থেকে দূর থাকতে এবং তার রুক্ন, সুন্নাহ ও আদবসমূহ যথার্থভাবে আদায় করতে চেষ্টা করার সময়। যেমন অতিরঞ্জন ও অবহেলার মধ্যবর্তী পন্থা এবং মাবূদের সামনে বিশুদ্ধ নিয়ত ও উপস্থিত হৃদয় রাখার মত পথ অবলম্বন করতে হয় সে সময়।

(গ) আমল বা আনুগত্য শেষ করার পর যাতে তা বাতিল না হয়ে যায় - সে খেয়াল করার সময়; যেন তাতে কোন প্রকার সুনাম নেওয়ার খেয়াল না এসে যায়, গর্ব ও এমন আচরণ না হয়ে বসে, যাতে ইবাদত সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, আল্লাহর ইবাদত করতে প্রয়োজন আছে ধৈর্য ও প্রচেষ্টার। আর এই জন্যই আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "বেহেশ্তকে কষ্টসাধ্য কর্ম দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে---।" *(মুসলিম)*

(২) তাঁর নিষেধ পালনে ধৈর্যধারণ ঃ মহান আল্লাহ যে সব কথা ও কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা বর্জন করা অনেক মানুষের নিকট কষ্টকর, মন যেদিকে ধাবিত হয়, মন যা নিয়ে তৃপ্তি পায়, হৃদয় যা পেয়ে আনন্দিত হয়, যাতে অন্তর লোভাতুর হয়, তার অনেক কিছুই হারাম। অথচ তা বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই সেই সময় ধৈর্যশীলতা অবলম্বন না করলে অবাধ্যাচরণ ও পাপ হয়ে যায়।

মনের কুপ্রবৃত্তি, কাম ও কামনাকে অবদমিত করার জন্য প্রয়োজন আছে ধৈর্যের। আর তার জন্যই আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "দোযখকে কুপ্রবৃত্তিসুলভ কর্ম দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে---।" *(মুসলিম)*

(৩) তাঁর নির্ধারিত তকদীরে ধৈর্যধারণ ঃ এমন কিছু বিপদ-আপদ আছে, দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা আছে যাতে অনেক সময় মানুষের কোন হাত বা এখতিয়ার থাকে না। অকস্মাৎ আপতিত হয়ে মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে চলে যায়। কিছু বিপদের পিছনে মানুষের এখতিয়ার থাকলেও আসলে তার সকল কর্ম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। সে যাই হোক কোন মঙ্গলের জন্য মহান প্রতিপালক বান্দার উপর কিছু বিপদ-আপদ প্রেরণ করে থাকেন। তাঁর লিখিত বিধির বিধানে যে মসীবত থাকে তা অখন্ডনীয়রূপে যখন বান্দার উপর আসে, তখন নির্বিবাদে বান্দাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ খুবই সহজ। এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না। *(সূরা হাদীদ ২২-২৩ আয়াত)*

ভাগ্যের ভালো-মন্দ, সব ধরনের সুখ-দুঃখ যে মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত, সে কথা বিশ্বাস করা মুসলিমের জন্য ফরয। আর এও ফরয যে, মুসলিম তকদীরের সর্বপ্রকার দুঃখ-

দৈন্যের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। কোন প্রকার অভিযোগ বা প্রতিবাদমূলক ভাব মনের ভিতরে সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ, তাতে তার মঙ্গল আছে তা অবশ্যই জানতে ও মানতে হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! যদি তার কোন মঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করে। আর যদি তার কোন অমঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করে ধৈর্য ধরে। (আর উভয় অবস্থাই তার জন্য মঙ্গলময়।) সে সবকিছুতে সওয়াব পায়। এমন কি স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেয়, তাতেও সে সওয়াবের অধিকারী হয়।" *(আহমাদ, মুসলিম)*

বিপদগ্রস্ত বন্ধু আমার! বিপদ যদি এসেই থাকে, তাহলে তার প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য। নচেৎ বিপদে হা-হুতাশ করতে করতে যখন হৃদয় ক্লান্ত হয়ে আসে, তখন হা-হুতাশ আর না করার নাম ধৈর্য নয়। বলা বাহুল্য বিপদের প্রথম ধাক্কা সহ্য করাই হল প্রকৃত সহনশীলের কাজ।

একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর আর ধৈর্য ধর।" মহিলাটি (যেন রেগে উঠে) বলল, 'সরে যাও আমার কাছ থেকে আমার যা মুসীবত তা তোমার কাছে আসেনি!'

আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ! একথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দরজায় এল। দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।" *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ)*

বিপদের পীড়নে পীড়িত বন্ধু আমার! বিপদগ্রস্ত হয়ে মাতম করা, উচ্চরোলে কান্না করা, গাল নোচা, কাপড় ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া, বুকে থাপড় মারা, ইনিয়ে-বিনিয়ে রোদন করা, হা-হুতাশ সহ আর্তনাদ করে, তকদীরকে গালি দিয়ে, আল্লাহর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আরোপ করে কান্না করা, মাটি মাখা, মাথায় মারা, কপাল ঠোকা ইত্যাদি হারাম। এমনটি করাই হল ধৈর্যশীলতার পরিপন্থী এবং ভাগ্যের উপর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। এটা একটি প্রাক্ ইসলামের জাহেলী কুপ্রথা। যেমন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে চারটি কর্ম রয়েছে যা জাহেলিয়াতের বিষয়ীভূত; যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (অন্যের) বংশে খোঁটা দেওয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মাতম করে কান্না করা।"

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী নারী যদি তার মরণের আগে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন দাহ্য আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়াময় জামা পরিয়ে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম ১৫৫০ক, বাইহাকী ৪/৬৩)*

তিনি বলেন, "দুটি কর্ম মানুষের মাঝে রয়েছে যা কাফেরদের কাজ; কারো বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতর জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম, বাইহাকী ৪/৬৩)*

আলুলায়িত কেশদাম ছড়িয়ে রাখা (চুল না আঁচড়ানো, মাথা না বাঁধা) বৈধ নয়। কারণ, জনৈক বায়আতকারিণী সাহাবী বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যে সব সৎ বিষয়ে আমাদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এও যে, আমরা তাঁর অবাধ্যাচরণ করব না,

(বিপদের সময়) চেহারা নুচব না, ধ্বংস ডাকব না, বুকের কাপড় ছিঁড়ব না এবং চুল ছিটিয়ে রাখব না। *(আবূ দাউদ ২৭২৪ক, বাইহাকী ৪/৬৪)*

বিপন্ন বন্ধু আমার! বিপদের সময় অধৈর্য হয়ে আর্তনাদ করো না। কারণ, তাতে দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যাবে, আল্লাহর প্রতি কুধারণা প্রকাশ পাবে এবং তোমার দুশমনরা তা দেখে হাসবে। বিপদের ফলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, তা হতেও বঞ্চিত হবে। আর তা নিশ্চয় তোমার জন্য ভালো নয়।

আলী ﷺ বলেন, বিপদে ধৈর্য ধরলে তোমার তকদীরে যা থাকে তাই হয়; কিন্তু তাতে সওয়াব পাওয়া যায়। আর বিপদে অধৈর্য হলে তোমার তকদীরে যা থাকে তাই হয়; কিন্তু তাতে গোনাহ পাওয়া যায়।

শেখ সাদী বলেন, ধৈর্য অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি হয়। ধৈর্যহীন ব্যক্তি পরিণামে অনুতপ্ত হয়। যেমন দ্রুতগামী ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উঁট ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

বিপদে তোমার প্রাণপ্রিয় বস্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই। চিন্তা করো না, তার থেকে ভাল জিনিস ফিরে পাবে তুমি। দুঃখের অনাবৃষ্টি তোমার জীবনের ফুলবাগান বরবাদ করে গেলেও আবারও সুখের বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে পুনরায় ফুল ফুটবে। নবী ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামাহ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কোন বান্দার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে যদি বলে,

[illegible]

(অর্থাৎ, অবশ্যই আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান কর এবং ওর চাইতে উত্তম বস্তু বিনিময়ে দান কর।)

তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদে তাকে সওয়াব দান করেন এবং বিনিময়ে তাকে ওর চাইতে উত্তম বস্তু প্রদান করেন।"

হযরত উম্মে সালামাহ رضي الله عنها বলেন, 'অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ পরলোকগমন করলেন, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দুআ পড়েছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে (আমার স্বামীর) বিনিময়ে তাঁর চেয়ে উত্তম (স্বামী) রসূল ﷺ-কে দান করলেন।' *(মুসলিম ৯১৮নং)*

বিপদ যত বড়ই হোক ধৈর্য ধর। নচেৎ, সবচেয়ে বড় মসীবত হল, মসীবতের সময় ধৈর্য না রাখতে পারা। তাছাড়া সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন, সব সমস্যার প্রতিকারই হচ্ছে ধৈর্য। এ ছাড়া আত্মহত্যা করে সমস্যার সমাধান হয় না। তাতে সুখ বা আরাম পাওয়া যায় না। মরণের পরে ভোগ করতে হয় অনুরূপ শাস্তি-যন্ত্রণা। এমনকি অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনাও করো না। যেহেতু মরণে যে মঙ্গল আছে, তার নিশ্চয়তা কোথায় বন্ধু?

কিন্তু যদি একান্তই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হয় এবং মরণ চাইতেই হয়, তাহলে এই দুআ বলে চাওয়া উচিত,

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আহয়িনী মা কা-নাতিল হায়াতু খাইরাল্ লী অতাওয়াফ্‌ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল্ লী।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মরণ দাও। *(বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০ নং)*

আরো দুআ করো এই বলে,

﴿ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٥٠ ﴾ (البقرة ٢٥٠)

﴿ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ ١٢٦ ﴾ (الأعراف ١٢٦)

আল্লাহর লিখিত তকদীরে ধৈর্য

"দুখ-অপমান, সুখ বা সম্মান সকল কিছুই বিধির দান,
সুখ মাঝে দুখ, দুখ মাঝে সুখ লুকায়ে রাখেন সেই ইচ্ছাময়।"

যে ঈমান নিয়ে মানুষ মুমিন হয়, তার রুক্ন হল ৬টি। তার মধ্যে ষষ্ঠ রুক্ন হল তকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান রাখা। মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে সৃষ্টিজগতের ভাগ্যলিপি লওহে মাহফুযে তিনি যা ইচ্ছা লিখেছেন। পরে তা বিস্তারিতভাবে লিখা হয়ে থাকে; মাতৃগর্ভে ভ্রূণে আত্মাদানের পূর্বে ফিরিশ্তা পাঠান। তখন মানুষের রুজী, তার মৃত্যুর সময় ও স্থান, তার কর্মজীবন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

এইভাবে আবার প্রতি বছর রমযান মাসে 'লাইলাতুল ক্বাদর' বা শবেকদরে বিস্তারিত ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

মুসলিম বিশ্বাস করে যে, বিশ্বচরাচরে যা কিছু ঘটছে তা তিনি পূর্ব হতেই জানেন এবং সবকিছু তাঁর হিকমত ও ইচ্ছানুযায়ীই ঘটছে। এমন কি মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মও তাঁর ইচ্ছা বিনা ঘটা সম্ভব নয়। তিনি যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তা ন্যায় সঙ্গত। তিনি কারো উপর যুলুম করেন না। ভাগ্যলিপি তাঁর হিকমতে ভরপুর। অতএব তিনি যা চেয়েছেন তা হয়েছে, যা চাননি তা হয়নি। যা চাইবেন তাই হবে। যা চাইবেন না তা কোনদিন হবে না। তাঁর ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত যে কোনও কর্মশক্তি নিষ্ক্রিয়।

মুসলিম আল্লাহর সকল ফায়সালাকে নতশিরে মেনে নেয় এবং তাতেই নিজের মঙ্গল আছে মনে করে। আল্লাহর তকদীর ও বিচারের উপর ধৈর্য ধারণ করে। নিয়তির উপর সদা সন্তুষ্ট থাকে। আপাতদৃষ্টিতে নিজের ভাগ্যকে দুর্ভাগ্য মনে হলেও সেটাকেই সে নিজের জন্য শুভ ও অনুকূল মনে করে। কারণ, সে জানে যে, আল্লাহ তার প্রতি কোন দিন যুলুম করবেন না। শিশুর প্রতি মায়ের অনুকম্পা যতটা, তার চেয়ে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা বহুগুণ অধিক। *(বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪)*

সুতরাং নিপীড়িত বন্ধু আমার! যে তকদীরে ঈমান রাখে, তার আবার দুশ্চিন্তা কিসের?

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'আশ্চর্য তার প্রতি, যে তকদীরে ঈমান রাখে অথচ সে চিন্তিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে অথচ সে আনন্দিত হয়। আশ্চর্য তার প্রতি, যে দুনিয়া ও তার বিবর্তনের কথা জানে অথচ সে তার প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট হয়।'

একদা ইবরাহীম বিন আদহম এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের নিকট গিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ৩টি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবে কি?' লোকটি বলল, 'অবশ্যই।' বললেন, 'এ জগতে কি এমন কিছু ঘটছে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা নেই?' বলল, 'না।' বললেন, 'তোমার রুযীর এতটুকু কি কম হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন?' বলল, 'না।' বললেন, 'তোমার আয়ু থেকে কি এতটুকুও কম করা হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?' বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তবে আবার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কিসের?'

পারস্যের এক রাজা একজন বিদ্বানকে কোন দোষে বন্দী রেখেছিল। আদেশ ছিল যে, তাঁর প্রাত্যহিক খাবারে দুটি যবের রুটি এবং সামান্য লবণ ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে যেন না দেওয়া হয়। বিদ্বান লোকটি এই অবস্থাতেই কিছু না বলেই কাটিয়ে দিলেন। রাজা তাঁর স্বাস্থ্যহানি না দেখে অবাক হয়ে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে আদেশ করল। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই কঠিন কষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্য বহাল আছে কি করে?' বিদ্বান বললেন, 'আমি এমন একটি ওষুধ জানি, যা ৬টি ধাতুর সংমিশ্রণ; তা ব্যবহার করলে আমার স্বাস্থ্যের ভার-সাম্যতা বজায় থাকে।' তারা বলল, 'আমাদেরকে সে মিশ্র ওষুধের কথা বলে দিন।' বলল, (১) আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। (২) আমি জানি যে, যা ভাগ্যে আছে তা ঘটবেই। (৩) পরীক্ষার্থীর জন্য ধৈর্যই হল সর্বোত্তম ব্যবহার্য। (৪) সহনশীলতা, (৫) এমনও হতে পারে যে, আমি যে হালে আছি তার থেকে আরো খারাপ হালে থাকতাম। আর (৬) যথাসময়ে উদ্ধার আসবেই।' রাজার কাছে এ খবর গেলে তাঁকে মুক্ত করে দিল।

অতএব মুমিন হয়ে তোমারও এ প্রগাঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, তোমার ভাগ্যে যা লিখা আছে, তার বাইরে কিছু হবে না। আর যা হবে তা তোমার জন্য মঙ্গলময়। যা ঘটেছে, তা তোমার ভাগ্যে ঘটার ছিল বলে ঘটেছে, আর তা তুমি বা দুনিয়ার অন্য কেউ রদ করতে পারত না।

সুতরাং আফশোস করো না বন্ধু! ভঙ্গুর দেওয়ারকে তুমি ভেঙ্গে পড়া থেকে রুখতে পার না। নদীর বাঁধ ভাঙ্গা পানি তুমি আটকাতে পার না। ঝড়ের গতিবেগ তুমি কমিয়ে দিতে পার না। আগুনের দাহিকা শক্তি তুমি স্তিমিত করতে পার না। পার না তুমি তোমার ভাগ্যলিপি খন্ডন করতে।

অতএব ভাগ্যের এই ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণ কর। ক্ষোভ, ক্রোধ, বিলাপ, আর্তনাদ, হা-হুতাশ, আক্ষেপ, আফশোস, পরিতাপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ এ সব কিছু আসার আগে তুমি তোমার বিধির বিধানকে ঘাড় পেতে মেনে নাও। নির্দ্বিধায় বরণ করে নাও মহান প্রতিপালকের ফায়সালাকে। আর মহান আল্লাহর এই আদেশ পালন কর,

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٥١ ﴾

অর্থাৎ, তুমি বল, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ব্যতীত আমাদের

কিছুই হবে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা রাখা উচিত। *(সূরা তাওবাহ ৫১ আয়াত)*

হ্যাঁ, আর বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হতো না' বা যদি আমি এই না করতাম, তাহলে এই হত।' কারণ, তাতে শয়তানের দুয়ার খোলা যায়। বরং বলো যে, 'ক্বাদ্দারাল্লা-হু অমা শা-আ ফাআল।'

তোমার মনের মণিকোঠায় মহান আল্লাহর এই বাণী লিখে, বাঁধিয়ে ও টাঙ্গিয়ে রাখ এবং যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হবে, তখনই তা পড়ে দেখ ঃ-

﴿ وَٱصۡبِرۡ لِحُكۡمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعۡيُنِنَاۖ ﴾

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার জন্য ধৈর্য ধারণ কর। তুমি তো আমার চোখের সামনেই রয়েছ। *(সূরা তূর ৪৮- আয়াত)*

হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য

কিছু লোক আছে যারা মহান করুণাময় আল্লাহকে গালি দেয়; ভুল বুঝে তাঁর শানে কত অসঙ্গত কথা বলে। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সবার সেরা মহামানবের শানে কত বেআদবীমূলক কথা বলে। কত বড় বড় কবি-লেখক সম্বন্ধে কত রকমের কুমন্তব্য করে। সুতরাং তুমি-আমি কে? তোমার-আমার মত ভুলে ভরা মানুষের জন্য তো সমালোচক থাকবেই।

একটা বড় কিছু হওয়ার চেষ্টা কর, বড় কিছু করার চেষ্টা কর, সামাজিক কোন কাজে হাত দাও, তোমার মন পরিষ্কার; নিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, সমাজের উপকার, তবুও কিছু লোক আছে যারা তোমার ঐ কাজের নানা সমালোচনা করবে। তখন তুমি তাদের কথায় শুধু ব্যথা পাবে নয়, বরং তোমাকে কাঁদতেও হবে।

সুতরাং তাদের কথা মানলে এবং নিজেকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখতে চাইলে সামাজিক কাজে থেকো না। তুমি যদি লোকের সমালোচনাকে ভয় কর, তাহলে কিচ্ছু করো না, কিচ্ছু বলো না এবং কিচ্ছু হয়ো না। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

নানা জনের নানা মন্তব্য তোমার হৃদয়কে দগ্ধ করবে। মনের সুখ হরণ করে নেবে। তা বলে কি তুমি সে কাজ থেকে বিরত হবে?

জীবনের সংগ্রাম-পথে কত বাধা-বিপত্তি আসবে শুধু হিংসুকদের তরফ থেকে, তোমার ভাই, তোমার আত্মীয়-পরিজন, তোমার সমাজের লোকের তরফ থেকে, কত কটুক্তি শুনতে পাবে তাদের মুখে সরাসরি অথবা কোন মাধ্যমে, তা বলে কি তুমি ভীরুর মত বসে যাবে? না কোনদিন না।

'আসছে পথে আঁধার নেমে তাই বলে কি রইবি থেমে
বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তাই বলে তোর ভীরুর মত বসে থাকা চলবে না।'

যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের কাজ হাতে নিয়েছ, সমালোচকদের সমালোচনার ভয়ে তা কি

বর্জন করবে? না কোনদিন না। বরং বল,

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
তবু একা বসে রব উদ্দেশ্য সাধিতে।'

কবির সুরে সুর মিলিয়ে বল,

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না-ই আসে
তবে একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়,
যদি সবাই ফিরে যায়,
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়-
তবে পথের কাঁটা তোর রক্তমাখা
চরণ তলে একলা দলো রে।।'

তুমি ধনী হলে হিংসায় লোকেরা বলবে, হারাম খেয়ে বা উপায়ে বড়লোক হয়েছে। বক্তা হলে বলবে, রটা জিনিস বলছে। লেখক হলে বলবে, নকল করেছে। শিক্ষিত হলে বলবে, নকল করে হয়েছে। পরহেযগার হলে বলবে, বকধার্মিক ইত্যাদি।

তুমি যত ভালো হবে, তোমার নাম যত ছুটবে, তত তোমার হিংসুক বাড়বে। এটাই মনুষ্য-সমাজের একটি নোংরা প্রকৃতি।

'যথাসাধ্য ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো?
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়,
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।'

তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, হিংসুকের সমালোচনা ও কুমন্তব্য থেকে বাঁচতে পারবে না। যে কোন প্রকারেই হোক সে তোমার দোষ দেখবে, খুঁত ধরবে, তোমার অবদান ও কৃতিত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করবে।

এক ব্যক্তি অপর আর একজনের ছেলেকে দেখতে পারত না। শুনল, সে ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট্ হয়েছে। জ্বলে উঠে বলল, ফার্স্ট্ হলে কি হবে, চাকরী পাবে না। বলল, চাকরীও পেয়েছে। বলল, চাকরী পেলে কি হবে বেতন পাবে না। বলল, বেতনও পেয়েছে। বলল, বেতন পেলে কি হবে? বেতনে বর্কত থাকবে না। তার মানে দেখতে লারি চলন বাঁকা।

কথিত আছে যে, একদা লোকমান হাকীম তাঁর পুত্র সহ একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতক লোক বলতে লাগল, 'লোকটা কত নিষ্ঠুর! একটি গাধার পিঠে দু' দু'টো লোক!'

এ কথা শুনে হাকীম নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর পরে আরো কিছু লোক তাঁদেরকে দেখে বলে উঠল, 'ছেলেটি কত বড় বেআদব! বুড়োটাকে হাঁটিয়ে নিজে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে ছেলেটি নেমে এল এবং হাকীম সওয়ার হলেন। আরো কিছু দূর পর কিছু লোক বলতে লাগল, 'বুড়োটির কি আক্কেল! নিজে গাধার পিঠে চড়ে ছেলেটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে তিনিও গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু পরে আরো কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলল, 'লোক দু'টো কি বোকা! সঙ্গে সওয়ার থাকতে পায়ে হেঁটে পথ চলছে!'

এ বারে হাকীম তাঁর ছেলেকে বললেন, 'দেখলে বাবা! তুমি চাপলেও দোষ, আমি চাপলেও দোষ, দু'জনে চড়লেও দোষ, কেউ না চড়লেও দোষ। সুতরাং তুমি কারো কথায় কর্ণপাত করো না।' কারণ, লোকের খোঁটা থেকে বাঁচা কঠিন। নিজের বিবেকে কাজ করে যাওয়া উচিত।

সুতরাং বন্ধু আমার বাঁচতে পারবে না তুমি। আর এ সব থেকে এড়ানোর উপায় হল, এসব কথা শুনে ধৈর্য ধরা এবং হিংসুকদেরকে উপেক্ষা করে চলা। 'হাথী চলতা রহেগা আউর কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।' মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾

অর্থাৎ, তারা যা বলে তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। *(সূরা মুযযাম্মিল ১০ আয়াত)*

আর এ জন্যই রহমানের বান্দার অন্যতম গুণ অজ্ঞদের কথার জবাব না দেওয়া, তাদেরকে বর্জন করে চলা। অর্থাৎ, 'দুর্জনেরে পরিহারি, দূরে থেকে সালাম করি।' মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴾

অর্থাৎ, আর তারা রহমানের বান্দা, যারা জমিনের বুকে নম্রভাবে চলা-ফিরা করে এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদেরকে সম্বোধন করলে (উপেক্ষা করে) বলে, সালাম। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

হিংসার শিকার বন্ধু আমার! তোমার মাঝে ঔজ্জ্বল্য এলে লোকের চোখে তো ঠেকবেই। তুমি দিচ্ছ, তারা দিতে পারে না। তুমি পারছ, তারা পারে না। তোমার সুনাম হচ্ছে, তাদের হয় না। এতে তাদের হিংসা হওয়ারই কথা।

কিন্তু তোমার মন দুঃখিত হলেও যে মাটিতে বসে আছে, তার তো পড়ার কথা নয়। লোকে যদি চায় যে, তুমি তোমার ইল্‌ম, আদব, শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বেড়িয়ে এসে জাহেল, বেআদব, মূর্খ ও চরিত্রহীন হয়ে যাও - তাহলে তুমি কি তাদের এ মতে একমত হবে?

তাহলে হিংসার ঝটিকার সম্মুখে তুমি পর্বতের মত অটল হও। পাথরের মত নিথর ও শক্ত হও। বর্ষণ হোক শিলা তোমার উপরে আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক আপনা-আপনিই। খবরদার! তাদের হিংসার সে নিয়ত কখনই পূরণ হতে দিও না।

পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও লোকে যদি খামখা তোমার বদনাম গায়, তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ ছাড়া আর কিই বা করতে পার? অবশ্য সেই সময় আরবী কবির এই ছত্রের কথা মনে মনে স্মরণ করো ঃ-

إذا أتتك مذمتي من ناقص   فهي الشهادة بأني كامل

অর্থাৎ, যদি তোমার কাছে কোন কম জ্ঞানের লোকের মুখে আমার বদনাম আসে, তাহলে তা হল এই কথার সাক্ষ্য যে, আমি একজন কামেল লোক।

পক্ষান্তরে দোষ তো থাকতেই পারে। কিন্তু সে দোষ যদি সূর্যের কাছে তারার মত হয়, তাহলে তা নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটানো তো হীন মানুষের কাজ। নীচ ও হীন মনের মানুষরা বড় মানুষদের ত্রুটি খুঁজে পেয়ে তার সমালোচনায় প্রচুর আনন্দ পায়।

'সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।'

দোষ দেখে যারা বিন্দুকে সিন্ধু জ্ঞান করে, তাদের সে আচরণও এক দোষ। কবি বলেন,

'দোষ দেখে রোষ করা ইহাও এক দোষ,
কেননা জানিয়া কেহ নাহি করে দোষ।
মহাজ্ঞানী হইলেও দোষশূন্য নয়,
প্রমাণ তাহার দেখ ময়ুরের পায়।'

আরবী কবি বলেন,

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها   كفى المرء نبلا أن تعد معائبه

অর্থাৎ, কে আছে এমন, যার সমস্ত আচার-আচরণ (সকলের নিকট) পছন্দনীয়? মানুষের মর্যাদার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার দোষ গনা যায়। (দোষ তো থাকতেই পারে; কিন্তু তা অগুনতি বা বেশী নয়।)

সমালোচনামুক্ত কি মানুষ আছে? যে বড় কাজ করে লোকেরা তারই সমালোচনা করে। সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য কর, তার মাঝে মড়া ফেলা হয়, মড়া ভাসে উপরে। কিন্তু তার গভীরে থাকে মণি-মুক্তা-প্রবাল-পদ্মরাগ। বনে-বাগানে কত শত গাছ রয়েছে। কিন্তু লোকেরা সব ছেড়ে দিয়ে ফলদার গাছেই ঢিল মারে। আকাশের মাঝে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। কিন্তু কেবল চন্দ্র ও সূর্যেই গ্রহণ লেগে থাকে।

বলা বাহুল্য, সমাজ-সেবী বন্ধু আমার! উচিত কর্ম করার জন্য তোমার সৎ সাহস থাকা দরকার। মানুষকে ভয় করা তোমার উচিত নয়। অপরে তোমার সম্পর্কে কি ভাবে, সে কথাও চিন্তা করা উচিত নয়। তোমার উদ্দেশ্য সৎ হলে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

বিশাল সমুদ্রে পাথর মারলে সমুদ্রের কি যায় আসে? উজ্জ্বল নক্ষত্রে ঢিল মারলে, সে ঢিল কি তার গায়ে লাগে? জ্ঞানীর মানহানির জন্য অজ্ঞানীর কুমন্তব্য নিতান্ত অসার। তাতে জ্ঞানীর কিছু আসে যায় না।

সুফিয়ান সওরী বলেন, যে নিজেকে চিনেছে, তার সম্বন্ধে লোকের সমালোচনা কোন ক্ষতি করতে পারে না।

তাছাড়া সমালোচনা বড্ড সহজ। কঠিন হল রচনা করা। এ কথা সমালোচকও জানে।

'বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরই তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো দেখে যাই।'

তবুও সমালোচনা গঠনমূলক হলে জ্ঞানীর উচিত, তার সমালোচকদেরকে স্বাগত জানানো।

কিন্তু সমালোচক যদি মূর্খ অন্ধ বা হিংসুক হয়, তাহলে চামচিকা দিনের বেলায় চোখে দেখতে না পেলে তাতে সূর্যের দোষ কি?

'শত্রুতার চক্ষে গুণ দোষ ভয়ানক,
পুষ্পসম সা'দী শত্রু-চক্ষেতে কন্টক।
পারি আমি কারো হৃদে কষ্ট নাহি দিতে,
শত্রুর কি করি? সে যে স্বতঃ ক্ষুন্ন চিতে।'

ভাইরে আমার! লোকের মনমত চলতে তুমি পারবে না। লোকেদের মনের নাগাল তুমি পেতে পার না। আর হিংসুকদের মনমত চললে তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, তারা তো তোমার ক্ষতি ও ধ্বংসই কামনা করে। আর তাদেরকে রাযী করতে গেলে হয়তো বা আল্লাহ নারায হয়ে যাবেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

পরিশেষে বলি যে, যদি পার তাহলে তুমি তোমার সমালোচকের জন্য দুআ কর। যেমন ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমাস সালাম তাঁদের বিরোধীদের জন্য করেছিলেন।

মহানবী ﷺ তায়েফেবাসীর বিরুদ্ধে ধ্বংস কামনা করলেন না। একদা তিনি কিছু মাল বন্টন করলেন। কিছু লোকে বলতে লাগল, 'এই বন্টন আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয় নি।' আল্লাহর নবী ﷺ সে খবর জানতে পারলে বললেন, "আল্লাহ মূসাকে রহম করেন। তাঁকে এর চাইতে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তাতে সবর করেছেন।" *(বুখারী, মুসলিম ১০৬২নং)*

একদা আলী ﷺ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তি অকারণে তাঁর সম্পর্কে কুমন্তব্য করতে লাগল। তিনি লোকটার কাছে গিয়ে বললেন, 'ভাই! আমার সম্পর্কে তুমি যা কিছু বললে তা যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি তোমার এ সব কথা মিথ্যা হয়, তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।'

পক্ষান্তরে যদি সংবরণ করতে না পার, তাহলে নূহ ও মূসা নবীর মত তুমিও তোমার বিরোধীর জন্য বদদুআ করতে পার।

অনুরূপভাবে কুফার আমীর সা'দ বিন আবী অক্কাসের বিরুদ্ধে উসামাহ বিন কাতাদাহ খলীফা উমার ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়ে অবিচারের অভিযোগ করলে সা'দ ﷺ বদদুআ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি লোক প্রদর্শন ও সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তাহলে ওকে অন্ধ করে দিও, ওর হায়াত দারাজ করো এবং ফিতনায় পতিত করো।' *(বুখারী ৭৫৫ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করই, তাহলে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে

অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য তাই উত্তম। ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে হবে। আর ওদের আচরণে দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।"
(সূরা নাহল ১২৬-১২৭ আয়াত)

কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে

ক্ষুধার্ত উদর পরিতৃপ্ত হবে, পিপাসিত প্রাণের পিপাসা নিবারিত হবে, বিনিদ্র দেহ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়বে, রোগা শরীর নিরোগ হবে, হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে আসবে, পথহারা পথ খুঁজে পাবে, বন্দী বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবে, দূর হবে জীবনের হতাশার অন্ধকার।

﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ ﴾

অর্থাৎ, অচিরে আল্লাহ স্বীয় সান্নিধ্য হতে বিজয় আনয়ন করবেন অথবা কোন আদেশ প্রেরণ করবেন। *(সূরা মায়েদাহ ৫২ আয়াত)*

রাত্রিকে জানিয়ে দাও যে, আকাশ ও পর্বতমালা চিরে সুবহে সাদেক তাকে তাড়া করে আগমন করছে। চিন্তাগ্রস্তকে সুসংবাদ দাও যে, অকস্মাৎ তার মনের আকাশ থেকে আলোর বেগে চোখের পলকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দূর হয়ে যাবে। সুসংবাদ দাও বিপদগ্রস্তকে এই বলে যে, অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে স্বস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

মরুভূমির পথিক লম্বা পথ চলতে থাকে। দিগন্ত প্রসারী সে ভূমির কোথাও বৃক্ষ নেই, পানি নেই। কিন্তু কিছু পরেই তারই পথে অবস্থিত আছে সবুজ-শ্যামলে ভরা মরুদ্যান। রশি যত লম্বা হবে, তত এই আশা হবে যে, তা ছিন্ন হয়ে যাবে।

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।'

বিরহ ও বেদনাশ্রু শুষ্ক হয়ে ওষ্ঠাধরে হাসির ফুলকুঁড়ি ফুটে উঠবে। ভয় ও আশঙ্কার সকল পাহাড় উল্লংঘন করে নিরাপত্তা এসে হাযির হবে। আতঙ্ক দূর হয়ে শান্তি ফিরে আসবে। আগুন তাওহীদের ইবরাহীমকে জ্বালাতে পারবে না। সমুদ্র সত্যাশ্রয়ী মূসাকে নিমজ্জিত করতে পারবে না। তিমি আল্লাহ-প্রিয় ইউনুসকে হজম করতে পারবে না।

বন্ধু আমার! শীতের দাপটে গাছের পাতা ঝরা দেখে ভেবে নিও না যে, গাছটি মারা যাচ্ছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, যথা সময়ে বসন্তকালে তার আবার নতুন পাতা গজাবে।

মসীবতে ঘেরা ঘরের কেবল দেওয়াল ও সংকীর্ণ দরজা-জানালা দেখো না। বরং তার ওপারে তাকিয়ে দেখ, সুদূরপ্রসারী উন্মুক্ত আকাশ। সম্মুখের বিপদ-সমুদ্রের ঢেউ দেখে লা ডুবিয়ে দিও না। তুমি 'তুফানে ছেড়ো না হাল, নচেৎ নৌকা হবে বানচাল।'

হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসকেই প্রথমে ছোট আকারে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তা ধীরে ধীরে বড় হয়। কেবল মসীবতকেই তিনি এরূপ সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমে তা বড় থাকে, তারপর তা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়।' *(বাহজাতুল মাজালিস, ইবনে আব্দুল বার্র ২/৩৫২)*

'কিসের দুঃখ ভেবো না বন্ধু আসিবে সেদিন পুনো,
এ নিশা তখন আবার তিমিরে ওপারে গিয়াছে শুনো।

আলোক ও ছায়া হাসি ও অশ্রু বিধাতার দুটি দিক,
কাঙাল কখনো রাজ্য লভিছে রাজায় মাগিছে ভিক।'

তোমার যে হাল, সে হাল সৃষ্টিকর্তাকে জানিয়ে বল,

﴿ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে ও দিনকে রাতে পরিবর্তন কর এবং তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। আর তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান কর। *(সূরা আলে ইমরান ২৬-২৭ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, ভয় পেয়ো না বন্ধুটি আমার! মনমরা হয়ো না। নিরাশ হয়ে যেয়ো না। তোমার হাল যে বেহাল হয়ে বহাল থাকবে তা নয়। উদ্ধারের উপায় বের হওয়ার অপেক্ষা কর। আজকের দিন তোমার দুঃখের হলেও কাল হবে সুখের। যুগ পরিবর্তনশীল। অদৃশ্যের খবর তোমার আমার সকলের অজানা। মহান আল্লাহর রয়েছে প্রত্যহ এক একটি শান। সম্ভবতঃ আল্লাহ এরপর কোন উপায় বের করে দেবেন। অবশ্যই কষ্টের পর রয়েছে স্বস্তি।

টক লেবু দিয়ে সুস্বাদু শরবত বানাও

জ্ঞানী মানুষ বিপদে পতিত হয়ে বিপদকে সম্পদ করে। দুখকে সুখে পরিণত করে। নোকসানকে মুনাফায় পরিবর্তিত করে। টক লেবু তার ভাগে পড়লেও সেই লেবু খেয়ে মুখ বিকৃত করে না, বরং তা দিয়ে সুস্বাদু শরবত তৈরী করে খায়। পক্ষান্তরে অজ্ঞানী একটি বিপদকে ডবল বিপদ মনে করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা থেকে বিতাড়িত হলেন। মদীনায় অবস্থান করে প্রতিষ্ঠা করলেন ঐতিহাসিক ইসলামী রাষ্ট্র। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কারাবন্দী হলেন। আর সেখান হতেই আহলে সুন্নাহর ইমামরূপে পরিচিতি লাভ করলেন। ইবনে তাইমিয়্যাহকে জেলে দেওয়া হল। সেখানে তিনি মনের সুখে ইলমের ভান্ডার বিতরণ করলেন। সারখাসীকে অচল কুয়ার গভীরে বন্দী রাখা হল। সেখানে তিনি ইলমে ফিকহে ২০ খন্ড কিতাব লিখলেন। ইবনুল আষীরকে হাজতে রাখা হল। সেখানে তিনি ইলমে হাদীসের বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। ইবনুল জাওযীকে বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করা হল। সেই অবসরে তিনি কুরআনের সাত কিরাআত রপ্ত করলেন। মরণের শিয়রে দাঁড়িয়ে কত কবি, কত লেখক অনুরূপ মূল্যবান উপহার পেশ করে গেছেন পৃথিবীর মানুষের জন্য - ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

প্রিয় বন্ধু আমার! যখনই কোন আকস্মিক বিপদ তোমার জীবনকে বিপর্যস্ত করতে চায়, তখনই তার মোকাবিলা করে ধৈর্যের পরশ পাথর দ্বারা তাকে সম্পদে পরিণত কর। কেউ

তোমাকে এক গ্লাস অপেয় টক লেবুর রস পান করতে দিলে, তুমি তাতে কিছু লবণ-চিনি মিশিয়ে দাও। কেউ তোমাকে অজগর উপহার দিলে ভয় পেয়ো না। তার মূল্যবান চামড়াটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাকীটা ফেলে দাও। যদি তোমাকে বিচ্ছুতে দংশন করে, তাহলে জেনে রেখো যে, তা হল তোমার জন্য সর্প-বিষ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন।

বিপদের ধূলায় পড়ে ধূলামলিন বন্ধু আমার! মাটি ও পানিতে মিশে সূর্যের তাপ নিয়ে তুমি তোমার সৌন্দর্যের বীজ অঙ্কুরিত কর। দান কর মানুষকে নানা ফুল-ফল ও ছায়া।

বিপদে নোকসান থাকে এবং লাভও। তুমি লাভের দিকটাকে নিয়ে দ্বিগুণ-বহুগুণ লাভে পরিণত কর।

গতস্য শোচনা নাস্তি

দুশ্চিন্তা এমন জিনিস, যা করতে হয় না; আপনিই এসে যায়। কিন্তু কোন কিছুর মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। গতকাল যা ক্ষতি ঘটে গেছে, তা নিয়ে আজ উপদেশ নাও; কিন্তু দুশ্চিন্তাকে মাথায় ঠাঁই দিও না।

দুশ্চিন্তা করে কি তোমার ক্ষতি মুনাফায় পরিণত হবে?

দুশ্চিন্তা করে কি তুমি তকদীরের খাতা মুছে দিতে পারবে?

দুশ্চিন্তা করে কি সময়ের চাকা বন্ধ করতে, গত হওয়া সময়কে ফিরিয়ে আনতে পারবে?

দুশ্চিন্তা কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত; যা বাতাসকে দূষিত করে দেয়, পানি ঘোলাটে করে তোলে, পরিবেশ নোংরা করে ফেলে, ফল-ফসল নষ্ট করে এবং ফুলের উপর মই দেয়।

দুশ্চিন্তা করো না। কারণ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি সেই নদীর মত; যে নদী সমুদ্র থেকে প্রবাহিত হয় এবং পুনরায় সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয়। সেই ব্যক্তির মত; যে ছিদ্র পাত্রে পানি রেখে পিপাসা মিটাবার বৃথা চেষ্টা করে। সেই শিল্পীর মত; যে পানির উপর ছবি আঁকে।

দুশ্চিন্তা করে সময়ের অপচয় করো না। যেহেতু মহান আল্লাহ অপব্যয়ীকে ভালোবাসেন না।

যা হয়ে গেছে, বয়ে গেছে। অতীতের সে ক্ষতি ও বিপদের কথা স্মরণ করে দুশ্চিন্তা করা, আফশোস বা রোদন করা আহাম্মকি বৈ কিছু নয়। কারণ, তাতে বর্তমানের মঙ্গলের পথে বাধা হয়, কল্যাণের চিন্তা ও ইচ্ছা ব্যাহত হয়। জ্ঞানী-গুণীদের নিকট অতীতের ফাইল গুটিয়ে দেওয়া হয়, তা খুলে রেখে বর্ণনা করা হয় না। বিস্মৃতির কারাগারে চিরদিনের জন্য বন্দী করে দেওয়া হয়। ভুলে যাওয়ার অতলস্পর্শী সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

যা বয়ে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা আর কোন দুশ্চিন্তা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কোন হা-হুতাশ ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। কোন আফশোস বা রোদন তার বিনিময় দিতে পারবে না।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বন্ধু আমার! অতীতের বুকচাপার চাপের তলে বাস করো না। অতীতের সে পীড়ন-নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত কর। যে আপদ বয়ে গেছে, তার পাথরকেও বুক থেকে সরিয়ে দাও। তুমি কি নদীকে তার উৎসস্থলে, সূর্যকে তার উদয়াচলে, নবজাত শিশুকে তার মাতৃগর্ভে, দোয়ানো দুধকে গাভীর স্তনমধ্যে, বিগলিত অশ্রুকে চোখের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

"রাত্রে যদি সূর্য-শোকে ঝরে অশ্রুধারা,
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।"

অতীতের অতল গর্ভে তলিয়ে যাওয়া সেই দুঃখের কথা স্মরণ করে উদ্বিগ্ন হওয়া, তার কষ্টে নিজেকে নিষ্পেষিত করা এবং তার আগুনে নিজের জীবনকে দগ্ধীভূত করা অবশ্যই জ্ঞানীর কাজ নয়।

অতীত থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। অতীত নিয়ে ভেবো না। নচেৎ অতীতের খাতা পড়তে গিয়ে বর্তমানকে নষ্ট করে ফেলবে। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে যেখানে বিগত উম্মতের ইতিহাস এবং তাদের কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে বলেছেন,

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা ছিল এক জাতি, যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩৪, ১৪১ আয়াত)*

অতএব যা গত হয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বন্ধু! অতীতের ক্ষতির দেহকে পোস্ট্‌মর্টেম (ময়নাতদন্ত) করে এবং ইতিহাসের চাকাকে উল্টা দিকে ঘুরিয়ে কিছু পাবে কি?

লাভ নেই পিষা আটাকে পুনরায় পিষে এবং কাঠের গুঁড়োকে পুনরায় করাত দিয়ে কেটে। সারা বিশ্বের মানুষ মিলিত প্রচেষ্টা করেও কি ফিরিয়ে দিতে পারবে যা তুমি হারিয়ে ফেলেছ?

জ্ঞানী-গুণীরা চলার পথে পিছনের দিকে তাকান না; তাঁরা দেখেন আগের দিকে। যেহেতু বাতাস আগের দিকে ছুটে যায়, পানি সামনের দিকে প্রবাহিত হয়, কাফেলা সফর করে সম্মুখ পানে। অতএব তুমিও জীবনের এই রীতির বিরোধী হয়ো না। জীবন মাত্র কয়েক দিনের সফর, তার সময় বড় মূল্যবান। অতএব সে সময়কে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় নষ্ট করে দিও না।

সাতটি গুণ তোমার মধ্যে তৈরী কর, তোমার দেহ-মন শান্তি পাবে এবং তোমার দ্বীন ও ইয্যত রক্ষা পাবে। যা হয়ে গেছে বয়ে গেছে, গত হওয়া বিষয় নিয়ে আর দুর্ভাবনা ভেবো না। যে অমঙ্গল আসার আশঙ্কা আছে, তা আসার পূর্বে দুশ্চিন্তা করো না। যে দোষ তোমার মাঝেও আছে সে দোষ নিয়ে অপরকে ভর্ৎসনা করো না। যে কাজ তুমি করেছ সে কাজের উপর প্রতিদান আশা করো না। যে জিনিস তোমার নয় সে জিনিসের দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করো না। যার রাগ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তার প্রতি তুমি রুষ্ট হয়ো না। আর সেই ব্যক্তির প্রশংসা করো না, যে আত্মপ্রশংসা পছন্দ করে।

যে কাল যায় সে কালই ভাল

সকাল হলে আর সন্ধ্যা হওয়ার ভরসা করো না। আজকের দিনটাই তোমার। কেবল আজকেই বাঁচবে তুমি। গত কাল গত হয়ে গেছে তার ভাল-মন্দ নিয়ে। আগামী কাল আসবে যা এখনো আসে নি। তার কি কোন ভরসা আছে। অতএব তোমার আয়ু একদিন; যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ। যা করার তুমি আজকেই করে নাও। যেন তুমি আজকেই জন্ম নিয়েছ, আর আজকেই মারা যাবে। সমস্ত চিন্তা বর্তমানের। গতকালের কোন চিন্তা করো না। আর আগামী কালের ভাবনাও ভেবো না। অতীতের হতাশার অন্ধকার দূর কর। বর্জন কর ভবিষ্যতের

দুরাশা ও নিরাশার সম্ভাব্য ভাবনা।

আজকের একটি দিন তোমার স্বর্ণোজ্জ্বল হোক। আজকের ভাবনাই ভাব। আজকের দিনটাই তোমার শ্রম, প্রচেষ্টা, প্রয়াস ও যত্ন পাক। অতএব আজকে তুমি অবশ্যই বিনয়ীর মত হৃদয় নিয়ে নামায পড়, জ্ঞানপিপাসুর মত মন নিয়ে কুরআন পড়, অন্তর হাযির রেখে মহান সৃষ্টিকর্তার যিক্র কর। প্রত্যেক কর্মে ভারসাম্য রক্ষা কর, মানুষের জন্য চরিত্রকে সুন্দর কর, নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট থাক, নিজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দিক পরিচ্ছন্ন রাখ, পরের উপকার কর।

আজকের দিন; যেদিন তুমি বেঁচে আছ, সেদিনের ঘন্টাগুলোকে ভাগ করে দাও; মিনিটগুলোকে এক একটি বছর বানাও, সেকেন্ডগুলোকে এক একটি মাস মনে কর। আর তা সার্বিক কল্যাণ দিয়ে আবাদ কর। গোনাহ থেকে তওবা কর, মরণের জন্য প্রস্তুতি নাও। ভাল ভাল কাজ করে আজকের দিনটা স্ফূর্তি ও আনন্দের সাথে কাটিয়ে দাও। মন ও মাথা ঠান্ডা রাখ, যে রুযী পেয়েছ সে রুযী নিয়ে খোশ থাক, নিজের পরিবার-পরিজন, ঘর, শিক্ষা ও পজিশন নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, আমি যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। *(সূরা আ'রাফ ১৪৪ আয়াত)*

আজকের দিন তোমার অতিবাহিত হোক নিশ্চিন্ত মনে, বিরক্তিহীন, ক্ষোভহীন, ঈর্ষাহীন হৃদয়ে।

তুমি তোমার হৃদয়ের বোর্ডে এই বাক্য লিখে রাখ, 'আজকেই দিনটা তোমার।' এইভাবে তোমার বাড়িতে, গাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে ঐ কথাই ভাবতে থাক। আজকে যদি মাছ-ভাত খাও, তাহলে গত কালকের ডাল-ভাত কি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করবে অথবা আগামী কালকের অজানা অন্ন কি তোমার আজকের অন্নকে নষ্ট করতে পারবে? আজ যদি ঠান্ডা ও মিষ্ট পানি পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছ, তাহলে গত কালের সেই লবণাক্ত অথবা আগামী কালের কল্পিত গরম পানির জন্য কেন দুশ্চিন্তা করছ?

যে দিন চলে গেছে, তা আর ফিরবে না। যে দিন এখনো আসেনি সে দিন আসতে দাও। ভবিষ্যতের গায়বী বিষয় নিয়ে, ভবিতব্যের সুখ অথবা দুঃখের স্বপ্ন নিয়ে, আগামীর কোন পরিকল্পনা নিয়ে এখন থেকে চিন্তা কেন?

বলবে, ভবিষ্যতের চিন্তাই চিন্তা। পরিকল্পনা ছাড়া কি কোন কাজ হয়? কিন্তু যে চিন্তা তোমার কোন সমাধান দিতে পারে না, যে পরিকল্পনা তোমার বাস্তবায়িত হবে কি না তা জান না, সে চিন্তায় তোমার লাভ কি? অযথা সময় ব্যয় ছাড়া আর কিছু পাবে কি?

'আজকের দিনটাই তোমার প্রথম ও শেষ দিন' - এ কথা সুখের অভিধানে অতি সুন্দর কথা। যদি সুখের পায়রা ধরতে চাও, তাহলে এই মন্ত্র অবশ্যই মুখস্থ করে নাও।
ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের জন্য রাখ। যা আসে নি তা আসতে দাও।

﴿ أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ আসবেই, অতএব তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। *(সূরা*

নাহল ১ আয়াত)

গর্ভকাল পূর্ণ হওয়ার আগে কি গর্ভপাত করতে চাও? ফল পাকার আগে ফল পাড়লে তা অবশ্যই মিষ্ট হবে না। নদী আসার আগে কাপড় তুলো না, নচেৎ লোকে তোমার খামখা কাপড় তোলা দেখে হাসবে।

যে ব্যক্তি ঈমান রাখে যে, আল্লাহ ছাড়া গায়বের খবর কেউ জানে না, সে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ও গায়বের কোন বিষয়, কোন খবর, কোন ঘটিতব্য বিপদ নিয়ে নিজের কল্পনায় অথবা কারো কুমন্ত্রণায় উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করবে কেন?

যে জানে না যে, সে কবে মরবে, যার জীবন আছে অন্যের হাতে সে কোনদিন ভবিষ্যতের অজানা অদৃশ্য বিষয় নিয়ে, বিপদ, বিঘ্ন, ক্ষতি বা কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা ও আতঙ্ক নিয়ে কালাতিপাত করতে পারে না।

আগামীকে আগত হতে দাও। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিও। যেমন রোগ তেমনি ওষুধ ব্যবহার করো। অতএব যা আজকের তা আজ ভাব। আর ভবিষ্যতের ভাবনা কালকের জন্য রেখে দাও। 'ভাবিলে ভাবনায় ঘিরে।' অতএব তা বাড়িয়ে লাভ কি? তুমি কি বিধির বিধান খন্ডন করতে পারবে? 'যা হবার হবে, ভাবনা কেন তবে?'

বন্ধু আমার! ভবিষ্যতের ভাবনাকে মনে ঠাঁই দিয়ো না। অতীতের ভাবনাকে একেবারে ভুলে যেও।

অবশ্য 'এমন দুঃখ আছে, যাকে ভুলার মত দুঃখ আর নেই।' সুখ পেয়ে দুখের দিনগুলিকে ভুলে যেও না। পুনরায় কালই তোমার দুঃখের দিন আসতে পারে।

দুনিয়ার চিন্তা মাথায় নিও না

'যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।।'

তুমি একজন ছোট্ট মানুষ। তোমার মাথায় যদি কমলা লেবুর মত পৃথিবীটাকে বহন করতে চাও, তাহলে কি তা পেরে উঠবে?

কিছু লোক আছে, যারা ঘুমাবার বিছানায় শুয়ে থাকে, আর তাদের মনের ভিতরে বিশ্বযুদ্ধ চলে। তারই ফলে তাদের প্রেসার ও সুগার বাড়ে! নানান ঘটন-অঘটনের প্রেক্ষিতে নিজেকে পুড়িয়ে দগ্ধ করে। জিনিসের দর বাড়লে ক্ষোভে যেন ফেটে যায়, বর্ষা নামতে দেরী হলে মনে মনে উত্তেজিত হয়, মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে মনের চাঞ্চল্য বেড়ে ওঠে। জন-সংখ্যা বাড়ছে শুনে শঙ্কিত হয়, বিশ্বকাপে অমুক দেশ হেরেছে এবং অমুক দেশ জিতেছে শুনে কখনো নিরাশ হয়, কখনো উদ্দীপিত। এমন লোকেরা সদা সর্বদা এক প্রকার বিরক্তি ও উদ্বিগ্নতার মাঝে বাস করে। মনের ভিতরে কেমন এক প্রকার অস্বস্তি বোধ করে। "যে কোন শোরগোল শুনলে

তারা মনে করে, তা ওদেরই বিরুদ্ধে।"

প্রিয় বন্ধু আমার! এ বিশাল পৃথিবীর ভার তোমার মাথায় নিও না। বিশ্বের ঘটনাঘটন বিশ্বেই ছড়িয়ে থাক, তুমি তোমার বুকে, মাথায় বা পেটে তা বহন করতে যেয়ো না।

কিছু লোক আছে, যাদের হৃদয় ঠিক স্পঞ্জের মত। পানির আকারে যাবতীয় প্রচারিত বিশ্বসংবাদ ও কিংবদন্তি তাদের হৃদয়ে এসে অনায়াসে স্থান পায়। তুচ্ছ বিষয়ে তাদের উৎকণ্ঠা বাড়ে। রটানো গুজবে কান দিয়ে 'ভি-আই-পি'র মত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুরু করে দেয় চোখ বন্ধ করে। ছোট-বড় সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে কেমন যেন এক শ্রেণীর তিক্ততা ও বিড়ম্বনার মাঝে কালাতিপাত করে। এমন হৃদয় যে মানুষকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! তোমার হৃদয় হোক এমন, যাতে বিশ্বের ঘটনাঘটনের পশ্চাতে উপদেশ গ্রহণ করে ঈমানের উপর ঈমান বৃদ্ধি করে। তোমার হৃদয় যেন তাদের মত না হয়, যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিধির বাইরের ঘটনাঘটনের ফলে ভীত-শঙ্কিত ও চকিত হয়। নানা ঘটনা প্রবাহের সামনে তোমার হৃদয় হোক বীরের মত। মন হোক ধীর ও শান্ত। একীন হোক পর্বতের মত নির্বিচল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্ত হোক নির্বিকার। মেজাজ হোক শীতল। অন্তর হোক সংকীর্ণতাহীন।

যদি তুমি সুখ ও শান্তির জীবন চাও, তাহলে সেই ভীরুদের মত হয়ো না, যাদেরকে প্রত্যেক গুজব ও জনরব, কল্পনা ও স্বপ্ন যবাই করে ছাড়ে। বরং বীরের মত সমস্ত অঘটন ও দুর্ঘটনার মোকাবিলা কর। ঘটনা প্রবাহের সাইক্লন থেকেও বেশী শক্তিশালী হও তুমি। সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখে হও পর্বত সদৃশ। অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে। তাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধিতে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।

তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট হয়ো না

কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোক আছে, যাদের চিন্তার বিয়য-বস্তু নিতান্ত নগণ্য। আসলে যারা ছোট, তাদের চোখে ছোট বিষয়কে বড় দেখায়। পক্ষান্তরে যারা বড়, তাদের চোখে বড় ব্যাপারকেও ছোট মনে হয়।

মুনাফিকদের কথাই ভেবে দেখ না; তাদের হিম্মত কত ছোট। তাদের সংকল্প কত অদৃঢ়। জিহাদের দিকে আহবান করলে তারা নানা ওযর-আপত্তি করে। কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়তে চায়। কখনো বলে, "তোমরা এ গরমে বের হয়ো না।" কখনো বলে, "আমাকে ঘরে থাকতে অনুমতি দিন, আমাকে ফিতনায় ফেলেন না।" কখনো বলত, "আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত।" কখনো বলত, "আমাদের আশঙ্কা হয় যে, আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে।" আবার কখনো বলত, "আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি তো প্রতারণা বৈ কিছু নয়!" কত নিকৃষ্ট এসব কথা, কত নোংরা তাদের চিন্তাধারা!

তাদের কাছে প্রধান হল তাদের পেট, প্লেট, গাড়ি ও বাড়ি। তারা আদর্শের সুউচ্চ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না এবং মান-সম্ভ্রমের তারকারাজির প্রতি দৃক্পাত করে না।

আরো কিছু লোক আছে, যারা নগণ্য বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অমুক টিম অমুক টিমের বিরুদ্ধে হেরে গেছে বলে, স্ত্রী বা ছেলে-মেয়েকে ঘিরে, অথবা সামান্য কোন পাগল বা ছোটলোকের কথা শুনে মনে মনে বড় দুঃখিত হয়। এই হল এই শ্রেণীর মানুষদের বিপদ। এদের সময় ব্যয়ের পিছনে কোন মহান উদ্দেশ্য নেই, এদের ব্যস্ততা ও চিন্তার পশ্চাতে কোন বড় লক্ষ্য নেই। পক্ষান্তরে পানি থেকে পাত্র খালি হলে তাতে হাওয়া এসে জায়গা নেবে। সুচিন্তা মন থেকে খালি হলে তাতে কুচিন্তা এসে জায়গা নেবে। সার্থকতার বিষয় মন থেকে বিদায় নিলে অনর্থক বিষয় মনকে পরিবেষ্টিত করবে। অথচ "মুসলিমের শ্রেষ্ঠ ইসলামের লক্ষণ হল, অনর্থক বিষয় বর্জন করা।" একজন বিদ্বান বলেছেন, 'মনের সুখ খুঁজেছি, কিন্তু অনর্থক বিষয় বর্জন করার মত অন্য কিছুতে তেমন সুখ পাইনি।'

যেটা যেমন বিষয় ও কর্ম সেটাকে তেমনি গুরুত্ব, সময় ও যত্ন দাও। যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু হক যথার্থভাবে আদায় কর।

সাহাবায়ে কেরামদের হিম্মত ও উদ্দেশ্য দেখ। তাঁরা গাছের নিচে মহানবীর হাতে বায়আত করে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করলেন। কিন্তু সেখানেই একজন লোক নিজের উঁটের পিছনে থেকে বায়আত থেকে বঞ্চিত হল। ফলে তার ভাগ্যে এল বঞ্চনা ও অসন্তুষ্টি।

রবীআহ বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার নিকট কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি জান্নাতে আপনার সংসর্গ চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'ওটাই (আমার বাসনা)।' তিনি বললেন, "তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।" *(মুসলিম ৪৮৯ নং, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

একদা এক মরুবাসী বেদুঈনের নিকট আল্লাহর রসূল ﷺ মেহমানি করলেন। তিনি তাকে তাঁর নিকট আসতে বললেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?" লোকটি বলল, 'একটি জিন সহ উঁটনী এবং একটি দুধেল বকরী।' মহানবী ﷺ তাকে তা দিয়ে বিদায় করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের কেউ কি বানী ইসরাঈলের বুড়ির মত হতে অসমর্থ হয়?" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বানী ইসরাঈলের বুড়ির ব্যাপার কি হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "মূসা বানী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে যখন মিসর ত্যাগ করতে চাইলেন, তখন তাঁরা রাস্তা ভুলে গেলেন। তাঁদের উলামাগণ বললেন, ইউসুফ মৃত্যুর সময় আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা মিসর থেকে বের হলে তাঁর লাশ না নিয়ে যেন বের না হই। মূসা বললেন, কিন্তু তাঁর কবর চিনবে কে? কেউ বলল, এক বুড়ি তাঁর কবর চেনে। অতঃপর সেই বুড়ির কাছে যাওয়া হলে সে বলল, আমি কবরের খবর বলে দেব। কিন্তু আমার একটি শর্ত ও চাহিদা আছে তা আপনাকে পূরণ করতে হবে। মূসা বললেন, তোমার চাহিদা কি তা বল। বুড়ি বলল, আমি বেহেশ্তে আপনার সঙ্গে বাস করতে চাই! মূসা আল্লাহর নিকট থেকে বুড়ির সেই চাহিদা পূরণের দুআ করলেন। কবর চেনা হল। অতঃপর লাশ সঙ্গে নিলে তাঁরা রাস্তা পেলেন।" *(ইবনে হিব্বান, হাকেম, আবূ য়্যা'লা, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৩নং)*

মহারাজার কাছে চাইলে বড় কিছু চাইতে হয়। আশা করলে বড় আশা করতে হয়। ছোট

মানুষরাই ছোট কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট হয়।

"মূর্খ তুমি গোটা কতক ফুলেই তোমার ভরল প্রাণ,
চাইতে যদি মিলত তোমায় সবটুকু এই ফুল বাগান।"

এই জন্যই লোকে বলে, 'আশা আর বাসা ছোট করতে হয় না।' সামর্থ্যের ভিতরে বড় কাজ বাদ দিয়ে ছোট কাজ নিয়ে তুষ্ট থাকা বড় মানুষের কাজ হতে পারে না।

হিম্মত উঁচু রাখ, মহান কাজে ব্যস্ত থাক, তাহলে সুখী হবে বন্ধু।

অপরের মসীবত দেখে সান্ত্বনা নাও

বালাগ্রস্ত বন্ধু! তুমি কি এ দুনিয়ায় তুমি ছাড়া অন্যান্যকে সুখী মনে কর? না বন্ধু! সত্যি কথা এই যে, এ দুনিয়ায় প্রায় কেউই সুখে নেই। কম-বেশী প্রায় সকলেরই কোন না কোন প্রকারের দুঃখ আছে। প্রায় প্রত্যেক ঘরে রোদনকারী, প্রায় প্রত্যেক গন্ডে অশ্রুর চিহ্ন এবং প্রায় প্রত্যেক হৃদয়ে ক্ষতের দাগ দেখতে, যদি তুমি তা দেখতে পেতে তাহলে।

কত শত বিপদগ্রস্ত, দুঃখে-দৈন্যে ভরা পীড়িত লোক রয়েছে, কত শত ধৈর্যশীল রয়েছে, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? বিপদে তুমি একা নও। বরং তোমার চেয়ে অনেকের বিপদ আরো বড়। অন্যান্যের তুলনায় তোমার বিপদ নিহাতই কম।

ঐ দেখ না অমুক কত দিন ধরে বিছানাগত অবস্থায় রোগজ্বালা নিয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে।

ঐ দেখ না অমুক কত বছর থেকে সূর্যের মুখ দেখে নি, কারাগারে তার রাত-দিন কাটছে।

ঐ দেখ অমুক তার দুটো ছেলে এক সঙ্গে সড়ক-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে।

ঐ দেখ অমুক তার স্ত্রী অবাধ্যা, মাছের কাঁটার মত তার গলায় লেগে আছে।

ঐ দেখ অমুক তার ছেলে অবাধ্য, বড় যন্ত্রণায় দিনপাত করছে।

ঐ দেখ অমুক ঋণগ্রস্ত, কত লাঞ্ছনায় কালাতিপাত করছে।

ঐ দেখ অমুক এতীম হয়ে গেছে, আবার তার সঙ্গে আছে ছোট ছোট ভাই-বোন।

ঐ দেখ অমুক দেশের মানুষের ঘর-বাড়ি কাফেররা ধ্বংস করে দিয়েছে, ঝড়-বন্যায় বিনাশ করে দিয়েছে।

ঐ দেখ অমুক তার মাঠভরা ফসল শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট করে দিয়েছে।

এত শত বিপন্ন লোক দেখে তুমি কি ক্ষান্ত হবে না, উপদেশ নেবে না এবং এ কথা একীনের সাথে মানবে না যে, এ দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা? এ দুনিয়া কেবল সুখের জন্য কারো নয়? জেনে রেখো যে, জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে অপরের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সুতরাং জ্ঞানী বন্ধু আমার! এ সব দেখে তোমার সবর হওয়া উচিত, তোমাকে সান্ত্বনা নেওয়া উচিত। আর তার সাথে সাথে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করা উচিত এবং এই বলা উচিত যে,

[illegible]

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী অফায্‌যালানী আলা কাষীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফযীলা।'

অর্থঃ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৩)*

তোমার কষ্ট বেশী নয় বন্ধু! তোমার থেকে বেশী কষ্ট পেয়েছেন আমাদের নবী ﷺ। এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে প্রিয়তমের এত বড় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও কত কষ্ট পেয়েছেন তিনি, তাহলে তুমি কে? তুমি তাঁর কথা মনে করে মনে সান্ত্বনা নাও।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসীবতগ্রস্ত হবে, তখন সে যেন আমার মসীবতের কথা স্মরণ করে (সান্ত্বনা নেয়)। কারণ, সে মসীবত হল সবার চাইতে বড় মসীবত।" *(ইবনে সা'দ, সহীহুল জামে' ৩৪৭নং)*

গর্ভে থাকতে তাঁর পিতা মারা গেছেন, ছয় বছর বয়সে মাতা ইন্তিকাল করেন, আট বছর বয়সে তাঁর দাদা ইন্তিকাল করেন। সিজদা অবস্থায় উটনীর ফুল তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তায়েফে পাথর মেরে তাঁর পদযুগল রক্তরঞ্জিত করা হয়েছিল, তাঁর আত্মীয় সহ তাঁর সাথে বয়কট করে 'শি'বে আবী তালেব' গিরি-উপত্যকায় অবরোধ করে রাখা হয়েছিল এবং সে সময় তাঁরা চামড়া ও গাছের পাতা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিলেন, মাতৃভূমি থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাঁর কত সহচরকে হত্যা করা হয়েছিল, উহুদ প্রান্তরে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর পবিত্রা পত্নীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছিল, তাঁর ছেলে ও একটি ছাড়া সব মেয়েরা তাঁর জীবদ্দশায় মারা গিয়েছিল, ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছিলেন, কয়েক দিন যাবৎ তাঁর বাড়িতে চুলা জ্বলত না, লোকেরা তাঁকে পাগল, কবি, মিথ্যাবাদী, যাদুকর প্রভৃতি বলে গালি দিয়েছিল, কতবার তাঁকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল - এসব কথা তো তোমার জানা-শোনা বা পড়া আছে।

আরো জান যে, করাত দিয়ে মাথা চিড়ে যাকারিয়া নবীকে হত্যা করা হয়েছে, ইয়াহয়া নবীকে খুন করা হয়েছে, ইবরাহীম নবীকে আগুনে ফেলা হয়েছে, চরম বালা দেওয়া হয়েছিল আয়্যুব নবীকে, যখন তিনি নিজ প্রতিপালককে বলেছিলেন,

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣ ﴾

অর্থাৎ, আমাকে দুঃখ-কষ্ট ঘিরে ধরেছে। আর তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া ৮৩ আয়াত)*

মসীবতে ফেলা হয়েছে ইউনুস নবীকে, আর তখন তিনি বলেছিলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

আলাইহিমুস সালাতু অস্‌সালাম।

এ ছাড়া খঞ্জর মেরে শহীদ করা হয়েছে দ্বিতীয় খলীফা উমারকে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে খুন করা হয়েছে তৃতীয় খলীফা উষমানকে এবং ছোরা মেরে হত্যা করা হয়েছে চতুর্থ খলীফা আলীকে। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

বড় বড় ইমামগণকে প্রহার করা হয়েছে, তাঁদেরকে জেলে বন্দী রাখা হয়েছে, কত শত

নেক লোকদেরকে কতভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সবর করেছেন। অতএব তুমি কি তাঁদের অনুসরণ করতে ভুলে যাবে বন্ধু?

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনো তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হও নি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রসূল ও তার সাথে ঈমানদারগণ বলেছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৪ আয়াত)*

নিজ ভাগ নিয়ে তুষ্ট রহ

অনেক সময় মনে হয় যে, অমুক অনেক সুখে আছে, অমুকের ভাগ্যটা খুব ভাল, অমুকের স্বামী ভাল, অমুকের স্ত্রী ভাল, অমুকের ছেলেমেয়েরা ভাল ইত্যাদি। তা যদি সত্য হয়েই থাকে তাহলে তোমার করণীয় কি বন্ধু? দুনিয়া নানা রঙে রঞ্জিত, নানা ঢঙে সুসজ্জিত, নানা বর্ণে চিত্রিত। বিচিত্র এই জগতে আলো-আঁধারের মত সুখ-দুঃখ পাশাপাশি বিচরণ করে। মানুষের ভাগে কখনো এটা পড়ে কখনো ওটা। একে অপরকে দূর থেকে দর্শন করে ভাবে অমুকের ভাগ্যটা ভাল।

'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ও পার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ও পারে।'

আসলে তুমি তোমার ছেলেমেয়ে অথবা স্ত্রী অথবা বন্ধু অথবা মা-বাপ অথবা বাড়ি-গাড়ি অথবা চাকুরি-কর্ম যার কথাই বল না, কেউ বা কিছুই খাঁটি সুখদায়ক নয়। তাদের কাছে যেমন সুখের আশা করা যায়, তেমনি দুঃখেরও আশঙ্কা করা যায়। তারা এই দিকে ভাল হলে ঐ দিকে খারাপ হতে পারে। আবার ঐ দিকে ভাল হলে এই দিকে খারাপ হতে পারে।

সুতরাং তোমার ভাগ্যে যেমনই পড়েছে, তেমনই নিয়ে নিজের ভাগ মনে করে তুষ্ট হও। তাদের খারাপের উত্তাপকে ভালোর শীতলতা দিয়ে স্বাভাবিক করে নাও। অমঙ্গলের ময়লাকে মঙ্গলের সাবান দিয়ে ধুয়ে সাফ করে দাও। তাছাড়া উপায় কি বন্ধু?

পরিবর্তন করার কথা ভাবছ? মা-বাপ, ছেলেমেয়ে তো পরিবর্তন করতে পার না। চাকুরি, বন্ধু এবং সহজ না হলেও স্ত্রী পরিবর্তন করতে পার, কিন্তু ভাগ্য তো পরিবর্তন করতে পার না ভাই!

অতএব যাকে যেরূপে পেয়েছ, তাকে সেইরূপে বরণ করে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা কর। আর কল্পনা ও খেয়াল থেকে বহু ক্রোশ দূরে থাক। কারণ খেয়ালী পোলাও খেয়ালেই খাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। আর বাস্তবে তা না পেলে, সে ব্যাপারে আফশোসের কি আছে বন্ধু?

ঐ দেখ না মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পরিজনকে দুনিয়ার সৌন্দর্য বলে আখ্যায়ন করেছেন; *(সূরা আলে ইমরান ১৪, সূরা কাহফ ৪৬ আয়াত)* আবার তিনিই বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য ফিতনাস্বরূপ।" *(সূরা তাগাবুন ১৫ আয়াত)*

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (দ্বীনী বিষয়ে অন্যায় থেকে তওবা করলে ও পার্থিব বিষয়ক অন্যায়ে) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(ঐ ১৪ আয়াত)*

ধন-সম্পদ কম হলেও নিজেকে দুর্ভাগ্যবান হতভাগা মনে করো না বন্ধু। তোমার আদর্শ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আম্বিয়া-আওলিয়া, আয়েম্মা-উলামা গরীব ছিলেন। কিন্তু তাঁরা অল্পে তুষ্ট ছিলেন বলেই মনের ধনী ছিলেন। আসলে অল্পে তুষ্ট হৃদয় দরিয়া থেকেও বিশাল, ধনীর থেকেও বড় ধনী।

তোমার ডিগ্রি কম হলেও যদি আল্লাহ তাতে বর্কত দেন, তাহলে বড় বড় ডিগ্রিধারীদের থেকেও ভাল কাজ করতে পারবে।

তুমি তোমার সৌন্দর্য, রঙ, বর্ণ, স্বাস্থ্য, বংশ, কণ্ঠস্বর, উপার্জন ইত্যাদি নিয়ে তুষ্ট থাক, কারণ তা তো মহাবন্টনকারীর বন্টন। মহান আল্লাহ বলেন,

"ওরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! পার্থিব জীবনে আমিই ওদের জীবিকা ওদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর ওরা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।" *(কুঃ ৪৩/৩২)*

প্রিয় বন্ধু আমার! তোমার চেয়ে যারা উপরে তাদের দিকে দেখো না; বরং তোমার থেকে যারা নিচে তাদের দিকে দেখ। তাদের থেকে তুমি উত্তম। তোমার কাছে আল্লাহর যে নিয়ামত আছে, তা ওদের কাছে নেই। তোমার যে সুখ আছে, তারা সে সুখ হতে বঞ্চিত। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের উপরে যারা তাদের দিকে দেখো না; বরং তোমার নিচে যারা তাদের দিকে দেখ। এতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তুচ্ছজ্ঞান করা হবে না।" *(বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ তোমার ভাগে যা ভাগ করে দিয়েছেন তা নিয়ে তুষ্ট হও, তুমি সবার চাইতে বড় ধনী হয়ে যাবে---।" *(সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "সে ব্যক্তি সফল মানুষ, যে মুসলিম এবং তার অবস্থা সচ্ছল। আর আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতেই তাকে তুষ্ট রেখেছেন।" *(মুসলিম)*

অধিক পাওয়ার আশাবাদী বন্ধু আমার! যাকে অল্প তুষ্ট করতে পারে না, তাকে অধিকও সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আর সে লোভীরূপে পরিচিত হবে। আরবী কবি বলেন,

النفس تجزع أن تكون فقيرة　　والفقر خير من غنى يطغيها

وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت　　فجميع ما في الأرض لا يكفيها

জেনে রেখো যে, অল্প তুষ্ট হওয়া আমানতের দলীল, আমানত রক্ষা করা শুকরিয়ার দলীল, শুকরিয়া আদায় আধিক্যের দলীল, আর আধিক্য সম্পদ চিরস্থায়ী হওয়ার দলীল।

সুতরাং জীবনে কি পেলাম, আর কি পেলাম না, তার হিসাব-নিকাশ না করে যা পাচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। মনের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ যত বেশী বাড়বে, মন তত বেশী দুঃখ ও কষ্ট পাবে। কাঙ্ক্ষিত বস্তুর তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি কামনাতে সুখ নেই, বরং বাসনা থাক আর না থাক, যা পাওয়া গেছে তাতেই আনন্দলাভ হল প্রকৃত সুখ।

সুখের স্বপ্ন দেখার বন্ধু আমার! তোমার জীবনে চাহিদা যত বাড়াবে, দুঃখ তত বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে চাহিদা অল্প করলে তুমি সুখী হবে। অল্পে তুষ্ট থাকলে অপরের মুখাপেক্ষী হবে না এবং অনেক সময় পরের রূঢ় ব্যবহারও সহ্য করতে হবে না। অল্পে তুষ্ট হলে জীবনে লাঞ্ছনা আসে না। অল্পে তুষ্টিই আনন্দের মূল এবং তা-ই সর্বোত্তম সুখ।

হ্যাঁ, দুনিয়াদারীর যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা হল বুদ্ধিমানের কাজ, তা বলে দ্বীনদারী, বিদ্যা ও সদ্‌গুণ যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং সে ব্যাপারে আরো বৃদ্ধির লোভ থাকা প্রত্যেক ভালো মানুষের কর্তব্য।

মনের মত মানুষ পাবে না

'বিচিত্র বোধের এ ভুবন;
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি করে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের;
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।'

বিচিত্র এই ধরাধামে যত রকমের চেহারা আছে, তত রকমের মন আছে। এক জনের চেহারার সাথে যেমন অপরজনের চেহারার মিল থাকে না, তেমনি একজনের মনের সাথে অপরজনের মনের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। জিভের স্বাদ এক এক জনের এক এক রকম। চোখের পছন্দ; রঙ-রূপও তেমনি সকলের কাছে এক নয়।

তোমার যেই বল, তার মন সর্বদিক থেকে তোমার মনের মত নয়। তোমার অর্ধাঙ্গিনীও নয় সর্বদিক দিয়ে তোমার মন মত। তোমার ছেলেমেয়েও ভিন্নরূপ।

আদর্শ জীবন সবারই হয় না। একজন নবী, সাহাবী ও ওলীর জীবন আদর্শ জীবন। তা বলে কি সবাই তাঁদের মত হতে পারে?

আসিয়া, রহিমা, মারিয়াম, খাদিজা, আয়েশা, ফাতেমা, রমিসা প্রভৃতি নারীর জীবন আদর্শ জীবন। তা বলে কি সব নারীই তাঁদের কারো মত হতে পারবে? তোমার মন হয়তো চাইবে

যে, তোমার অর্ধাঙ্গিনী তাঁদের কারো মত হোক। কিন্তু না হলে তো মন বিষ করে লাভ নেই বন্ধু! নসীহত কর, তরবিয়ত দাও। এ ছাড়া গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তো করতে পার না তুমি।

একেবারে একশ' পারসেন্ট্ মনের মত বন্ধু কেউ পেয়েছে বলে দাবী করলে সে মিথ্যুক। তদনুরূপ স্ত্রীও। অনেক সময় আদর্শগত কলহ নিয়ে স্বামী যদি বলে, তুমি কেন আয়েশার মত নও? তাহলে স্ত্রী তার উত্তরে বলে, তুমি কেন নবীর মত নও? তুমি নবীর মত হলে আমি আয়েশার মত হতে পারতাম। স্বামী বলে, তুমি আয়েশার মত ব্যবহার দেখালে আমিও নবীর মত তোমাকে ভালোবাসতাম। আর তার মানে এই যে, আদর্শগত দিক দিয়ে উভয়েই অসম্পূর্ণ। কেউ কাউকে মেনে নিতে রাযী নয়। অথচ ছোট যদি বড়কে মেনে নেয়, তাহলে দাম্পত্য জীবনে অনেক সুখভোগ করা যায়। আর দুটি মন যদি দুধে-চিনির মত মিশে গিয়ে এক হয়, তাহলে তো বেহেশ্তী সুখের আশা করা যায় সেই দাম্পত্যে।

আদম হতে দুনিয়ার শেষ মানুষটি পর্যন্ত কেউ কারো মত নয়। তোমার মতও কেউ নয়। তোমার খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবে দুনিয়াতে এমন কেউ নয়। তোমার স্ত্রীর মতও কেউ নয়। তোমার স্ত্রীর মনমত তুমিও চলতে অপারগ। অতএব কেউ তোমার মনের বিপরীত চললে, তাতে দুঃখ কিসের বন্ধু?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾

অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য একটি দিক আছে, সে সেদিকে অভিমুখ করবে। অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮- আয়াত)*

হ্যাঁ, যথাসম্ভব একে অন্যের মনের কাছাকাছি হতে চেষ্টা কর। আর জেনে রেখো যে, সম্পূর্ণরূপে কেউ কারো মনের মত হতে পারবে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

মন পরিষ্কার রাখ

যে মানুষের মন পরিষ্কার ও সরল, সে মানুষ সুখী মানুষ। পক্ষান্তরে যে মানুষের মনে কূট ও কুটিলতা আছে, কিন্তু ও কিনা আছে, হিংসা ও বিদ্বেষ আছে, রাগ ও ক্রোধ আছে, লোভ ও লালসা আছে, অহংকার ও গর্ব আছে, কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা আছে সে মানুষ সুখী নয়।

যে মানুষ নিজের সুখে অপরকে অংশী করতে চায় না, তার মন সংকীর্ণ। কিছু খেতে খেতে কেউ এসে গেলে খাওয়াতে ভাগ যাওয়ার ভয়ে মন সংকুচিত হলে সে মন সংকীর্ণ। যে মহিলা সতীন পছন্দ করে না, বরং সতীনের নামে জ্বলে, সে বড় সংকীর্ণমনা।

যার মন পরিষ্কার ও বক্ষ প্রশস্ত সে বড় ধনী ও বড় সুখী। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "দেহের মধ্যে এমন একটি পিন্ড আছে; যা ভাল হলে সারা দেহ ভাল। নচেৎ তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ। আর তা হল হৃৎপিন্ড বা হৃদয়।" *(বুখারী + মুসলিম)*

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, 'হৃদয় হল রাজা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল তার সৈন্য। সুতরাং

রাজা ভাল হলে সৈন্যরা ভাল হবে, আর রাজা খারাপ হলে সৈন্যরাও খারাপ হবে।'

মানুষের জন্য মন পরিষ্কার রাখা জান্নাতী লোকের পরিচয়। যেহেতু জান্নাতীদের গুণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে। *(সূরা হিজ্‌র ৪৭ আয়াত)*

কিয়ামতের দিনে তারাই পরিত্রাণ পাবে, যাদের হৃদয় হবে পবিত্র। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। অবশ্য যে পবিত্র অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে (সে উপকৃত হবে)। *(সূরা শুআরা ৮৮-৮৯)*

মহানবী ﷺ-এর পরে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন মনের দিক দিয়ে সবার থেকে পরিষ্কার। সুফিয়ান বিন দীনার বলেন, আমি আবূ বিশ্‌রকে বললাম, 'আমাদের পূর্ববর্তীদের আমল সম্বন্ধে কিছু বলুন।' তিনি বললেন, 'তাঁরা তো অল্প আমল করতেন, কিন্তু অধিক সওয়াব পেতেন।' আমি বললাম, 'তা কি করে? তিনি বললেন, 'যেহেতু তাদের মন ছিল পরিষ্কার।'

আবূ দুজানা ﷺ মৃত্যুরোগে শায়িত ছিলেন। তাঁর চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিল। এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, 'আমার নিকট ভরসা রাখার মত দুটি আমল ছাড়া অন্য কিছু নেই; প্রথম এই যে, আমি অনর্থক কোন কথা বলতাম না এবং দ্বিতীয় হল মুসলিমদের জন্য আমার হৃদয় পরিষ্কার ছিল।'

এঁরাই তাঁরা এবং তাঁদের অনুসারীরা; যাঁদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা ওদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভ্রাতাগণকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো স্নেহশীল দয়াময়। *(সূরা হাশ্‌র ১০ আয়াত)*

হৃদয় নির্মল না হলে মনের শান্তি হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আরো বিভিন্নমুখী ক্ষতি দেখা দেয় মানুষের জীবনে। যেমন ঃ-

(১) মহান আল্লাহর সাপ্তাহিক ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার লোকেদের আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। সে সময় প্রত্যেক (শির্কমুক্ত) মুমিন বান্দার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তবে সেই বান্দাকে মাফ করা হয় না, যার (কোন মুসলিম) ভায়ের সহিত তার বিদ্বেষ আছে। উভয়ের জন্য বলা হয়, "ওদের উভয়কে মিটমাট না করে নেওয়া পর্যন্ত বর্জন কর।" *(মুসলিম ২৫৬৫, ইবনে মাজাহ ১৭৪০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

(২) মন পরিষ্কার না থাকলে শেষ পরিণাম ভাল হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। যে ব্যক্তি ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রেখে মারা যায় সে দোযখে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে ৭৬৫৯নং)*

(৩) হৃদয় প্রশস্ত না হলে অপরের ছিদ্রান্বেষণ ও গীবত করে থাকে এমন হৃদয়ের মানুষ। অথচ উভয়ই বড় নোংরা জিনিস। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমদ ৪/৪২০, আবূ দাঊদ ৪৮৮০, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৭৯৮৪নং)*

অপরের দোষ না দেখলে অথবা তা দৃষ্টিচ্যুত করলে মনের মধ্যে কষ্ট আসে না। আর দোষ দেখে রোষ হলে মনে অশান্তি আসে। মনঃক্ষুন্ন হতে হয় দোষ দেখে প্রতিশোধ নেওয়ার বা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করলে।

সংসার জীবনেই দেখ, যে বাড়িতে কথায় কথায় দোষ ধরার লোক থাকে, সে বাড়িতে শান্তি থাকে না। কথায় কথায় ভুল ধরে অশান্তি সৃষ্টি করে অনেকে। অনেকে ভুল ধরতে গিয়ে চুলও ধরে ফেলে। অনেকে মুহূর্তের জন্যও পান থেকে চুন খসতে দেয় না। আর এই জন্যই লোকে বলে, 'পেটের শত্রু ভুঁড়ি, ঘরের শত্রু বুড়ি।' অথচ যদি দোষ দেখে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে সবাই শান্তি পায়। যেখানে দয়া আছে সেখানে শান্তি আছে। শক্তির পরিবর্তে যদি ভক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অধিকাংশে সেখানে লাভ হয় বেশী।

পরন্তু দোষ করে যে দোষ স্বীকার করতে চায় না, সে যে দোষ করছে তা বুঝতে পারে না, এমন শিশু বা শিশুসুলভ মনের মানুষের দোষ দেখে রোষ করা এক প্রকার আহাম্মকী। কারণ, তাতে মনঃকষ্ট হয়, অশান্তি বাড়ে অথচ দোষ সংশোধন হয় না।

অবশ্য এ হল সেই দোষের কথা যা সাংসারিক জীবনে স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে শরীয়ত বিরোধী অন্যায় হলে তার প্রতিবাদ অবশ্যই করতে হবে। নচেৎ,

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

আর মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমদ, আসহাবে সুনান)*

তিনি আরো বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমদ ৪/৩৬৪, আবূ দাঊদ ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাঊদ ৩৬৪৬ নং)*

শত্রু হলেও যদি জবাবে বন্ধুত্ব ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়, তাহলে মনে

শান্তি পাওয়া যায় এবং শত্রুর মনেও আজব পরিবর্তন আসে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ ۝ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ۝ ﴾

অর্থাৎ, মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; এর ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। আর এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই, যারা ধৈর্যশীল। এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই, যারা মহা ভাগ্যবান। *(সূরা হা-মিম সাজদাহ ৩৪-৩৫ আয়াত)*

যার মনে কোন প্রকার অসরলতা বা কুটিলতা নেই সে কিন্তু এ ধরনের আদর্শ ব্যবহার প্রদর্শন করে সুখ লাভ করে থাকে। সে তাকে দান করে, যে তাকে দেয় না। তার সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে, যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। যে তাকে চোখে দেখতে চায় না, সে তাকে আসন পেতে বসতে দেয়! 'দুশমনকে উঁচু পিঁড়ে'র নৈতিক নীতি অবলম্বন করে। আর সেই লোকই হয় চিত্তজয়ী। তার ফলে দুশমনের দুশমনি থেকে অনেকটা রেহাই পেয়ে যায়।

পক্ষান্তরে দুশমনের দুশমনির প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে মনে স্বস্তি পাওয়া যাবে না। প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় মগ্ন থাকলে শত্রুর কাছে থেকে পাওয়া আঘাত শুকাতে চাইবে না। আর আঘাত তাজা হতে থাকলে মনে সুখও নষ্ট হয়ে যাবে।

মনের ভিতর এক প্রকার অহম ভাব থাকে বলেই মানুষ অপরকে নিয়ে উপহাস ও ব্যঙ্গ করে। রসিকতা করলেও রসের মাঝে যশহানির খোঁচা থাকে তাহলে এমনিতেই অপরের হৃদয়ে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে শান্তির ছায়া অপসারিত হয় উভয়ের মাথার উপর থেকে। আর এ জন্যই মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

"হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন কোন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।" *(সূরা হুজরাত ১১ আয়াত)*

মন যার পরিষ্কার নয় বিষয়াসক্তি তার বেশী থাকে। সে আসক্তি সৃষ্টি করে লোভ। আর লোভে পাপ, পাপেই মৃত্যু।

পক্ষান্তরে উদার ও পরিষ্কার মনের মানুষ সুখ পায় ক্ষমা প্রদর্শন করে, ভক্তি দেখিয়ে, দয়া প্রদর্শন করে, ত্যাগ স্বীকার করে, অপরকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিয়ে, নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্য তাই পছন্দ করে।

তুমি যত বড়ই হও এবং অপরে যত ছোটই হোক না কেন, তার প্রতি তোমার উদারতা বড় আনন্দ আনে। আনন্দ আনে তোমার মনে, আনন্দ আনে তার মনেও। তাকে যেখানে সবাই ঘৃণা করে, সেখানে তুমি যদি ভালোবাসো, তাহলে তার আনন্দ হওয়ারই তো কথা।

'শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া-
'ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।'

'প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই?'

ছোটকে ভালোবাসলে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ হয়। নীচুমানের মানুষদের সাথে মনকে উদার রাখলে সকলের মনে শান্তি আসে।

শান্তির জন্য মুখ খরচের দরকার আছে। প্রয়োজন আছে অপরকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানানোর। ইসলামী সালাম প্রচার করে মানুষকে স্বাগত জানিয়ে শান্তি লাভ করা যায়, সম্প্রীতি অর্জন করা যায়। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ হল, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মু'মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতেও পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা তোমাদের আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ৫৪ নং)*

শান্তিপ্রিয় বন্ধু আমার! তোমার বিরোধী লোক অবশ্যই থাকবে। তবুও কারো বিরোধিতায় তুমি পরোয়া করো না। কারণ, সেটাই হল উদারতার লক্ষণ।

তোমার দুশমন যদি দুশমনি দিয়ে তোমার সম্মুখীন হয়, তাহলে তুমি হিকমত দিয়ে তার মোকাবিলা কর। এটাই হবে তোমার উদারতার নিদর্শন।

জেনে রেখো যে, দুনিয়ার মধ্যে দুটি জিনিস সর্বক্ষণের জন্য স্মরণীয়; আর তা হল প্রভু ও মৃত্যু। পক্ষান্তরে দুটি জিনিস সর্বদার জন্য ভুলে থাকতে হয়; আর তা হল লোকের প্রতি তোমার উপকার এবং তোমার প্রতি লোকের অপকার বা দুর্ব্যবহার। এই বিস্মৃতিতে তোমার মন পরিষ্কার থাকবে।

মনকে সুখে রাখতে ব্যবহার কর, সুবচন, বিনয়, হাস্যমুখ, ত্যাগ ও অনুগ্রহ। যেহেতু সুবচনে প্রেম, বিনয়ে মর্যাদা, হাসি মুখে আনুগত্য, ত্যাগে নেতৃত্ব এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে ভ্রাতৃত্ব লাভ হয়।

সুখান্বেষী বন্ধু আমার! কেউ যদি তোমার সমালোচনা বা গীবত করে, তাহলে তাকে উপহার দিও। কারণ সে তোমাকে কিয়ামতে তার সওয়াব দান করবে। তাকে ক্ষমা করে দিও, তার এই সমালোচনার কোন ওযর বা অজুহাত আছে মনে করো। আর জেনে রেখো যে,

'সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।'

মনকে পরিষ্কার করতে তুমি তোমার ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি ব্যবহার কর। ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই তো মানুষের জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই। পক্ষান্তরে ভুলকে ফুলরূপে পরিবর্তন করতে পারলে তোমার জীবনের প্রত্যেকটা রাত্রি হবে ফুলশয্যার রাত্রি।

জীবনে তুমি ভাল হতে চাইলেও সকলের কাছে ভাল হতে পারবে না। মানুষের মনস্তুষ্টির নাগাল মোটেই সহজসাধ্য নয়। সংসারে সবাইকে খুশী রাখা সবচেয়ে বড় দুরূহ কাজ।

অতএব ক্ষমা করে সুখী হও। তবে অবশ্যই জেনে রাখ যে, ক্ষমা করা মহৎ গুণ। কিন্তু ক্ষমাশীলতাকে কোন হিংস্র পশু বা মানুষের জন্য প্রয়োগ করলে জানতে হবে বিপদ অনিবার্য।

তারা বলে গেল, 'ক্ষমা করো সবে'; বলে গেল, 'ভালোবাসো-
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো।'

আত্মসমালোচনা কর

দুনিয়াতে সুখ পেতে হলে পরের ভুল ধরো না অথবা তা ক্ষমা কর। আর সেই সাথে নিজের ভুল ধর এবং নিজেকে ক্ষমা করো না। সর্বদা আত্মসমীক্ষা কর আর দেখ যে, তোমার কৃত ভুলের জন্য কারো মনে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে কি না?

ভুল তোমার হতেই পারে। আর তা হলে লোকে তোমার হিসাব নেওয়ার আগে তুমি নিজে নিজের হিসাব গ্রহণ কর। খবরদার! নিজের দোষকে দোষ বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করো না। আলী ﷜ বলেন, 'যে অপরের কোনও দোষ দেখে অপছন্দ করে অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা পছন্দ করে, সে মূর্খ মানুষ। আর যে নিজের দোষ নিজে দেখার চেষ্টা করে সে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করা থেকে দূরে থাকতে পারে।'

সত্যই তো, যে ব্যক্তি পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি নিজের ছিদ্র সংশোধনে প্রয়াসী হবে। আর যে নিজের ছিদ্র অন্বেষণ করবে, সে পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতে পারবে না।

নিজের দোষ ভেবে নিজে লজ্জিত হলে পরের জিহ্বা-ছোবল থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কলহ ও মতবিরোধের সময় নিজেকে দোষারোপ করতে হয়। সেই সত্যিকারের মানুষ, যে অন্যের দোষ-ক্রটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করে।

শায়খ সা'দী বলেন, 'যদি তুমি নিজেকে তিরস্কার করতে পার, তাহলে তোমাকে অপরের তিরস্কার শুনতে হবে না।'

সুখের খোঁজে সফরকারী বন্ধু আমার! নিজের অপরাধ নিজে বুঝতে শিখ, তা স্বীকার কর, তাতে অনুতপ্ত হও এবং তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ কর।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ তার ভায়ের চোখে কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়!" *(সহীহুল জামে ৮০১৩নং)*

অতএব খবরদার! আনারস বলে, কাঁঠাল ভায়া তুমি বড় খসখসে! গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোমার গায়ে কেন গন্ধ? চালনী বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছ্যাঁদা। নিজের পানে চায় না শালী, পরকে বলে ডাবরাগালি। -এই অবস্থা যেন তোমার না হয়।

'তুমি আপনার দোষ কভু দেখিতে না পাও হে,
দেখি, পাইলে পরের দোষ শতমুখে গাও হে।
সদা জীবের জীবন হরি সুখে মাংস খাওহে,
তবু জীবহত্যাকারী বলে ব্যাঘ্রে দোষ দাও হে।'

পক্ষান্তরে যে জিনিস তোমার নিজ এখতিয়ারে উপার্জিত নয়, তা তোমার আছে এবং অপরের নেই বলে নিজেকে গর্বিত ও অপরকে তুচ্ছ ভেবো না। তোমার রূপ-রঙ তুমি নিজে

এখতিয়ার করে নিয়ে আসনি, তদনুরূপ অপরও তাই; সে তার কুশ্রী রূপ ও কালো রঙ নিজস্ব এখতিয়ারে রচনা করেনি। সবই তো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দান। তবে তা নিয়ে তোমার গর্ব ও অপরকে খর্ব করার কি অর্থ হতে পারে? তুমি কি ঐ কালো থেকে সর্বগুণে উত্তম?

তুমি মহানবীর অনুসরণ না করে দাড়ি রাখলে না, অথবা ছোট দাড়ি রাখলে। উপরন্তু যে তাঁর অনুসরণে লম্বা দাড়ি রাখল, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কর। তাহলে সমালোচনার পাত্র কি তুমি নিজে নও? ভেবে দেখ অপরকে হারামখোর বলার আগে তুমি চুগোলখোর কি না?

আর গুণধর বন্ধু আমার! সকল মানুষ যখন তোমার বাহ্যিক গুণগ্রাম দেখে প্রশংসা করবে, তখন তোমার উচিত, তোমার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি অন্বেষণ ও বিচার করা। যাতে তুমি তোমার নিজের গোপন ত্রুটি সংশোধন করে নিজের আত্মার কাছে বিশ্বস্ত হতে পার। আর তা লোকের ঐ প্রশংসা থেকে বহুগুণ উত্তম।

তবে জেনে রেখো যে, চোখ সব কিছু দেখতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় মনের। মনের স্বচ্ছ আয়নায় নিজের দোষ নিজের কাছে ধরা পরে। আর তখনই নিজেকে সংশোধন করার তওফীক লাভ হয়।

বলা বাহুল্য শান্তির জন্য, সুখের জন্য, পরের আগে ঘরের সংশোধন সাধন কর। জ্ঞানী মানুষ নিজের মনকেই অধিক শাসিয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা নিজে করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।

'চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।'

সদা হাস্যমুখ রহ

শত দুঃখের মাঝেও একটু হাসি মুখে থাকার চেষ্টা কর। তোমার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা থাক। মুচকি হাসি দিয়ে তুমি তোমার মুসলিম ভাই তথা আত্মীয় স্বজনের মন জয় কর। শত কাঁটার মাঝে ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর থাক তোমার মুখশ্রী। ভেবে দেখ, ফুলের জীবন কত স্বল্প। কিন্তু সেই স্বল্প জীবনের পরিধি কত মহিমাময়।

এতে কষ্ট আছে, লোকপ্রদর্শন আছে জানি, তবুও এটি এমন একটি ব্যবহার, যার দ্বারা তুমি সুখের রাজ্য পেতে পার। কারণ, এটি একটি কল্যাণমূলক কর্ম। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সহিত তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৫৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

হাসি-কান্নার নামই হল জীবন। অতএব কাঁদতে কাঁদতে হাসতে শিখা জীবনের একটা বড় শিক্ষা। এরই মাঝে আছে সুখের রহস্য। কবি বলেন,

'বিপদের দিনে হস্না রে মন হস্নেকো ম্রিয়মান,
হাসিমুখে থাক তোর সে ভাবনা ভাবিছেন রহমান।

গোলাপ ছিঁড়িয়া কেহ কি পেরেছে হাসি তার কেড়ে নিতে?
ধূলায় পড়েও হাসি ফোটে তার পাপড়িতে পাপড়িতে।'

লোক সমাজে পরে যাওয়ার জন্য যত ভাল পোশাক আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল মধুর মেজাজ, মিষ্টমুখে মিষ্ট হাসি। হাসিমুখো লোকের বন্ধু বেশী। সে যেখানে যায়, সেখানে সফলতা লাভ করে। কোন কাজে বিফল হয় না। লোকে তাকে ভালোবাসে। আর তাতেই সে পায় পরম আনন্দ, চরম সুখ।

'একটু খানি স্নেহের কথা একটু ভালবাসা,
গড়তে পারে এই দুনিয়ায় শান্তি-সুখের বাসা।
একটু খানি অনাদর আর একটু অবহেলা,
ঘুচিয়ে দিতে পারে মোদের সকল লীলা-খেলা।'

দুঃখী বন্ধু আমার! তোমার এ দুঃখের জন্য চিকিৎসার খোঁজ কর। জেনে রেখো যে, এ সময়ে তোমার মুখের একটু কষ্ট হাসিই অব্যর্থ ঔষধ। দেখ না চেষ্টা করে, রাগের সময় মুচকি হেসে, দুঃখের সময় মৃদু হাসির ঝিলিক দেখিয়ে, স্মিতমুখে ঘর-পর সকলের সাথে সাক্ষাৎ করে, কথা বলে সুখের নাগাল পাও কি না?

মুখে হাসি দেখাও। হাসি তোমাকে সুন্দর করবে। সেই স্ত্রী স্বামীর কাছে বেশী সুন্দরী যার ওষ্ঠাধরে স্বামীর জন্য সদা হাসির উপহার থাকে। আর সেই স্বামী স্ত্রীর কাছে রসের নাগর যার মুখে থাকে গাম্ভির্যের সাথে মৃদু হাসির মাধুর্য।

মুচকি হেসে মানুষকে আনন্দ দাও, যে ব্যথা দেয় তাকেও তোমার হাসির ঝিলিক দেখাও। প্রথম প্রথম তার গা বিষিয়ে উঠলেও কিছু পরে তার মনের আমূল পরিবর্তন আনবে। এক সময় সকলের মনে সুখের আমেজে খুশী ভেসে উঠবে।

কষ্টের সময়েও মিষ্টি হাসি হাসতে জানা একটা বড় গুণ। এই গুণ তোমার থাকলে তুমিই বড় সুখী বন্ধু!

বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থেকো না

মনকে ফ্রি করার জন্য যে সব জিনিসের দরকার তার মধ্যে বাইরে বেড়াতে যাওয়া অন্যতম। সব সময় বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকলে মানুষের মন বিরক্তি, এক ঘেয়েমি ও তিক্ততায় ভরে ওঠে। একই কক্ষে অথবা একই জায়গায় বাস না করে বাইরে গিয়ে একটু মুক্ত বায়ু সেবন করা, পার্কে, ফুলের বাগানে, নদী বা সমুদ্র-সৈকতে মধুর দৃশ্য দেখে এলে মনটা খোলা যায়। অবশ্য যেখানে অবৈধ কিছু দেখার আশঙ্কা আছে, সেখানে যেও না। যেমন গান-বাজনা শুনে বা নোংরা ছবি দেখে মন ফ্রি করার চেষ্টা করো না। নচেৎ, হিতে বিপরীত হবে। মন আরো জ্যাম হয়ে যাবে।

চিন্তাগ্রস্ত বন্ধু আমার! দুশ্চিন্তায় বসে আছ তুমি। আর তোমার চারিপাশে প্রকৃতি কি মধুর সুখ নিয়ে আনন্দে যেন নৃত্য করছে। তোমাকে আনন্দ দান করার জন্য, তোমার দুশ্চিন্তাকে মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য সুমহান সৃষ্টিকর্তা কত কিই না সৃষ্টি করেছেন! নদীর কুলকুল

তান, জলপ্রপাতের উচ্ছল বারিধারা, বারিদের বারিপাত, বিশাল সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গমালা, দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি, সুউচ্চ পর্বতমালা, সুবিশাল বন-বনানী, শস্য-শ্যামলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ, এ সব কিছু এক এক রূপে তোমাকে ভুলাবার জন্য তৈরী আছে। আল্লাহ এ সব সৃষ্টি করেছেন তোমার জন্য, তোমার সুখের জন্য, তোমাকে তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ۝ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃজনে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে) যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি বৃথা সৃষ্টি করনি। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

অতএব বন্ধু আমার! দুঃখের কথা ভুলে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে একবার চিন্তা করে দেখ, যূঁই-যুথিকায় তোমার নাসিকা লাগিয়ে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে নিঃশ্বাস নিয়ে দেখ তোমার সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

অবসর দূর কর

ইসলামী অভিধানে 'অবসর' বলে কোন শব্দ নেই। কারণ, অবসর হল এমন চোর যে মুসলিমের পঞ্চসম্পদ (জান, ঈমান, জ্ঞান, মান, ধন) হতে কিছু না কিছু চুরি করে। কর্মহীন মানুষের মন ও জ্ঞানকে চিন্তাগ্রস্ত ও বিক্ষিপ্ত করে তোলে।

তোমার ইহকাল অথবা পরকালের যে কোন একটা কাজ করে অবসর দূর কর। বাইরের কাজ না থাকলে বাড়ির সংসারের কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, যে কোন গোছ-গাছ বা পারিপাট্যের কাজ কর। তা না হয় ওঠ, নামায পড়, কুরআন পড়, একটা বই পড়, অথবা অপরের কোন কাজ করে দাও।

যদি করতে পার তাহলে জেনে রেখো যে, তোমার এই সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিশ্বের ডাক্তারগণ তোমার জন্য ৫০% সুখ ও স্বস্তির নিশ্চয়তা নেবেন। তাছাড়া তুমি হয়তো দেখে থাকবে যে, কুঁড়ে ঘরের শ্রমিকরা কিভাবে পরিশ্রম করতে করতে পাখীর মত গান গায়, সারাদিন মেহনতের পর রাত্রে মনের সুখে গভীর নিদ্রা যায়।

দুঃখী বন্ধু আমার! মনের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে তোমার অবসর দূর কর। কোন একটা কাজ ধর। কাজের ব্যস্ততা তোমার সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। কাটা ঘায়ের মলম হবে তোমার ঐ কর্মব্যস্ততা।

আর যদি তুমি গরীব হও, তাহলে বসে থেকে চিন্তা কিসের? গরীব থাকা অবশ্যই ভালো নয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। বন্ধুর বন্ধুত্ব চলে যায়। স্ত্রীর নির্মল ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পয়সা থাকলে বন্ধু অনেক হয়, স্ত্রীও ভালোবাসে বেশী। সংসারে ভালোবাসার সাথে অভাবের বড় শত্রুতা আছে। ভালোবাসা অভাবের ছায়া দেখতেও রাযী নয়। বরং অভাবের বর্ষণ দেখলেই ভালোবাসা ছাগলের মত পলায়ন করে। তুমি গুণধর হলেও 'দরিদ্র-দোষে, গুণরাশি নাশে।'

কর্মহীন অলস গরীব বন্ধু আমার! কবির এই কথা মনে রেখো ঃ-

'পিতামাতা সম বন্ধু আর কেহ নাই রে আর কেহ নাই রে,
সুখের সময়ে হয় সুহৃদ্ সবাই রে সুহৃদ্ সবাই রে।
শরীরার্ধ বল যারে সেই বনিতাই রে সেই বনিতাই রে,
নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে যদি ধন নাই রে।'

নিষ্কর্মা বন্ধু আমার! অন্ন-চিন্তা চমৎকারা, অন্ন বিনা ছন্নছাড়া। অন্ন নাই ঘরে, তার মানে (ইজ্জতে) কিবা করে? দুনিয়ার নীতি হল, ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনেরে মার লাথি। এ সংসারে ধান নাই যার, মান নাই তার। ভাত নাই যার, জাত নাই তার। আর যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি।

অতএব বসে কেন বন্ধু আমার! কিছু করতে লেগে যাও। কাপুরুষের মত মা-বাপ অথবা স্ত্রী অথবা ছেলে-মেয়ের চোখে পানি দেখো না। পকেটে পয়সা না থাকলে পরের দুঃখে আহা করে কোন লাভ নেই বন্ধু! পয়সার জন্য তুমি হালাল পথ বেছে নাও। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। বেকার কেন? বেকারীর জাফরান থেকে কাজের ধুলো অনেক ভাল। ঐ দেখ তোমার প্রতিপালক তোমাকে মেহনত, চেষ্টা, পরিশ্রম ও কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করছেন, তিনি বলেন,

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের জন্য এ ছাড়া কিছুই নেই, যা সে চেষ্টা করে। *(সূরা নাজ্ম ৩৯ আয়াত)*

তিনি তাঁর ইবাদত করতে বলেছেন। কিন্তু ইবাদত শেষ হলে বসে না থেকে তাঁর অনুগ্রহ ও রুযী অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর নামায শেষ হলে তোমরা বাইরে (মাঠে-হাটে) ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর আল্লাহকে (কর্মক্ষেত্রে) অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

একদা হযরত উমার মসজিদে এক ব্যক্তিকে ই'তিকাফে বসে থাকতে দেখে বললেন, তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কোত্থেকে হয়? বলল, আমার ভাই তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য এবং আমার জন্য রোযগার করে। উমার বললেন, তাহলে তোমার ভাইই তোমার চেয়ে বড় আবেদ।

নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা কোন মুসলিমের উচিত নয়। কাজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যখন আছে, তখন অপরের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করাও নিকৃষ্ট আচরণ। পরের গলগ্রহ হয়ে থাকাও লাঞ্ছনার ব্যাপার। অতএব কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! মুখে 'সুখ চাই, সুখ চাই' বললেই চলবে না। সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন আছে। যে পরিশ্রম করতে জানে, সুখের অধিকার তারই। যে জয় করে, ভোগ করবার অধিকার তারই সাজে। যে গাছে চড়তে পারে ফল খাওয়ার অধিকার তারই। যে দল ভেঙ্গেছে সে-ই বড় কৈ খাবার অধিকার রাখে। No Wark No Bread.

কাজ তো খারাপ জিনিস নয় বন্ধু! লেখাপড়া যখন কর নি, চাকুরি যখন পাও নি, তখন কিছু একটা তো করতেই হবে। কাজের ভিতর দিয়ে তোমাকে বাঁচতে হবে। কর্ম তো মানুষকে উজ্জীবিত করে। গতিশীল করে।

জেনে রেখো বন্ধু আমার! কর্মের মধ্যে অবিরাম আনন্দ পায় যে, সেই কর্মঠই বড় সুখী মানুষ।

মেহনতের কাজ করতে তোমার বাধা কিসের? মর্যাদাহানি কর্মে হয় না, হয় আলস্যে। আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের আবার অভাব?

ধৈর্য তো ধরতেই হবে, সহ্য তো করতেই হবে। ফুলের সৌরভে হৃদয়-মন মাতোয়ারা করার আগে কাঁটার আঁচড় তো সহ্য করতেই হবে। তাহলে

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'

রাস্তার কষ্ট, রোদ-বৃষ্টি ইত্যাদি দেখে যে পথিক ভয় পায়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। পথ বহু দূরের। নদী-নালা, খাল-বিল, পর্বত-জঙ্গল, বরং সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়েও তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে। লক্ষ্য ঠিক রাখ উপলক্ষ্য সহজ হয়ে যাবে। চাও, খোঁজ তুমি পাবে, দুয়ারে করাঘাত কর, তোমার জন্য দরজা খোলা হবে।

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

আর জীবনের সফলতার খোঁজে প্রথম ব্যর্থতায় তুমি দমে যেও না। কারণ, এই ব্যর্থতাই তোমার সফলতার প্রথম ধাপ। সাফল্যের জন্য দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায় অত্যন্ত জরুরী। জীবনের লক্ষ্য ঠিক রেখে এক পা-দু পা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও, সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবে।

রুযী ও বর্কতের চাবিকাঠি হাতে কর

মেহনত করলেই রুযী আসে না। পরিশ্রম করলেই ফল লাভ হয় না। এর কারণ হল, প্রত্যেক মানুষের রুযী মহান সৃষ্টিকর্তা মেপে দিয়েছেন। নির্ধারিত করেছেন প্রত্যেকের লাভ ও নোকসান। যা মাপা আছে তার কম অথবা বেশী পাওয়ার উপায় নেই। রুযীর চাবি আছে আল্লাহর হাতে। সেই চাবি যদি হাত করতে পার, তাহলে তুমি রুযী পাবে। তোমার রুযীতে অফুরন্ত বর্কত পাবে।

তোমার ক্ষেত থেকে রুযী আসে জানি, কিন্তু তা আসে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে। তোমার ব্যবসা থেকে রুযী আসে জানি, কিন্তু তা আসে আল্লাহর অনুমতিক্রমে। তোমার চাকুরি থেকে তুমি রুযী পাও মানি, কিন্তু তা আসে আল্লাহর অনুমোদনে। তোমার পরিশ্রমের ফলে তোমার রুযীর যোগাড় হয় জানি, কিন্তু তা আল্লাহর ব্যবস্থা অনুসারে। যেখান থেকে যেভাবেই তুমি রুযী পাও তা আল্লাহর অনুমোদনে এবং তাঁরই ইরাদার কারণে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ﴾

অর্থাৎ, বল, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাদেরকে রুযী দান করে থাকে?' বল, 'আল্লাহ।' *(সূরা সাবা ২৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই আমাদের রুযীদাতা। যে রুযী পাই সেই রুযীতে বর্কতদাতা তিনি। অনেকের রুযী আছে, রুযী কামায়ের পথ আছে। কিন্তু তবুও যেন, 'নাই নাই, চাই চাই, খাই খাই।' 'হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।' আর তার মানেই হল তার রুযীতে বর্কত নেই। কারণ, রুযীতে বর্কত থাকলে অল্পতে কাজ হয়। অভাব থাকে না। পক্ষান্তরে বর্কত না থাকলে বেশীতেও কাজ হয় না। অভাব ঘোচে না।

বর্কত শুধু রুযীতেই নয়; বরং বর্কত হয়, সংসারের সকল জিনিসের উপর। বাড়ি, গাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, ধন-সম্পদ, শিল্প, ব্যবসা, চাষ, কামাই, ইল্‌ম, জ্ঞান, দাওয়াতী কর্ম প্রভৃতিতে। আর এ সব কিছুতে বর্কত চাইলে নিম্নের উপদেশ ও পথ-নির্দেশনা গ্রহণ কর। ইন শাআল্লাহ বর্কত পাবে। অবশ্য সেই সাথে কাজ করে যাওয়া তোমার দায়িত্ব।

(১) আল্লাহর তাকওয়া মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখ। এটি এমন একটি ধনভান্ডার যার বর্কতে তোমার জীবনের সব কিছু প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, তাহলে তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বর্কতসমূহের দরজা খুলে দিতাম।" *(সূরা আ'রাফ ৯৬ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উদ্ধারের পথ সহজ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রুযী দান করেন, যে জায়গা থেকে রুযী আসার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না।" *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

(২) আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখ। "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন।" *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)* মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি

যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" *(আহমাদ)*

(৩) অভাব পড়লে মাথা উঁচু রাখ এবং আল্লাহর কাছে তোমার অভাবের কথা জানাও; কোন মানুষের কাছে নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যার অভাব আসে, সে যদি তা মানুষের কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তার অভাব দূর হয় না। কিন্তু যার অভাব আসে, সে যদি তা আল্লাহর কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তিনি বিলম্বে অথবা অবিলম্বে তার অভাব দূর করে দেন।" *(তিরমিযী)*

(৪) নিয়মিত কুরআন তিলাঅত কর; কুরআন হল বর্কতময় জিনিস।

(৫) নিয়মিত দুআতে বর্কত প্রার্থনা কর, অপরকে রুযী দান করে তার কাছে বর্কতের দুআ নাও।

(৬) নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাক। কারণ, তাতে রুযী আসে। মহান আল্লাহ হযরত নূহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা।" *(সূরা নূহ ১০-১২)*

(৭) যতটাই রুযী তুমি পাও, যে হালেই তুমি থাক, সর্বহালেই তুমি রুযীদাতার শুক্রিয়া আদায় কর। কারণ, শুক্রে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" *(সূরা আলে ইমরান ১৪৪)* "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে, আমি অবশ্যই তোমাদের ধন আরো বৃদ্ধি করব। আর কৃতঘ্ন হলে আমার আযাব নিশ্চয়ই কঠিন।" *(সূরা ইবরাহীম ৭)*

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুক্র আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুক্র আদায়ের নিয়ম হল, প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত। দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুক্র আদায় করা। তৃতীয়তঃ কাজেও শুক্র প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তাঁরই সন্তুষ্টির পথে; গরীব-মিসকীনদের অভাব মোচনের পথে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার পথে এবং তাঁর শরীয়তকে বাঁচিয়ে রাখার পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুক্রী বা কৃতঘ্নতা হবে।

(৮) মন থেকে লোভ দূর কর। কারণ, লোভে বর্কত বিনাশ হয়। মহানবী ﷺ হাকীম বিন হিযাম ﷺ-কে বলেন, "হে হাকীম! এ মাল হল (লোভনীয়) তরোতাজা ও সুমিষ্ট জিনিস। সুতরাং যে তা মনের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে তা মনের লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।" *(মুসলিম)*

(৯) ব্যবসা-বাণিজ্যে সত্য কথা বল। মিথ্যা বিলকুল বর্জন কর। মহানবী ﷺ বলেন,

ব্যবসায়ী (ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে) যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

(১০) সূদ খাওয়া তথা সর্ব প্রকার হারাম উপার্জন বর্জন কর। ব্যাংকের সূদও সূদ। অতএব তাও ত্যাগ কর। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৬)* মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

সূদখোর সূদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন, পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বর্কত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ থেকে।

(১১) সকাল সকাল কাজ সার। ফজরের পর সকালের মাঝে বর্কত আছে। নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।" আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সাহাবী সখর ؓ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ২২৭০নং)*

(১২) খাবারে বর্কত পেতে সুন্নাহ অনুযায়ী খাও। মহানবী ﷺ বলেন, "খাবারের মধ্যভাগে বর্কত নামে। অতএব তোমরা মাঝখান থেকে খেয়ো না।" *(বুখারী)*

(১৩) তোমার কাছে যেটুকুই মাল আছে, তা থেকে কিছু করে দান কর। আর মোটেই বখীলী (কার্পণ্য) করো না। কারণ, দানে মাল বর্কত লাভ করে এবং কার্পণ্যে মাল ধ্বংস হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা যা (আল্লাহর পথে) খরচ কর, আল্লাহ তার স্থলে আরো প্রদান করে থাকেন।" *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)* আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তান! 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

"যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

(১৪) তালেবে ইল্‌মকে ইল্‌ম তলবে সহায়তা কর। ইল্‌ম অনুসন্ধানে তাকে অর্থ দিয়ে

যথার্থ সহযোগিতা কর। তাতেও তোমার শিল্প, বাণিজ্য ও জীবিকা বর্কতলাভ করবে। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাদীস ও ইলম শিক্ষা করত। অপরজন কোন হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। একদা এই শিল্পী ভাই নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, তার ঐ (তালেবে ইল্ম) ভাই তার শিল্পকাজে কোন প্রকার সহায়তা করে না। তা শুনে তিনি তাকে উত্তরে বললেন, "সম্ভবতঃ তুমি ওরই (ইল্ম শিক্ষার বর্কতে) রুযী পাচ্ছ!" *(তিরমিযী ২৩৪৫, সিঃ সহীহাহ ২৭৬৯নং)*

রুযী-সন্ধানী বন্ধু আমার! আল্লাহই মহারুযীদাতা, তুমি তাঁরই কাছে রুযী চাও এবং তার জন্য যথার্থ উপায় অবলম্বন কর। সেই রুযী খেয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি তোমাকে সুখী করবেন।

সামাজিক কাজে মন দাও

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া সে চলতে পারে না। কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একজনকে অপরজনের সাহায্য নিতেই হয়। যে ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, হয় সে ফিরিশ্তা, না হয় সে পশু।

তোমার রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা থাকলে এবং কাজ না থাকলে সামাজিক কাজে হাত দাও। পরের উপকার কর। গ্রামের, শহরের বা দেশের মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, এতীমখানা, হাসপাতাল বা জনকল্যাণমূলক অন্য কোন সংস্থা কিভাবে চলছে বা চলবে তার জন্য মাথা ঘামাও। দেখ তাতে সুখ পাবে, আনন্দ পাবে।

মু'মিনের সমব্যথী হও, তোমার অর্থ দ্বারা, পদ ও মর্যাদা দ্বারা, দৈহিক খিদমত দ্বারা, সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দ্বারা, সান্ত্বনা ও দুআ দ্বারা।

তবে এসব কিছু নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে কর। আর অন্য কোন নিয়ত যেন না থাকে তাতে।

যদি বল, তুমি একজন ছোট মানুষ। তোমার দ্বারা কি সমাজের কোন উপকার সাধিত হবে? হতে পারে তুমিই সমাজের বড় উপকারী হবে। ছোট হয়েও বড়র চেয়ে বেশী কাজ করতে পারবে। কাজে লেগে দেখ, তুমি কত বড়।

'অতিশয় ক্ষুদ্র নরে যে হিত সাধন করে
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপ পয়ঃ প্রায় তৃষ্ণা শান্ত হয়
বারিধি কি পিপাসা নিবারে?'

অতএব ছোট হলেও ছোট কাজ দিয়েই শুরু কর তোমার সামাজিক জীবন ও 'খিদমতে খাল্ক।' দুঃখীর দুঃখের সমব্যথী হও।

তেলা মাথায় তেল সবাই দিতে পারে। রুক্ষ মাথায় বেল অনেকে ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু গরীব-দুঃখীদের চোখে পানি দেখে কতজন লোকের চোখে পানি আসে?

চিন্তাশীল বন্ধু আমার! তুমি একজন মহান আদর্শবান যুবক। তুমি যদি হৃতসর্বস্বদের

সমব্যথী না হও, তাহলে হবে কে?

'যদি তুমি ওহে ধীর দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন
তব অশ্রু নিরখিয়া দুখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ?'

একজন মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য আয়না স্বরূপ। মুসলিমরা পরস্পর দুটি হাতের মত। একটা হাত অপর হাতকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি অট্টালিকার মত; যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" *(বুখারী + মুসলিম)* আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কোন একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতের একটি দুঃখ-কষ্ট তার জন্য দূরীভূত করে দেবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে। *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

একজন মুসলিমের প্রতি মুসলিমের অধিকার অনেক। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর নির্দেশিত বিশিষ্ট ৬টি অধিকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ; যা আদায় করলে মানুষ সামাজিক জীবনে সুখী হতে পারে। বরং তার ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে। (১) সালামের জবাব দেওয়া। (২) দাওয়াত কবুল করা। (৩) উপদেশ (বা পরামর্শ) চাইলে উপদেশ (বা পরামর্শ) দেওয়া। (৪) হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে দুআ দিয়ে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা। (৫) অসুস্থ হলে দেখা করে সান্ত্বনা দেওয়া। (৬) মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ করা। *(মুসলিম)*

এ ছাড়া তাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া তার অন্যতম অধিকার।

সমাজে বাস করতে গিয়ে শান্তি পেতে চাইলে যথাসাধ্য সমাজের মানুষের খিদমত কর। সমাজের অধিকাংশ লোকের কাছে তুমি প্রিয় হতে পারলে তুমি একজন সুখী মানুষ। আর সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করতে নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ কর ঃ-

সর্বস্তরের মানুষের সাথে সর্বদা সত্য কথা বল।
নিজেকে নিজে সম্মান দাও। অর্থাৎ নিজের সম্মান নিজে রক্ষা কর।
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।
কারো গীবত করো না।
পরের কাছ থেকে শোনা খবর যাচাই করে দেখো।
রটনা ও গুজবে কান দিও না।
প্রত্যেক বিষয় বুঝার পর মন্তব্য কর।
এক পক্ষের কথা শুনে বিচার করে বা রায় দিয়ে বসো না।
নিজের বা আত্মীয়র ক্ষতি হলেও ন্যায় বিচার কর।
হক কথা বলো, তবে কৌশলের সাথে।
রাগ ও শান্তির সময় উচিত ও ন্যায্য কথা বলো।
বিতর্কিত বিষয়, ব্যক্তিত্ব বা জামাআতের ব্যাপারে কড়া মন্তব্য করা থেকে দূরে থাক।

অজ্ঞ লোকদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না।
নিজের ভুল স্বীকার কর এবং অপরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হও।
যৌথ ভুলের ব্যাপারে নিজেকেই অধিক দোষারোপ কর।
কারো ত্রুটি দেখলে সরাসরি তাকে আঘাত করো না।
নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন কর।
নিজের উপর আস্থা রাখ।

সামাজিক বন্ধু আমার! সামাজিকতা বজায় রাখতে গিয়ে পরহেযগারী ভুলে বসো না। কারণ, তুমি তো জান, সমাজের সকলের কাছেই তুমি ভাল হতে পারবে না। আর সমাজকে রাজী রাখতে গিয়ে যদি তোমার প্রতিপালক নারাজ হন, তাহলে তোমার নাকের বদল নরুন পাওয়া হবে। তাতে তোমার জল খেতে গিয়ে ঘটি হারিয়ে যাবে। অতএব ফল কি তাতে?

পরের কারণে স্বার্থ বলি দাও

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি দান অথবা কোন সৎ কাজ অথবা লোকেদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে করে (তাতে মঙ্গল আছে)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করবে, আমি তাকে মহাপ্রতিদান প্রদান করব। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

এ জগতে শুধু দিয়েই যাও এবং কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করো না, তাহলে তাতে তুমি পরম শান্তি পাবে। পরের দুঃখে দুঃখী হও। তোমার সুখ এলে অপরকে তাতে শরীক কর। কারণ, সুখ ভাগ করলে বেড়ে যায়, কিন্তু দুঃখ ভাগ করলে কমে যায়।

এ সংসারে যে কাউকে দুঃখ দেয় না এবং সকলের কল্যাণ কামনা করে, সেই অত্যন্ত সুখী মানুষ। সমস্ত বিশ্বসংসার সুখী হোক - এই ইচ্ছা থাকলে আমরা সকলে সুখী হতে পারব।

পরীক্ষা করে দেখ, নিজের জন্য খরচ করার চেয়ে বিতরণ করার মাঝেই বেশী সুখ নিহিত আছে। আনন্দ বিতরণ করার অর্থ আনন্দ লাভ করা। ভোগে নয়, ত্যাগেই আছে মনুষ্যত্বের বিকাশ।

'আত্মসুখ অন্বেষণে আনন্দ নাহিরে
বারে বারে আসে অবসাদ,
পরার্থে যে করে কর্ম তিতি ঘর্ম নীরে
সেই লভে স্বর্গের প্রাসাদ।'

উপকার সাধন শুধু কর্তব্যই নয়, এক অনুপম আনন্দও বটে। এর দ্বারা পরম তৃপ্তি ও সুখ লাভ হয়।

ফুল আপনার জন্য ফোটে না, ফোটে অপরের জন্য। তুমি তোমার জীবনকে অপরের জন্য

প্রস্ফুটিত কর, তাতে পরম আনন্দ পাবে।

অবশ্য মোম বা ধূপবাতির মত হওয়া জরুরী নয়; অর্থাৎ নিজের ক্ষতি করে অপরের উপকার করা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং তুমি নিজের ক্ষতি না করেই অপরের উপকার কর। মানুষের জীবনে ত্যাগ থাকা ভাল, কিন্তু তা যেন অর্থবহ হয়।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! সুখের সন্ধানে তুমি হয়তো বহু কিছু করেছ, করছ ও করবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় হয়তো এটাই পেয়েছ যে, এ জীবনে কোন সুখ নেই। এ জীবনের কোন দাম নেই। আসলে সেটাই কি ঠিক?

'নাই কি রে সুখ? নাই কি রে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয়?
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী 'পরে?
বল্ ছিন্ন বীণে, বল্ উচ্চৈঃস্বরে,
না, না, না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে করো গিয়ে রণ,
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি-
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ সুখ' করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।'

সুখ ও আনন্দের পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত। রিক্ত হৃদয় থেকে তিক্ত দুঃখ বিদূরিত করে তা সুখ দিয়ে সিক্ত করে দিতে পারলে তুমিই হবে প্রকৃত সুখী।

জীবনের মহিমা আছে ভালোবাসা দেওয়ায়, ভালোবাসা পাওয়ায় নয়। দান দেওয়ায়, দান নেওয়ায় নয়। সেবা করায়, সেবা পাওয়ায় নয়। চিনি খাওয়াতে মহিমা নয়; বরং চিনি

হওয়াতে জীবনের মহিমা লুকিয়ে থাকে।

উত্তম যে সে অপকারীরও উপকার করে। শুধুমাত্র উপকারীর যে উপকার করে, সে মধ্যম। সে অধম যে নিজের উপকার চিন্তায় পরের উপকার করে। আর অতি নীচ সে যে নিজের উপকারের স্বার্থে পরের অপকার করে।

যে শুধু নিজের কথা ভাবে সে সুখী হতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন থাকলে, কেবল নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করলে মানুষ স্বার্থপর হয়। আর স্বার্থপর মানুষকে অন্য মানুষ ভালোবাসে না। বিধায় সে বহু সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

আল্লাহর ওয়াস্তে স্বার্থত্যাগ করলে, তার বিনিময়ে আল্লাহ উত্তম বস্তু দান করে থাকেন। ইবরাহীম, ইউসুফ, আসহাবে কাহফ, মারয়্যাম, মুহাজেরীন তাই পেয়েছিলেন; যাঁদের ইতিহাস মুসলিমের অজানা নয়।

অতএব মনে সংকল্প নাও যে, প্রত্যহ যথাসাধ্য সর্বজন কল্যাণের কোন না কোন কাজ করবে। অপরের উপকার করবে, কোন বিপদগ্রস্ত বা পীড়িত ব্যক্তিকে দেখা করে সান্ত্বনা দেবে, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে, পথহারাকে পথ দেখাবে, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করবে, কোন কষ্ট ভোগকারীর কষ্ট দূর করবে, কোন এতীমের মাথায় হাত বুলাবে, কোন দুর্দশাগ্রস্ত চোখের পানি মুছবে, কোন অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়াবে, কোন দুর্বলের জন্য সুপারিশ করবে, কোন আলেমকে সম্মান করবে, ছোটকে স্নেহ এবং বড়কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

পরোপকারী বন্ধু আমার! পরোপকার হল আতরের মত। যে আতরের সুগন্ধে মাতোয়ারা হয় আতর-ওয়ালা নিজে, যে ক্রয় করে সে এবং যে পাশে বসে থাকে সেও।

মানুষের কল্যাণ কর। সেই কল্যাণের মাঝে লুক্কায়িত আছে মহাকল্যাণ। মানুষ তো দূরের কথা, একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে পাপী বেহেশ্ত্ যেতে পারে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক পিপাসিত হলে এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে ক্ষমা করলেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

সাহাবারা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

এক বর্ণনায় আছে, এক বেশ্যা মহিলা ঐরূপ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। *(মুসলিম ২২৪৫নং)*

পরের উপকার করলে, পর আপন হয়ে যায়; এমন কি আত্মীয় থেকেও নিকটের হয়। উপকারী উপকৃতের বন্ধুতে পরিণত হয়। আর তোমার দ্বারা যদি জাতির কল্যাণ হয়, তাহলে তুমি মহান মানুষ।

মহান বন্ধু আমার! তুমি লোকের ভালোবাসা চাইলে, তাদের সুখের পথ প্রশস্ত কর। লোকের ন্যায়পরায়ণতা চাইলে, তোমার হৃদয়কে তাদের জন্য উন্মুক্ত কর। নেতৃত্ব চাইলে, তাদের জন্য তোমার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। আর তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা কামনা করলে তোমার কিছু ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ কুরবানী দাও।

মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর

সামাজিক জীবনে সুখ কামনা করলে সমাজের সাথে সুন্দর ব্যবহার দেখাতে হবে। মানুষের সাথে সচ্চরিত্রতা ব্যবহার করতে হবে। অপরের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। অপরকে হৃদয় দিলে তবেই অপরের হৃদয়ের মালিক হওয়া যাবে। হৃদয় না দিলে অপরের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহ তথা কুধারণা আসতে বাধ্য।

'দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই   যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।।'

সুন্দর ব্যবহার মানুষকে সুন্দর করে তোলে। তার রূপ-সৌন্দর্য না থাকলেও সমাজে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রশংসা হয়। তার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের বিকাশ ঘটে সৌজন্যমূলক ব্যবহারের ফলেই। আর পরকালের প্রতিদান তো রয়েছেই পরকালে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে ৯৭নং)*

তিনি বলেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮-নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৭৯নং)*

তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(সহীহুল জামে ১৭৪৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "মানুষকে সুন্দর চরিত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ (সম্পদ) অন্য কিছু দান করা হয় নি।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৯৭৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক

পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী ৬৩৫ নং, মুসলিম ২৩২১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯ নং)*

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলিও সংযোজিত রয়েছে, "আর অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।"

একদা অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।"

আর অধিকাংশ কোন্ অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।" *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।" *(আহমদ ৪/ ১৯৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১নং)*

অপরের কাছে ভক্তি অর্জনে পরম সুখ আছে। কিন্তু সেই অর্জনের পথ তোমাকে করে নিতে হবে। শ্রদ্ধা করতে জানলেই অন্যের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যাবে।

তুমি যেখানেই থাক, সুন্দর চরিত্রের বিকাশ ঘটাও। তোমার মাঝে যে সৌরভ আছে তা আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ুক। কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে হাসি মুখে করো, কথা বললে মিষ্টি ভাষায় বলো, কেউ কথা বললে ধ্যান দিয়ে শুনো, অঙ্গীকার করলে যথারূপে পালন করো, মূর্খদের সাথে মজাক করো না, হক ও সত্য যে গ্রহণ করে না তার মজলিসে বসো না, বেআদবের সাথে ওঠাবসা করো না, যে কথা ও কাজে অপমানিত হতে হয় সে কথা ও কাজে থেকো না। এসব কিছু এক একটি সচ্চরিত্রতা।

সামাজিক জীবনে সুন্দর চরিত্র ও ব্যবহার প্রদর্শন করার বিভিন্ন পথ আছে। আচার-আচরণে দয়া প্রদর্শন, ব্যবহারে নম্রভাব প্রকাশ, কথাবার্তায় হিকমত ও সুকৌশল অবলম্বন, উপদেশে মার্জিত ও সুমিষ্ট ভাষা প্রয়োগ, তর্ক-বিতর্কে সৌজন্য ব্যবহার এবং মন্দের বিনিময়ে উত্তম প্রদান করা তারই এক একটা পথ।

এ ছাড়া উপকারীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, ভালো কথা বল নচেৎ চুপ থাক, অপরের প্রতি

সুধারণা রাখ এবং সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বল। এ সব তোমার সুন্দর আচার-আচরণের এক একটি দলীল।

সুখী জীবনাভিলাষী বন্ধু আমার! সুন্দর চরিত্র জীবনের অলঙ্কার ও অমূল্য সম্পত্তি। তোমার শিক্ষা যত উচ্চই হোক না কেন, তোমার চরিত্র সুন্দর না হলে তুমি মূর্খ। বৃক্ষ যত উচুই হোক না কেন, তাতে যদি ফুল না ফোটে, ফল না ধরে তাহলে তা জ্বালানি ছাড়া আর কি? শিক্ষায় বড় হয়ে তুমি এমন ফুলের মত হয়ো না, যাতে কাঁটা বেশী থাকে অথচ কোন সৌরভ থাকে না। 'চরিত্রের মাঝে যদি সত্যের শিখা দীপ্ত না হয়, তাহলে জ্ঞান, গৌরব, আভিজাত্য, শক্তি সবই বৃথা।'

এ পৃথিবীতে মানুষই হল সবচেয়ে বড়। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ হল সচ্চরিত্রতা। মৃত্যুর পরে যার জন্য মানুষ মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকে, তা হচ্ছে তার ব্যবহার। ব্যবহার সুন্দর হলে পরিচয়ের জন্য অন্য কিছু দরকার হয় না। পরিচিত অনেকে হতে পারে, কিন্তু সুপরিচিত হতে অতিরিক্ত গুণের দরকার। আর সেই গুণ হল সচ্চরিত্রতা।

এ জগতে যার মুখ মিষ্টি, তার বন্ধু অনেক। পক্ষান্তরে যার মুখে মৃদু হাসি নেই বা যে মুচকিয়েও হাসতে জানে না, সে লোক-সমাজে সমাদৃত নয়। এমন লোক যদি ব্যবসাও খুলে তার ব্যবসা চলে না, শুধু তার রুক্ষ ব্যবহারের কারণে।

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান ধন হল, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান। সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হল, মূর্খতা। আর সবচেয়ে উচ্চ কৌলিন্য হল সচ্চরিত্রতা। সুন্দর চরিত্র ছাড়া উচ্চ বংশের পরিচয় দেওয়া হাস্যকর।

মানুষের মাঝে একটি গুণ থাকলে, তা দ্বীন হওয়া উচিত। দু'টি থাকলে দ্বীন ও ধন, তিনটি থাকলে দ্বীন, ধন ও লজ্জা। চারটি হলে দ্বীন, ধন, লজ্জা ও সদাচরণ। পাঁচটি থাকলে দ্বীন, ধন, লজ্জা, সদাচরণ ও বদান্যতা। আর দ্বীন ও ধন হলেই এ সব সম্ভব ও সহজ।

'গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়,
নাহি সুখ ম্লানমুখ চিরদুখ সয়।
গুণবান্ মতিমান্ ধনবান্ হয়,
নাহি দুখ হাস্যমুখ সদা সুখময়।'

জীবনে চলার পথে যে স্বাচ্ছন্দ্য চায়, তাকে তিনটি কাজ করা উচিত; তাকে নিজের সংলাপ মধুর করতে হবে, আচরণ সুন্দর করতে হবে এবং রুচিবোধ মার্জিত করতে হবে।

সুঠাম দেহের যুবক বন্ধু আমার! সৃষ্টিকর্তা তোমার আকৃতিকে সুন্দর করেছেন, তুমি তোমার ব্যবহারকে সুন্দর কর। এমন ব্যবহার প্রদর্শন কর, যাতে তুমি বেঁচে থাকলে লোকে যেন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় এবং মারা গেলে লোকে যেন তোমার জন্য কাঁদে। বল তো, 'এর মত সুখ কোথাও কি আছে?'

সুখ-কামী বন্ধু আমার! সুখের সন্ধানে তোমার চরিত্র সুন্দর হোক। সুন্দর হোক ভালো-মন্দ সকলের সাথে। কারো সঙ্গে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করেও যদি সে তোমার সাথে অধমের মত ব্যবহার করে, তাহলে তাকে বল, 'তুমি অধম, তা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

অপ্রয়োজনীয় সংসর্গ বর্জন কর

দুনিয়ার জিন্দেগী একটি সফরের নাম। সফরে একা হলে কষ্ট হয় বড়। প্রয়োজন সুহৃদ সাথীর। মনের মত একটা সঙ্গী হলে তার সাথে সফর কষ্টবোধ হয় না, কথা বলে জান ভরে, মনের কথা খুলে বলে মন হাল্কা হয়, বিপদে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, বড় কাজে পরামর্শ পাওয়া যায়, কাছের লোকেরা দূর ভাবলে সে তখন আপন ভেবে কাছে করে নেয়। কাছের লোকেরা কিছু পেলে প্রশংসা করে, না পেলে করে বদনাম, আর মরার পর করে বদ্দুআ। পক্ষান্তরে একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু কোন কিছু পাওয়ার আশা করে না। অথচ মরার পর দুআ করে।

একজন সৎ ও জ্ঞানী বন্ধু ফলদার গাছের মত; যার নিচে বসলে সুশীতল ছায়া পাওয়া যায় এবং উপরে উঠলে সুমিষ্ট ফল পাওয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধু অবশ্যই একটি সুখের সামগ্রী। আর এমন বন্ধু পাওয়াও বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এ ছাড়া বেশী বেশী বন্ধুত্ব করায় অশান্তি আছে, যাকে তাকে বন্ধু মনে করাতে বিপদ আছে। বিশেষ করে মূর্খ বন্ধুর চাইতে বুদ্ধিমান শত্রু অনেক ভাল। খল বন্ধুর চাইতে শত্রু অনেক ভালো। স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্রের চেয়ে অনেক ভাল। খারাপ সঙ্গীর চেয়ে একাকী থাকা অনেক ভাল। বিবেকবর্জিত ব্যক্তির মিত্রতা ভয়ঙ্কর; তার চেয়ে বোধহীন শত্রু ভাল। যে মানুষ উপকার করে ভুলে না (বরং তার দাবী রাখে) এবং অপরের ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে না সে মানুষ বন্ধু হওয়ার চেয়ে বন্ধুহীন থাকা অনেক ভাল।

একটা রাক্ষস যদি একজন মানুষকে না খেয়ে এবং তার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে উল্টা তাকে আদর করে আর বলে যে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তবুও সে ব্যক্তি কোনদিন রাক্ষসকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে নিজের বাঁচার আশা থেকে নিরাশ হয়ে যায়। চরিত্রহীন ব্যক্তিরা যখন কারো সাথে প্রেম বা বন্ধুত্ব করতে চায়, তখন সেও অনুরূপ ভয় পায়। আর ভয় করাটাই স্বাভাবিক। নচেৎ বিপদগ্রস্ত হতে হয় তাকে।

আম্র বিন আলা আসমায়ীকে দেওয়া এক উপদেশে বলেন, 'ভদ্রকে অপমান করলে সাবধান থেকো, অভদ্রকে সম্মান দিলে সাবধান থেকো, জ্ঞানীকে বিরক্ত করলে, আহমককে ঠাট্টা করলে এবং পাপীর সংসর্গে পড়লেও সাবধান থেকো।

'কষ্ট পাও নাহি খাও বরঞ্চ সে ভাল,
ভিক্ষা কর প্রাণে মর ঘুচিল জঞ্জাল।
যে বান্ধব স্ব-বিভব গর্বিত হৃদয়,
তবু সবে নাহি লবে তাহার আশ্রয়।'

ইবরাহীম বিন আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'লোকেদের সঙ্গে মিশেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ, যদি আমার চেয়ে নিচু মানের লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে তার মূর্খতায় আমাকে কষ্ট দেয়। যদি আমার চেয়ে উঁচু মানের লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে আমাকে অহংকার দেখায়। আর যদি আমি আমার সমতুল কোন লোকের সাথে মিশি, তাহলে সে আমার প্রতি হিংসা করে। তাই আমি তাঁর সঙ্গতায় নিরত থাকি, যাঁর সঙ্গতায়

কোন বিরক্তি নেই, যাঁর বন্ধুত্বের কোন বিচ্ছিন্নতা নেই এবং যাঁর সংসর্গে কোন আতঙ্ক নেই।'

সুফিয়ান সওরী বলেন, জাফর সাদেকের নিকট উপস্থিত হয়ে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূলের পিতৃব্যপুত্র! কি ব্যাপার যে আমি আপনাকে দেখছি, আপনি ঘরেই থাকেন এবং লোকেদের সাথে মিশেন না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ হে ইবনে সাঈদ! নির্জনতায় প্রশস্ততা আছে, আর প্রশস্ততায় আছে আরাম। তোমার ভাগ্যে যা আছে তা আসবেই। হে সুফিয়ান যামানার লোক খারাপ হয়ে গেছে। বন্ধুরা অন্য রকম হয়ে গেছে। তাই দেখলাম, একাকীত্বই মনের জন্য অতি সান্ত্বনাদায়ক।'

একজন বিদ্বান বলেছেন, 'মনের সুখ খুঁজেছি, কিন্তু অনর্থক বিষয় বর্জন করার মত অন্য কিছুতে তেমন সুখ পাইনি। একাকী থেকে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছি, কিন্তু কুসঙ্গীর সঙ্গী থেকে সে সময়কার মত অধিক নিঃসঙ্গতা অনুভব অন্য সময় করিনি। সাথী-সঙ্গীদের কাছে জয়-পরাজয়ের স্বীকার হয়েছি, কিন্তু পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় পরাজয় হল একজন খারাপ মহিলা (অবাধ্যা স্ত্রী)র কাছে। বহু এমন শক্তিশালী বস্তু দেখেছি, যা খুব কঠিন পদার্থকেও চূর্ণ করে দেয়, কিন্তু দারিদ্রের চেয়ে অধিক শক্তিশালী তেমন কিছু দেখিনি।

দুঃখী বন্ধু আমার! যদি তোমাকে অসৎ সঙ্গীর সাথে মিশতেই হয়, তাহলে সাপ চন্দন বৃক্ষে জড়িয়ে থাকলেও যেমন চন্দন তার শীতলতা হারায় না এবং পদ্ম পাঁকে গাড়া থেকেও যেমন তার সৌন্দর্য ও সৌরভ হারায় না, তেমনি তুমি হও। নিজের স্বকীয়তা নষ্ট করে দিও না। বরং পরশমণির মত তুমি তাকে সোনা করার চেষ্টা কর। আর তা না হলে তার থেকে বহু ক্রোশ তফাতে থেকো।

'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।'

দ্বীনদার পরহেযগার জ্ঞানী বন্ধুর বন্ধুত্ব গ্রহণ কর। তুমি তার সাহচর্যে পরম শান্তি পাবে।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, পরহেযগার বিদ্বানের কাছে বসলে ৬টি জিনিস নষ্ট হয়ে ৬টি সৃষ্টি হয়; সন্দেহ দূর হয়ে একীন আসে। রিয়া দূর হয়ে ইখলাস আসে। ঔদাস্য দূর হয়ে যিক্র আসে। দুনিয়ার লোভ দূর হয়ে আখেরাতের লোভ আসে। অহংকার দূর হয়ে বিনয় আসে এবং অশুভ কামনা দূর হয়ে হিতাকাঙ্ক্ষা আসে।

শান্তিকামী বন্ধু আমার! যারা বাজে লোক, যারা না কোন দুনিয়ার কাজে থাকে আর না-ই কোন আখেরাতের কাজে, যারা গাফেল-উদাসীন, যাদের সাথে বসলে পরচর্চা ছাড়া অন্য কিছু নেই তাদের সংসর্গ থেকে দূরে থাক। যে ইজতিমা, জামাআত, সমাবেশ বা জালসায় আল্লাহর আনুগত্য বা যিক্র নেই সেখান থেকে সরে গিয়ে ঘরে ফির। ঘর তোমার জন্য আশ্রয়স্থল হোক।

মহানবী ﷺ-এর খাস অসিয়ত হল, "তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত কর, তোমার গৃহ যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তুমি তোমার পাপের উপর রোদন কর।" *(সহীহুল জামে ১৩৮৮নং)*

আর হ্যাঁ, তুমি কোন মানুষকে পরীক্ষা করে দেখে যদি মনে কর যে, সে তোমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়, তাহলে সাবধান থেকো সে যেন তোমার শত্রু না হয়ে যায়।

কৃতজ্ঞ হও

মানুষের উপর আল্লাহর রয়েছে অগণিত নিয়ামত, অসংখ্য অনুগ্রহ। মানুষের জন্য এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল ঠান্ডা পানি। আর এই জন্য কিয়ামতে তার হিসাব সবার আগে হবে। *(সহীহুল জামে' ২০২২নং)* মুমিনের জন্য সার্বিকভাবে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল, ইসলাম। আর উপভোগ্য বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বস্তু হল, সদিচ্ছাময়ী স্ত্রী।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহর শত-কোটি নিয়ামত উপভোগ করছে। সুস্থ জীবন, হাওয়া-পানি এবং সেই সাথে কত রকমের খাদ্য-সামগ্রী। কেবল নিজের দেহের মধ্যে কত শত নিয়ামত; মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত এক একটি নিয়ামত। চোখের কদর কি, অন্ধকে জিজ্ঞাসা করে দেখ অথবা তুমি নিজে একবার চোখ বন্ধ করে ভাব। হাত-পায়ের কদর কি, একবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ যাদের হাত-পা নেই। ঘুমের কদর কি, ২/১ দিন না ঘুমিয়ে দেখ অথবা যাদের ঘুম হয় না তাদের কাছে জেনে নাও। জ্ঞানের কদর কি, তা পাগল দেখে অনুমান কর। যৌবনের কদর কি, তা বৃদ্ধ অথবা নংপুসকদের কাছে বসে শোন। সুস্থতার কদর কি, তা অসুস্থ মানুষের বেদনা দেখে অনুভব কর।

তুমি কি লক্ষ টাকার বিনিময়ে তোমার চক্ষুদ্বয় বিক্রয় করবে? তোমার শ্রবণশক্তি অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয় অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করবে? বোবা হওয়ার বদলে তুমি কি বাড়ি অথবা গাড়ি পেতে চাও। আশা করি, না।

তেমনি তুমিও তা কেনার ইচ্ছা করলে পাবে না। শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসা কেনা-বেচার কোথাও কি কোন উপায় বা বাজার আছে?

শোন বন্ধু! আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত তোমাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তুমি যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে যাও, তা গুনে শেষ করতে পারবে না। অতএব তুমি আল্লাহর কোন্ নিয়ামতকে তাঁর দেওয়া নয় বলে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করছ? আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে তুমি কি কাফের হতে চাও?

কিছু না থাকলেও অন্য অনেক কিছু আছে। কিছু চলে গেলে অন্য অনেক কিছু বাকী রয়েছে। ঐ কিছুর জন্য কি সমস্ত নিয়ামতকে অগ্রাহ্য করতে পার?

বহু ধনের মধ্যে কিছু গেছে, একাধিক সন্তানের মধ্যে একটি গেছে, যাঁর দেওয়া তিনিই নিয়েছেন, দিয়েছেন অনেক নিয়েছেন কিছু, তাতে তোমার কি কোন অভিযোগ করার থাকতে পারে? বরং তোমার কি বাকীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত নয়?

উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ)এর এক পুত্র নিহত হয়। কোন এক ঘায়ের কারণে তাঁর একটি পা কেটে ফেলতে হয়। তবুও তিনি মহান প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে ৪টি সন্তানের মধ্যে মাত্র ১টি নিয়েছেন এবং বাকী রেখেছেন ৩টি, আমার ৪টি হাত-পায়ের মধ্যে মাত্র ১টি নিয়েছেন এবং বাকী রেখেছেন ৩টি। আল্লাহর কসম! তিনি নিয়েছেন কমই। রেখেছেন অনেক। দু-একটি বিপদ দিলে ঘাবড়াবার কি আছে? সারা জীবনই তো তিনি আমাকে আরাম-আয়েশে রেখেছেন! *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৪৩০-৪৩১)*

সুখ-সন্ধানের পথে চলমান পথিক বন্ধু আমার! সুখের সন্ধানে তুমি কৃতজ্ঞ হও। কৃতজ্ঞ হও তোমার প্রতিপালকের, কৃতজ্ঞ হও উপকারীর। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২ আয়াত)*

অতএব আল্লাহর আদেশ হল, তোমরা কৃতজ্ঞ হও। নেমকহালাল হও এবং নেমকহারাম হয়ো না। তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছেন তা থেকে হালাল ও উত্তম জিনিস আহার কর। আর তোমরা আল্লাহর (নিয়ামতের) শুক্‌রিয়া আদায় কর; যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক। *(নাহল ১১৪ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাকে প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। তিনি বলেন,

﴿ وَسَنَجۡزِي ٱلشَّٰكِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৫ আয়াত)*

অকৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহর আযাব ও শাস্তির উপযুক্ত। কিন্তু যে বান্দা কৃতজ্ঞ তাকে তিনি আযাব দেন না। তিনি বলেন,

﴿ مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও মুমিন হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান না। *(সূরা নিসা ১৪৭ আয়াত)*

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেহাতই কম সংখ্যক বান্দা যথার্থ শুক্র আদায় করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴾

অর্থাৎ, হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অল্পই। *(সূরা সাবা ১৩ আয়াত)*

আর এ কথা ইবলীসও জানত যে, মানুষের মাঝে কৃতজ্ঞতার গুণ কম আছে অথবা অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ। অথবা তারই চক্রান্তে তাদের অধিকাংশ অকৃতজ্ঞ হবে। তাই তো সে মানুষের সমালোচনা ও নিন্দা করে আল্লাহর সামনে বলেছিল,

﴿ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। *(সূরা আ'রাফ ১৭ আয়াত)*

﴿ قُلۡ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۖ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ﴾

অর্থাৎ, বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং হৃদয় সৃজন করেছেন। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। *(সূরা মুল্ক ২৩ আয়াত)*

কৃতজ্ঞ হলে নিজেরই কল্যাণ আছে। আর কৃতঘ্নতায় আছে অকল্যাণ। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। *(সূরা নাম্ল ৪০ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মু'মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।" *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, আর যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে।

আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত।" *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র করল না, সে আল্লাহর শুক্র করল না।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৯৫৭নং, আবূদাউদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

আল্লাহর নিয়ামতকামী বন্ধু আমার! আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে তাঁর শুকরিয়া কর, সুখী হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, সুখের শিরোনাম হল তিনটি; নিয়ামত পেয়ে শুক্র করা, বিপদগ্রস্ত হলে সবর করা এবং পাপ করে ফেললে ইস্তিগফার করা।

উপকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় কর, তাতেও তুমি সুখী হতে পারবে। আরো উপকার লাভ করতে পারবে।

কিন্তু কিভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া যাবে? পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে অন্তর, জিহ্বা ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। আর তা হবে পাঁচভাবে; (১) দাতার দানের কথা স্বীকার করে, (২) সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করে, (৩) দাতার প্রতি বিনয়ী হয়ে, (৪) তাঁর প্রতি মহব্বত রেখে এবং (৫) দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে দেওয়া জিনিস ব্যয় করে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম করলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। মানুষ কৃতঘ্ন হয় আল্লাহর এবং উপকারী মানুষের।

নিয়ামত পেয়ে শুকর করা বান্দার স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু না পেয়ে সবর ও শুকর করা খাস বান্দার অস্বাভাবিক গুণ। আর খাস বান্দাকে যে কোন দুঃখ-দুশ্চিন্তা স্পর্শ করে না, তা বলাই বাহুল্য। ইবরাহীম বিন আদহাম শাকীক বিন ইবরাহীম বালখীকে নিজ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন

করলে উত্তরে শাকীক বললেন, 'রুযী পেলে খাই, না পেলে সবর করি।' ইবরাহীম বললেন, 'এ কাজ তো বালখের কুকুররা করে।' শাকীক বললেন, 'তাহলে আপনি কি করেন?' বললেন, 'আমি রুযী পেলে অপরকে দিয়ে খাই, না পেলে শুক্র করি।'

দুনিয়ার পরীক্ষাগারে উপবিষ্ট বন্ধু আমার! যখনই কোন বিপদ এসে তোমার সম্পদের একাংশ ধ্বংস করে যাবে, তখনই অবশিষ্ট অন্যান্য সম্পদের কথা মনে করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। দেখবে বিপদের ভার হাল্কা হয়ে যাবে। নিজেকে অনুগ্রহের অনুপযুক্ত বলে মনে করো। তাহলে দেখবে দুঃখ দূর হয়ে যাবে। আর নিয়ামত বেশী হলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তদনুরূপই কোন মানুষের কাছে উপকৃত হলে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে উপকারী খোশ হবে এবং তোমার জন্য অতিরিক্ত উপকার করতে আরো উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহান্বিত হবে। অনুগ্রহের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে অনুগ্রহ - এই ধারাবাহিকতা সুখ লাভের একটি মূল কারণ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিনয়ীর নিদর্শন। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞতা অহমিকার লক্ষণ। সুতরাং যা দাও, তা দিয়ে ভুলে যাও। কিন্তু যা নাও, তা নিয়ে ভুলে যেও না। বরং উপকারের কথা মার্বেল পাথরে এবং অপকারের কথা বালির উপরে লিখে রেখো।

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়ার কোন শেষ নেই। যতই করা যাক না কেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। তাঁর দেওয়া এই দেহ ও দেহাঙ্গসমূহকে তাঁরই সন্তুষ্টি অনুসারে ব্যবহার করলে তাঁর শুকরিয়া আদায় হয়। সে সবের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করলে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকলেও তাঁরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হয়।

আবূ হাযেমকে জিজ্ঞাসা করা হল, চোখের শুক্র কি? বললেন, চোখ দ্বারা ভালো দেখলে তা প্রচার করা এবং মন্দ দেখলে তা গোপন করা। জিজ্ঞাসা করা হল, আর কানের শুক্র কি? বললেন, কান দ্বারা ভাল শুনলে তার হিফাযত করা এবং মন্দ শুনলে তা ভুলে যাওয়া।

প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় এই বলে মহাদাতা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তুমি লাভবান হবে ঃ-

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।"

এই দুআ (আরবীতে) যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে ঐ রাতে মারা যাও অথবা সকালবেলায় পড়ে ঐ দিনে মারা যাও তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী)*

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার তওফীক লাভ করার জন্য দুআ কর এই বলে,

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্র (স্মরণ), শুক্র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আবু দাউদ ২/৮৬, নাসাঈ ১৩০২)*

আর খবরদার অপরের কাছ হতে কৃতজ্ঞতার আশা করো না বন্ধু! উপকার করেছ? করেছ তো আল্লাহর তাওফীকে। অতএব তুমি তাঁরই কাছে শুকরের আশা কর; সৃষ্টির কাছে নয়।

উপকার করে উপকারের কথা ভুলে যাও। হিতসাধন করে প্রতিদানের আশা করো না। তা না হলে মনে নিদারুণ ব্যথা পাবে। কারণ, জানোই তো এ দুনিয়ায় কৃতজ্ঞ মানুষ নেহাতই কম।

ইবনুল মুকাফ্ফা বলেন, যদি তুমি কোন মানুষের প্রতি উপকার করে থাকো, তাহলে খবরদার তা অন্যের কাছে উল্লেখ করো না। আর যদি কোন মানুষ তোমার প্রতি উপকার করে থাকে, তাহলে খবরদার তা ভুলে যেও না।

কারো প্রতি অনুগ্রহ করে প্রশংসা বা সুনামের আশা করো না। নচেৎ দেখবে আশা করার পর তুমি যদি তা না পাও, তাহলে মনে মনে বড় দুঃখিত হবে; পরন্তু তোমার ইবাদতে 'রিয়া' ঢুকবে এবং তা সমূলে নষ্ট করে ছাড়বে।

বরং উপকার করে খাদ্য দানকারীর মত বলো,

﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। *(সূরা দাহর ৮-১০ আয়াত)*

কারো কাছ থেকে নয়; এমন কি একান্ত আপনজন কারো কাছ থেকেও নয়। অর্ধাঙ্গিনী শয্যাসঙ্গিনী স্ত্রীর কাছ থেকেও কৃতজ্ঞতার আশা করো না। তুমি সারা জীবন তার প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা করে যাও। সে ভাববে এটা তোমার কাছে তার প্রাপ্য অধিকার মাত্র। পরন্তু যদি কোনদিন এতটুকু ত্রুটি ঘটেই যায়, তাহলে সে তোমাকে নির্দ্বিধায় বলে বসবে, 'জীবনে তুমি আমাকে ভালো চোখে দেখলে না। তোমার মধ্যে আমি কখনো ভালো দেখলাম না! তোমার কাছে কোনদিন ভালো ব্যবহার পেলাম না!' আর এই কৃতঘ্নতার জন্যই তাদের অধিকাংশ হবে দোযখবাসিনী। *(বুখারী, মুসলিম ৯০৭নং)*

নিজের সন্তানও নয়। যাকে তুমি ভালোবাসছ, নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াচ্ছ, নিজে না ঘুমিয়ে তাকে ঘুমাতে সহযোগিতা করছ, নিজে ছিঁড়া-ফাটা পরে তাকে নতুন ও ভালো পরাচ্ছ, নিজে কষ্ট করে তাকে আরামে রাখছ, সেই সন্তানই যখন সবল হবে, তখন তোমাকে ঘুরিয়ে দাঁত দেখাবে। কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, উল্টে তোমার ত্রুটির কথা উল্লেখ করবে। আর তখন তোমার কত যে দুঃখ হবে তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? বলা বাহুল্য, এ দুনিয়ায় কেবল দিয়ে ও বিলিয়ে যাও, আর নেওয়ার বা পাওয়ার আশা রেখো না। নচেৎ তুমি সুখী হতে পারবে না।

পরন্তু কৃতজ্ঞতার স্থলে তুমি নিন্দার আশা করতে পার। যাকে তীর শিক্ষা দাও সে তোমাকেই তীর মারতে পারে। যাকে দুধ দিয়ে পোষণ কর সেই তোমাকে দংশন করতে

পারে। যার জন্য চুরি কর সেই তোমাকে চোর বলতে পারে। যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি। যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে। -এটাই দুনিয়ার একটি অন্ধ কানুন বন্ধু!

মহান সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় অনুগ্রহে প্রতিপালিত হয়ে মানুষ যদি তাঁর কৃতজ্ঞতা না করে অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার করে, তাহলে তোমার-আমার মত সৃষ্টির সাথে কি ব্যবহার করতে পারে তা কি অনুমান করতে পারছ?

বিনয়ী হও

বিনয়-নম্রতা বা কোমলতা মানুষের একটি সদ্‌গুণ। এ গুণের কারণে মানুষ মানুষের চোখে সুন্দর হয়, সংসারে সুখী হয়।

কিন্তু বিনয় কি? প্রত্যেকের কাছ থেকে হক কথা মেনে নেওয়ার নামই হল বিনয়।

কথায় ও কাজে গর্ব ও অহংকার বর্জন করার নামই হল বিনয়। হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, তুমি বাড়ির বাইরে গিয়ে যাকে দেখবে, তাকেই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করবে। এরই নাম বিনয়।

বকর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, তোমার থেকে বয়সে কাউকে বড় দেখলে মনে মনে বলো, ইসলাম ও নেক আমলেও সে আমার চেয়ে অগ্রণী, অতএব সে আমার থেকে উত্তম। তোমার চেয়ে বয়সে কাউকে ছোট দেখলে বল, ওর চেয়ে আমি পাপে অগ্রণী, অতএব ও আমার চেয়ে উত্তম। লোকেরা তোমার সম্মান করলে মনে করো, এটা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। তোমাকে অসম্মান করলে মনে করো তোমার কোন অসমীচীন ব্যবহারের ফলশ্রুতি। *(উয়ূনুল আখবার ১/২৬৭)*

নিজেকে যে সবার চেয়ে মর্যাদায় ছোট ভাবে, আমলে পাপী ভাবে এবং অপরকেই ঈমানে-ধনে-মানে-জ্ঞানে ও আমলে বড় ভাবে সেই হল বিনয়ী মানুষ।

লণ্ঠনের আলো যতই উজ্জ্বলতা এবং প্রখরতা দান করুক না কেন, মোমের আলোর মত স্নিগ্ধতা দিতে পারে না। মানুষের মনে-মুখে যতই আস্ফালন থাকুক না কেন, ভদ্র-নম্র মানুষের মত সামাজিক উপকার অন্য কেউ করতে পারে না। কারণ, কোমল-চিত্তের মানুষই অপরকে কাছে টানতে পারে, নিজের আদর্শ অপরের মনে বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়। যেহেতু সে সুন্দর হয় অপরের চোখে। মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-কে বলেন,

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল-চিত্ত হয়েছিলে, অন্যথা যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

বিনম্র মানুষই নেতৃত্বের অধিকার ও যোগ্যতা রাখে বেশী। বিনয়ী মানুষ দুনিয়াতে যেমন চরম শান্তি পায়, তেমনি আখেরাতে পায় পরম সুখের ঘর। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, এ পরলোকের গৃহ, যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা পৃথিবীতে উদ্ধত

হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম পরহেযগারদের। *(সূরা ক্বাসাস ৮৩আঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সরল, সিধা ও বিনম্র হবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৬৪৮৪নং)*

উদ্ধত মানুষ আসলে শয়তানের গোলাম। পক্ষান্তরে বিনম্র মানুষ আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ নিজ খাস গোলামের খাস গুণ বর্ণনা করে বলেন,

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴾

অর্থাৎ, রহমান (আল্লাহর) বান্দাগণ তারা, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্ত ভাবে জবাব দেয়---। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

বিনয়ী মানুষ কারো উপর অত্যাচার করে না, নিজ মুখে নিজ প্রশংসা করে না, আত্মশ্লাঘা ও গর্ব করে না, বহু বড় হয়েও লোক মাঝে গুপ্ত থাকতে পছন্দ করে, প্রসিদ্ধ হতে চায় না, সুনাম নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না, তার মনে কোন প্যাঁচ থাকে না, তার হৃদয়-কোঠায় থাকে সরলতা ও অকপটতা।

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও; যাতে কেউ কারো প্রতি অত্যাচার না করে এবং একে অন্যের উপর গর্ব না করে।' *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "মুমিনগণ সরল-বিনম্র হয়। ঠিক লাগাম দেওয়া উটের মত; তাকে টানা হলে চলতে লাগে এবং পাথরের উপরে বসতে ইঙ্গিত করলে বসে যায়।" *(সহীহুল জামে ৬৬৬৯নং)*

অতএব তুমি বিনয়ী ও সুখী হতে চাইলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্ত উপদেশের উপর আমল কর। আর সেই সাথে কবির এই কবিতার নির্দেশ মেনে নাও ঃ-

'হেনভাবে পথ দিয়া করিবে গমন,
না করে সালাম কেহ, না ছাড়ে আসন।
লোক মাঝে হেনভাবে কর অবস্থান,
ব্যস্ত হয়ে কেহ নাহি দেয় উচ্চস্থান।
মসজিদে যাও যদি হেনভাবে যেও,
ইমামতি করিবারে নাহি কহে কেহ।'

মানুষ নিজের কাছে যত ছোট হয়, অপরের চোখে তত বড় হয়। অতএব বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে। যদি সর্বোচ্চ আসন পেতে চাও, তাহলে নিম্নস্থান থেকে আরম্ভ কর।

মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয় আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।" *(মুসলিম ২৫৮৮ নং, প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাথায় লাগামের কড়িয়াল (মর্যাদা) আছে এক ফিরিশ্তার হাতে। যখন মানুষ বিনয়ী হয়, তখন ফিরিশ্তাকে বলা হয় যে, তুমি ওর (কড়িয়াল তুলে ধর, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখ এবং ওর) মর্যাদা উন্নীত কর। আর যখন সে অহংকারী

হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যে, ওর (কড়িয়াল ছেড়ে দাও, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রেখ না এবং ওর) মর্যাদা অবনত কর।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৬৭৫নং)*

বিনয়ের সুফল স্বরূপ মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়, বিনয়ী মধুরভাষীকে সবাই প্রেম দিতে চায়। আর অল্প নিয়ে তুষ্ট হলে মনের আরাম পাওয়া যায়। অতএব তুমি সমুদ্রের মত প্রশস্ত হৃদয়, সূর্যের মত উদার এবং মাটির মত নরম ও বিনয়ী হও।

ধানের যে শিষগুলিতে চালে পরিপুষ্ট ধান থাকে সেগুলি মাটির দিকে ঝুঁকে থাকে। কিন্তু যেগুলিতে চাল থাকে না; বরং খালি থাকে সেগুলিই উপর দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফলের ভারে বৃক্ষ নত হয়, নিচু মেঘে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। অতএব তোমার জ্ঞান, শক্তি বা সম্পদ বৃদ্ধি হলে তোমার বিনয় বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যেহেতু বিদ্যার ভূষণ হল বিনয়, শক্তির ভূষণ হল ক্ষমাশীলতা এবং ধনবত্তার অলংকার হল দানশীলতা।

তোমার থেকে যারা বড় তাদের কাছে বিনয় প্রকাশ করা তোমার কর্তব্য, তোমার যারা সমবয়সী তাদের কাছে বিনয় প্রকাশ করা তোমার ভদ্রতা। আর তোমার থেকে যারা ছোট তাদের কাছে বিনয় প্রকাশ করা তোমার মহত্ত্বের পরিচয়।

আর জেনে রেখো যে, গর্ব হল আল্লাহর পোশাক, বিনয় পুরুষের পোশাক এবং লজ্জাশীলতা নারীর পোশাক।

বিনয়ী মানুষের বহু নিদর্শন আছে। তুমি বিনয়ী হতে চাইলে নিম্নের উপদেশ গ্রহণ কর ঃ-

পথ চললে অপরকে রাস্তা দেবে। নিজে পিছনে হাঁটবে। অপরকে সীট দেবে।

মেহমানকে অগ্রসর হয়ে স্বাগতম জানাবে। বিদায়ের সময় পিছনে পিছনে দরজা পর্যন্ত যাবে।

সাক্ষাতে আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করবে।

শিশুদেরকেও সালাম দেবে।

অনেক জানলেও আদবে না জানার মত বসবে।

নিজের জন্য কারো দাঁড়ানোকে পছন্দ করবে না।

স্বমতবিরোধী হলেও সকল মানুষের সাথে স্মিতমুখে কথা বলবে।

সকলের কথার উত্তর দেবে।

ভুল করে ফেললে তা স্বীকার করবে। যেহেতু যে ভুল করে ভুল স্বীকার করে, তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। বরং তার মহত্ব বেশী প্রমাণিত হয়।

অন্যের বোঝা বহে দেবে।

স্বমতবিরোধী হলেও গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের সাথে বসবে।

মজলিসে যা আসবে তাই খাবে। 'এটা খাই না, ওটা খাই না' বলে নাক সিঁটকাবে না।

হেলান দিয়ে খাবে না।

চাকর বা দাসের সাথেও খাবে। মহানবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি অহংকারী নয়, যার সাথে তার খাদেম আহার করে, বাজারে গাধায় চড়ে এবং ছাগী বেঁধে দোহন করে।" *(সহীহুল জামে ৫৫২৭নং)*

অপরের সামনে পায়ের উপর পা চাপিয়ে বসবে না এবং পা দুলাবে না।

স্বাভাবিকভাবে মিষ্টি কথা বলবে।

সংসারের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করবে।

নিজের খিদমত নিজে করবে।

সফরে সঙ্গীদের সমান কাজ করবে।

চেষ্টা করবে তোমার আদর্শদের অনুসরণ করতে ঃ-

বিনয়ীদের ইমাম মহানবী ﷺ বদরের দিনে নিজে উট থেকে নেমে সঙ্গীদেরকে সওয়ার হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। অনুরূপ করেছেন উমার তাঁর দাসের সাথে ফিলিস্তীন জয় করার সময়।

ছোট মেয়েরা আল্লাহর রসূলের হাত ধরে যেদিকে টেনে নিয়ে যেত, তিনি সেই দিকেই তার সাথে চলে যেতেন। শিশুদেরকে সালাম দিতেন। সকলকে আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

তিনি তাঁর সম্মানার্থে কারো দন্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করতেন না। দাসদের দাওয়াত কবুল করতেন। নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। নিজের কাপড় নিজেই পরিষ্কার করতেন। নিজ হাতে ছাগী দোহন করতেন। নিজের খিদমত নিজে করতেন। সংসারের কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।

সামনে যে খাবার আসত তিনি তাই খেতেন, যা আনা হত তা ফিরিয়ে দিতেন না। যা অরুচিকর হত তা বর্জন করতেন; কিন্তু তার ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যে খাবার থাকত না, তার জন্য কষ্ট-চেষ্টা করতেন না। তিনি হেলান দিয়ে খাবার খেতেন না।

তিনি গরীব-মিসকীনদের সাথে উঠা-বসা করতেন। অসুস্থ রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দিতে যেতেন। জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চরের পিঠে সওয়ার হতেন।

একদা এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কথা বলার সময় কাঁপতে শুরু করলে তিনি বললেন, “প্রকৃতিস্থ হও। আমি কোন রাজা নই। আমি তো কুরাইশের একটি এমন মহিলার সন্তান, যে মহিলা রোদে-বাতাসে শুকানো গোশ্ত খেতো।” *(ইবনে মাজাহ ২/১১০১, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪/৪৯৬)*

আমীর হওয়া সত্ত্বেও আবূ হুরাইরা মাথায় কাঠের বোঝা বহন করেছেন। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও উমার নিজের পিঠে আটা বহন করে এক বৃদ্ধাকে দিয়েছেন।

একদা রাত্রে উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক মেহমান ছিল। তিনি কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তেলের বাতি নিভুনিভু হল। মেহমানটি বলল, বাতিটা ঠিক করে দিই। তিনি বললেন, মেহমানকে কাজে লাগানো বা মেহমানের নিকট থেকে খিদমত নেওয়া আতিথেয়তা বিরোধী। বলল, তাহলে চাকরকে জাগিয়ে দিই। বললেন, ও এই মাত্র প্রথম ঘুম ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাও না। অতঃপর তিনি নিজে উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে ঠিক করলেন। মেহমানটি বলল, আপনি নিজে কষ্ট করলেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! তিনি উত্তরে বললেন, (তেল ভরতে) গেলাম তখন আমি উমার ছিলাম, আর এলাম তখনও উমার। আমার মধ্যে কিছুই কমে যায়নি। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।

পরিশেষে বিনয়ী বন্ধু আমার! তোমার আচার ও ব্যবহারে আরো বিনয়ী হও, কোমল ও নরম হও, অপর সকলকে সর্ববিষয়ে তোমার চেয়ে বড় মনে কর। তা বলে নিজেকে হেয় ও

তুচ্ছ জ্ঞান করো না। নিজের কদর নিজে বিস্মৃত হয়ো না, অপরকে তোমার থেকে উৎকৃষ্ট ভাব, কিন্তু নিজেকে নিকৃষ্ট-নাচীজ ভেবে নিও না। নিজেকে একেবারে নীচ, হীন, অধম ও অযোগ্য ভেবে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যেও না। বিনয়ী হও কিন্তু লাঞ্ছনা বরণ করো না। অপরের কাছে 'অতি বড় হয়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, আর অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।' তোমাকে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তোমার মধ্যে সাপের বিষ থাকবে না, কিন্তু ফোঁশ থাকতে হবে। বিনয়ী হওয়া ভাল, কিন্তু প্রয়োজনে প্রতিবাদ-মুখরও হতে হবে।

আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হয়ো না

নীচতা, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ কোন সুপুরুষের, কোন মুসলিমের কাজ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার উপর কোন সম্পদ দান করেন তখন তিনি তার চিহ্ন ঐ বান্দার উপর দেখা যাক -তা পছন্দ করেন। তিনি অভাব ও দীনতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। নাছোড়-বান্দা হয়ে যাচ্ঞাকারীকে ঘৃণা করেন এবং লজ্জাশীল ও যাচ্ঞা করে না এমন পবিত্র মানুষকে তিনি ভালোবাসেন।" *(সহীহুল জামে ১৭০৭)*

বিনয়ী হওয়া মানুষের একটি উত্তম গুণ। তা বলে ছোট হয়ে লাঞ্ছনা বরণ করা ভিন্ন জিনিস। আত্মসম্মানবোধ যার আছে, সে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না।

সুখী সুপুরুষের এই নীতি হওয়া উচিত যে, জান যাবে যাক, তবুও মান যেতে দেব না। এতটুকু জীবন থাকতে মর্যাদা হারাব না।

'দৈন্য যদি আসে আসুক লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস,
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি যদি জানতে পারি যে, ঠান্ডা পানি পান করলে আমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে, তাহলে আমি তা পান করা বন্ধ করে দেব।' *(সফওয়াতুস সফওয়াহ ২/৪৭৪)* কারণ, ইজ্জত অতি মূল্যবান জিনিস, যা খোওয়া গেলে আর সহজে ফিরে পাওয়া যায় না।

তুমি যদি নিজেকে মাটির উপর পড়ে থাকা কোন কীট মনে কর, তাহলে তোমাকে যে পায়ে করে দলবে তাকে গালি দিও না। কারণ, এ দোষ তো তোমারই।

যে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা নেই, আত্মমর্যাদাবোধ নেই, কোন কাজে যার নিজস্ব পরিকল্পনা নেই, তার সাফল্য অনিশ্চিত। যার অভ্যাস হল অপরের কাছে মাথা নিচু করা, সামান্য স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরের পায়ে লাথি খাওয়া, এমন পায়ে পড়া মানুষ নিজের মূল্যায়ন না করে অপরকে বিশাল ভেবে তার পূজা করে বসে। নিজেকে হেয় মনে করে, তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তার ফলে হীনবল, মনমারা হয়। হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে নিজের স্বকীয়তা বিকিয়ে ফেলে।

একদা আফ্রিকার এক চাষী শুনল যে, কোন কোন জায়গায় লোকে মাটিতে হীরা পেয়ে

বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। সে তার বাকি জমিটুকু বিক্রয় করে হীরার খোঁজে বের হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন পর অর্থও নিঃশেষ হল, হীরাও পেল না। অপর দিকে তার জমির ক্রেতা তার ঐ বেচা জমিতে হীরা আবিষ্কার করল!

এইরূপই কত মানুষ নিজের কদর না বুঝে অপরের দ্বারস্থ হয়। নিজের কাছে রত্ন থাকা সত্ত্বেও অপরের কাছে সন্ধান করে ফেরে। নিজের মান বিকিয়ে অপরের কাছে মানের ভিখারী হয়। নিজের ভাইকে পছন্দ করে না; বরং পছন্দ করে তাকে যাকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য ও ধারণা হল, তাদের নিকট মান-সম্মান, ইজ্জত ও পজিশন পাওয়া যাবে! এরূপ হীন চরিত্র আসলে মুনাফিকদের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে; যারা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে - তারা কি ওদের নিকট সম্মান চায়? বাস্তবে যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই। *(সূরা নিসা ১৩৮- ১৩৯ আয়াত)*

সম্মানিত বন্ধু আমার! সম্ভ্রম যাবতীয় সদাচরণের সমষ্টির নাম। সম্ভ্রম পবিত্রতা ও কর্মনিপুণতা। সম্ভ্রম গোপনে এমন কাজ না করাকে বলে, যা প্রকাশ্যে করলে লজ্জিত হতে হয়। সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মীরাস হল সম্ভ্রম। এই মীরাসের বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করো। সতর্ক থেকো যে, তোমার সম্ভ্রম লুটার জন্য বহু মানুষ ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে।

ঠিকই তো যার মানই নেই, তার আবার অপমান কি? সে নীচ কি নিজের অথবা পরের মান-সম্মানের খেয়াল রাখতে পারে? যার নিজের আত্মসম্মান নেই, তার নিকট অপরেরও সম্মান নেই। 'সমাজে এক শ্রেণীর লোক থাকে যারা মর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিম্নস্তরে থাকতে বাধ্য হয় বলে উচ্চস্তরের লোকেরা যখন বে-কায়দায় পড়ে তখন তাদের বে-কায়দার সুযোগ পুরো মাত্রায় গ্রহণ করতে চেষ্টা করে এবং যে হাতি পাঁকে পড়ে যায় তাকে ঢেলাবার প্রবৃত্তি তখন শতমুখী হয়ে ওঠে।' কাদার ধারে-পাশে থাকলে গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেয়। জলে নামলেই - মাছ না ধরলেও - জেলে মনে করে। চুরির মাল অপরের পকেটে রেখে চোর বলে শোর করে। এমন লোক থেকে শতরূপে সাবধান থেকো।

এ ছাড়া প্রত্যেক সম্মানী কোন শক্তির নিচে সম্মানহারা হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিম্নমানের লোকের সাথে শত্রুতার মোকাবিলা করে, তার মানও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর সে জন্যই শক্তি ও শত্রু থেকে সাবধান থেকো।

সম্মানঘাতী বন্ধু আমার! আঘাত ও অপমানের মধ্যে আঘাতের কথা সহজে ভুলা যায়, কিন্তু অপমানের কথা সহজে ভুলা যায় না। তবুও ভুলতে চেষ্টা করো। যেহেতু একটি মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু নেই।

লজ্জাশীল হও

লজ্জাশীলতা হল ঃ জ্ঞানের মূল এবং কল্যাণের বীজ। আর নির্লজ্জতা বা ধৃষ্টতা হল ঃ মূর্খতার মূল এবং অকল্যাণের বীজ।

যে মানুষ প্রত্যেক নোংরামি থেকে দূরে থাকে এবং প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার আদায়ে আদৌ ত্রুটি প্রদর্শন করে না, সেই হল লজ্জাশীল মানুষ।

কোন কাজ করা বা না করার উপরে যে তিরস্কার আসে এবং তা শুনে বা জেনে মানুষের মনে-মুখে-চোখে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাই হল লজ্জা।

প্রত্যেক মন্দ কাজ ত্যাগ এবং প্রত্যেক ভালো কাজ করতে যে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই হল লজ্জাশীল মানুষ।

এই লজ্জা কখনো আল্লাহকে করা হয়। আর তখন লজ্জাশীল ব্যক্তি আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো -আলহামদু লিল্লাহ- আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।' তিনি বললেন, "না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।" *(সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)*

"আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলাকে ঠিক সেইরূপ লজ্জা করবে, যেরূপ লজ্জা করে থাক তোমার সম্প্রদায়ের নেক লোককে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ২৫৪১নং)*

লজ্জা কখনো বা মানুষকে করা হয়। আর তখন লজ্জাশীল মানুষ অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে এবং প্রকাশ্যে অসমীচীন বা নোংরা কর্ম করা থেকে বিরত হয়।

মানুষ ও সমাজকেও লজ্জা করে চলা হল উত্তম ঈমানের পরিচয়। এ জন্যই মুসলিম মানুষের চক্ষু-শরম বা চক্ষু লজ্জা বলে একটা জিনিস আছে; যার ফলে সে কোনদিন বেহায়া হয় না।

কখনো বা মানুষ নিজেকে নিজে লজ্জা করে। আর তখন সে সচ্চরিত্রবান ও ভদ্র মানুষরূপে পরিচিত হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

কিন্তু লজ্জার ফলে অনেক ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হয়। এই জন্য এক আনসারী তাঁর ভাইকে লজ্জা ত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন; তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, "ওকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ, লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ

শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।" *(বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫ নং)*

লজ্জাশীল হলে মানুষ সৎকর্মশীল হয়। লজ্জাশীলতায় আছে মানুষের মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য। লজ্জাশীলতা হল নারীর ভূষণ এবং পুরুষের সৌন্দর্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।" "লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৩১৯৬, ৩২০২নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

বলা বাহুল্য, লজ্জাশীলতা মুমিনের ঈমান। প্রকৃত মুমিন লজ্জাশীল হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে লেবাস দান করেছেন। আর সেই লেবাস দিয়ে আমাদের বাহ্যিক লজ্জাস্থান আবৃত করতে আদেশ করেছেন। সেই সাথে তাকওয়ার লেবাস দিয়ে আভ্যন্তরিক লজ্জাস্থান আবৃত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ﴾

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দান করেছি। আর তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

'তাকওয়ার পরিচ্ছদ'-এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন যে, তা হল লজ্জাশীলতা। অর্থাৎ লজ্জাশীলতা মানুষের বহু লজ্জাকর আচরণ ও চরিত্রকে আবৃত করতে পারে। আর এ জন্যই আরবের লোকে বলে থাকে, 'যে ব্যক্তি লজ্জার পোশাক পরিধান করে, সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি লোকেরা দেখতে পায় না।'

বিশেষ করে লজ্জা হল নারীর ভূষণ। লজ্জা না থাকলে নারী উলঙ্গ। বেহায়া নারী যতই পরিচ্ছদ পরে থাক, আসলে সে নেংটা হয় পুরুষের চোখে।

এ সংসারে যার দ্বীন তাকে পথ প্রদর্শন করে, যার জ্ঞান তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে, যার বংশ তাকে (অশ্লীলতা থেকে) রক্ষা করে এবং যার লজ্জাশীলতা তাকে সুপথে পরিচালনা করে, সেই মানুষ হল কামেল মানুষ।

যে মানুষের মাঝে ধৃষ্টতা আছে সে অপরাধ করতে পারে, কুকর্ম করতে পারে, নির্লজ্জ মানুষ অধিকার আদায়ে ত্রুটি করতে পারে। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আর সে হয় স্বৈরাচারী মানুষ। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২২৩০নং)* অর্থাৎ বেহায়া ও বেশরমরাই যাচ্ছে তাই করতে পারে। কথায় বলে, লজ্জা নাই যার, রাজা মানে হার।

লজ্জা না থাকলে মানুষের আর কি বাকী থাকে? গাছের ছাল অবশিষ্ট না থাকলে গাছের

আর কি অবশিষ্ট থাকবে? লজ্জা চলে গেলে এ জীবন ও সংসারের কি মূল্য আছে? কেউ যদি আল্লাহর শাস্তিকে এবং মানুষের কটাক্ষকে ভয় না করে, তাহলে সে তো যা ইচ্ছে তাই করবে। আরবী কবি সে কথাই বলেন,

[illegible]
[illegible]
[illegible]

লজ্জাশীল মানুষ অপরকে শ্রদ্ধা করে। যে লজ্জাশীল হয়, সে দানশীল হয়। লজ্জাশীল মানুষ ঢিটে হয় না, প্রগলভ ও চপল হয় না। অশ্লীল বা লজ্জাকর কথাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে না।

লজ্জাশীল মানুষ বিনয়ী হয়, অহংকারী হয় না। সম্মানী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়।

লজ্জাহীন মানুষ রূঢ় ও কর্কশভাষী হয়। আর তার পরিণাম অবশ্যই ভালো নয়। মহানবী ﷺ বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।” *(আহমদ ২/৫০১, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে’ ৩১৯৯নং)*

প্রকাশ থাকে যে, লোক সমাজে বা ভাষায় সে লজ্জাকেও লজ্জাশীলতা মনে করা হয়, যার ফলে মানুষ অনেক সময় ফরয ত্যাগ করে বসে (যেমন লোকের মাঝে ফরয গোসল না করে যথাসময়ে নামায ত্যাগ করে) অথবা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান ত্যাগ করে। আসলে এটা লজ্জা হলেও প্রশংসনীয় লজ্জা নয়। এমন লজ্জা মুমিনের মাঝে না থাকাই জরুরী।

যেমন অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা নিন্দার্হ। লাজুক হয়ে মুখে যদি প্রয়োজনে কথাই না ফোটে অথবা যার সামনে আসা দরকার তার সামনে না আসতে পারে, তাহলে তা সত্যই নিন্দনীয়।

সুখ-সন্ধানী সামাজিক বন্ধু আমার! ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার কিছু উদাহরণ জানলে তোমার পক্ষে তা থেকে দূরে থাকা আরো সহজ হবে। যেমন, প্রকাশ্যে পাপাচরণ করা; মানুষের সামনে ধুমপান করা, জোর শব্দে রেডিও বা টিভির প্রোগাম শোনা ও দেখা, কথায় কথায় তর্ক করা, অশ্লীল কথা বলা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া, মা-বাপ, গুরুজন বা স্বামীর মুখের উপর মুখ দেওয়া, অত্যন্ত মুখর হওয়া, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে অশালীন আচরণ করা, অশ্লীল বাক্যে উপহাস করা বা লোককে হাসানো, সাধারণতঃ যে অঙ্গ ঢেকে রাখা জরুরী তা খুলে রাখা, মহিলাদের বেপর্দা হওয়া, পাতলা বা টাইট-ফিট্ অথবা খোলামেলা পোশাক পরা, জোর গলায় কথা বলা, নারী-পুরুষের একে অন্যের পরিচ্ছদ বা বেশ ধারণ করা, পুরুষের গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে এবং মহিলার গাঁটের উপর তুলে কাপড় পরা, যুবক-যুবতীর একে অন্যের প্রতি ভ্যালভ্যাল করে তাকিয়ে দেখা, উচ্চহাসি হাসা, সর্বদা হিহি করা, সাধারণ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করা, আত্মপ্রশংসা ও গর্ব করা, লোক সমাজে হৈ-হুল্লোড় করা, দেওয়ালে অশ্লীল কথা লিখা প্রভৃতি।

এ সকল নির্লজ্জতার কাজ থেকে দূরে থেকে লজ্জাশীল হও, তুমি সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে সুখী হবে।

ভেদকে ভেদই রাখ

মনের শান্তি পাওয়ার একটি পথ এই যে, তুমি ভেদকে ভেদরূপেই থাকতে দাও। কোন বিষয় রহস্যময় হলে সে রহস্য জানার চেষ্টা করো না। নচেৎ তা জানার জন্য উদ্গ্রীব ও ব্যাকুল মনে যেমন কষ্ট পাবে, ঠিক জানার পর তা যদি তোমার প্রতিকূলে হয়, তাহলেও তেমনি বা তার চেয়ে বেশী কষ্ট পাবে তাতে।

বলা বাহুল্য, সংসারে বহু কিছু ঘটে, আর অনেক কিছু রটে। আর জান তো, রটা কথা মাথার জটা, খুলতে গেলেই লাগে জটা। তা ছাড়া ষট্‌কর্ণে (ছয় কানে) মন্ত্রভেদ। অতএব তাতে অশান্তি বৃদ্ধিই পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আবারও বলি, কোন গোপন খবরে কান পেতো না, কানাচি পেতে কোন কথা শোন না। কারো জাসুসী করো না।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহ বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---" *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে এবং তা তোমার বিপক্ষে হলে তোমার মন যে বিষন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, তুমি তো সবার কাছে সুন্দর নও, সবার কাছে সমান নও। তুমি যত ভালোই হও না কেন, তোমার দুশমন অথবা হিংসুক অবশ্যই আছে। অতএব ছাই চাপা আগুনকে না ঘাঁটিয়ে চেপে রেখে নির্বাপিত করাই উত্তম নয় কি?

অবশ্য ভুল ভেঙ্গে নিলে অশান্তি দূর হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে গিয়ে সংসারের কূল ভেঙ্গে গেলেই তো মুশকিল।

মহান আল্লাহ ভেদ জানতে চেষ্টা না করার সাধারণ উপদেশ দিয়ে বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়াবলীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের কাছে ব্যক্ত হলে তোমরা তাতে কষ্ট পাবে। (তা তোমাদেরকে খারাপ লাগবে।)--। *(সূরা মাইদাহ ১০১ আয়াত)*

সুতরাং গোপনে রটা খবর কোন একটা সুধারণামূলক ব্যাখ্যা করে নিয়ে গোপনে হজম করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নচেৎ এমনও হতে পারে যে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে যাবে, বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে, ব্রণ চুলকিয়ে ঘা হয়ে যাবে।

তদনরূপ তোমার ভেদের গোপন কথা কাউকে বলো না। এমন কি শয্যা-সঙ্গিনী অর্ধাঙ্গিনী বিবিকেও নয়। কারণ, মানুষের মন হল ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকা হাল্কা পালকের মত। যে দিক থেকে

বাতাস লাগে, ঠিক তার বিপরীত দিকে অনায়াসে উড়ে যায় এবং তার কোন স্থিরতা থাকে না। ঠুনকো কাঁচের গড়া প্রেমের শিশমহল যখন চুরমার হয়ে যাবে, তখন তোমার ভেদ খোলার জন্য অবশ্যই পস্তাতে হবে। অতএব প্রেমের আবেগে ভেদ খোলার আগে একবার ভেবে নিও।

শেখ সা'দী বলেন, তোমার একান্ত গোপনীয় কথা নিজের বন্ধুকেও বলো না; যদিও সে বন্ধুত্বে খাঁটি। কারণ, বলা যায় না কোন দিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর এমন অসদ্ব্যবহার বা পারতঃপক্ষের এমন শাস্তি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করো না। কারণ, কালচক্রে সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতেও পরিণত হয়ে যেতে পারে।

তিনি আরো বলেন, যে গোপনীয় কথা তুমি গোপন করতে চাও, তা তোমার বন্ধুকেও বলো না। কারণ, তোমার বন্ধুরও অনেক বন্ধু আছে। সেও তাদের নিকট তা প্রকাশ করতে পারে।

ঘরের ভিতরকার খবরও বাইরে বলো না। তোমার বিরোধী হলেও অভিযুক্ত ছেলে, বউ, বাপ-মা, ভাই-ভাবী, বোন বা অন্য কোন আত্মীয়র ঘরোয়া খবর বাইরে, লোক সমাজে বা বন্ধু মহলে প্রচার করো না। নচেৎ দেখবে একদিন হাতে আঙ্গুল রেখে পস্তাবে। পরামর্শের দরকার হলে জ্ঞানীর কাছে নিও। মনের ভার হাল্কা করার জন্য যার তার কাছে গোপন খবরের বস্তা খুলে দিও না। তোমার গোপনীয়তা প্রকাশ কর একজনের কাছে। কিন্তু পরামর্শ নাও হাজারের কাছে।

আবূ বাক্র আল-অর্রাক বলেন, যা কিছু জান, তার সবটাই বলো না। যা কিছু জান না, তার সব বিষয়েই প্রশ্ন করো না। যা কিছু শুনেছ, তার সবটাই প্রচার করো না। তোমার ভেদ প্রকাশ করো না। অন্যের ভেদ খুঁজতে চেষ্টা করো না। বন্ধুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো না। শত্রু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করো না। নিজের ত্রুটি গণনা কর। প্রভুর মুনাজাতে রত হও এবং কৃত পাপের জন্য রোদন কর।

সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় দুর্বল, যে নিজের ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় শক্তিমান, যে নিজের রাগ দমন করতে সক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল, যে নিজের অভাবের সময় ধৈর্য ধরে। আর সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় ধনী, যে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

তোমরা সকল প্রকার গুপ্ত ভেদ-রহস্যের জন্য তোমার বক্ষই উপযুক্ত স্থান। অতএব অপরকে ভাত দিও, কিন্তু ভেদ দিও না। ভেদ দিলে এখতিয়ার হারিয়ে যায়। আত্মহত্যা করা হয়, মানুষ অপরের নিকট নেহায়েত দুর্বল হয়ে পড়ে।

নিজের গোপন কথা গোপনে রাখার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে নিরাপদে রাখা। হিংসুকের হিংসা থেকে দূরে রাখা। আর এ জন্যই আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণে সফলতা অর্জনের জন্য তা গোপন রেখে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ, প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত হিংসিত হয়।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৫৩নং)*

কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনটি কাজ করা খুবই কঠিন; গোপন কথা গোপন রাখা, কোন আঘাত ভুলে যাওয়া এবং অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

তবুও তোমাকে তা করতে হবে। নচেৎ অশান্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আর তার কূল-কিনারা পাবে না। আর যদি তুমি চাও যে, অন্যে তোমার গোপন কথা অপরের কাছে না বলুক, তাহলে প্রথমে তোমার গোপন কথা তুমি নিজে কাউকে বলতে যেও না। তাহলেই তুমি হবে নিরাপদ সুখী।

মিতভাষী হও

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! মিতভাষী হও; প্রয়োজনে পরিমিত কথা বল এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কথা বলো না।

শান্তিকামী বন্ধু আমার! তুমি যদি শান্তি পেতে চাও, তাহলে তোমার কথা কম কাজ বেশী কর। জরুরী কথা ছাড়া অন্য কথা মোটেই বলো না অথবা কম বল, শান্তি পাবে, নিরাপত্তা পাবে।

সাংসারিক অথবা সামাজিক জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে এই কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি তথা কলহ-বিবাদ ঘটে থাকে, ঘটে থাকে নানা অশান্তি।

বেশী কথা বলার অভ্যাস হলে তার বিষয় তো গীবত-পরচর্চা হবেই। আর পরচর্চা হলে পরের কানে তা নানা রঙে পৌঁছে ফিতনা তো বাধাবেই। পরকীয় গোপন কথা কানাকানি হতে হতে জানাজানি হয়ে আপদ ডেকে আনবে নিজের ঘরে ও সংসারে। বাজে কথার বেড়ে পরে 'আয় রে বাঘ, গলায় লাগ'-এর মত অশান্তি ডেকে আনা হয় শান্তির সংসারে। আর তাতে ঘর পর হয়ে যায়, মা-বাপ দূর হয়ে যায়, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে যায়, ভায়ে-ভায়ে জায়ে জায়ে মুরগী লড়াই শুরু হয়। শুধু এই বেশী ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলার কারণে।

অসার ও ফালতু কথা ও কর্ম থাকলে নিরাপত্তা লাভ হয়, সফলতা আসে। মহান আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে ; যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে------।" *(সূরা মু'মিনূন ১-৩ আয়াত)*

সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক কর্ম বলে দিন যাতে দৃঢ়-স্থির থাকব।' তিনি বললেন, "বল, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাতে দৃঢ়-স্থির থাক।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে অধিক কোন জিনিসকে আমার উপর আশঙ্কা করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বা ধারণ করে বললেন, "এইটাকে।" *(তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার জন্য তার রসনা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হবে আমি তার জন্য বেহেশ্তের যামিন হব।" *(বুখারী, সহীহুল জামে' ৬৪৯৩নং)*

উকবাহ বিন আমের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত কর, তোমার গৃহ যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তুমি তোমার পাপের উপর রোদন কর।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ২৮৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে বশীভূত রাখে, স্বগৃহে অবস্থান করে এবং স্বকৃত পাপের উপর কান্না করে।" *(সহীহুল জামে' ৩৯২৯নং)*

“আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য অপকারী। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর যিক্র ব্যতীত অন্য কোন কথা তার জন্য উপকারী নয়।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

“তোমার জিহ্বা দ্বারা ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না এবং ভালো ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তোমার হাত বাড়ায়ো না।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৬০নং)*

“আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে কথা বললে লাভবান হয় অথবা চুপ থেকে নিরাপত্তা পায়।” *(সহীহুল জামে ৩৪৯২নং)*

একদা আব্দুল্লাহ (রাঃ) সাফার উপর চড়ে বললেন, ‘রে জিভ! ভালো কথা বল; সফলতা পাবি। চুপ থাক; লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা পাবি।’ লোকেরা বলল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! একথা আপনি নিজে বলছেন, নাকি কারো নিকট শুনেছেন?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আদম সন্তানের অধিকতর পাপ তার জিহ্বা থেকেই সংঘটিত হয়।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৩৪নং)*

“পরকীয় বিষয়ীভূত কথা ত্যাগ করা মানুষের সুন্দর ইসলামের প্রমাণ।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ২৮৮১নং)*

মিতভাষিতার প্রশংসা করে আরবী কবি বলেন,

الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا

ما أن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

অর্থাৎ, নীরবতা একটি উত্তম গুণ, চুপ থাকাতে আছে নিরাপত্তা। অতএব তুমি কথা বললে বেশী কথা বলো না। নীরব থেকে এক বারও লাঞ্ছিত হইনি, কিন্তু কথা বলে বহুবার লাঞ্ছিত হয়েছি।

‘পা-পিছলার কারণে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু জিভ-পিছলার কারণে অনেকে মারা যায়।’

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! ‘নীরবতা বিনা কষ্টের এক ইবাদত, বিনা অলংকারের সৌন্দর্য, বিনা প্রতাপের প্রতিপত্তি। এই নীরবতা অবলম্বনের ফলেই তুমি ওযর পেশ করার অমুখাপেক্ষী হবে এবং তোমার সকল ত্রুটি গোপন করতে সক্ষম হবে।’

জেনে রেখো যে, নীরবতা মঙ্গল আনয়ন না করতে পারে, কিন্তু ক্ষতি করে না।

তোমার জীবনে কথা হল ওষুধের মত। পরিমাণ মত ব্যবহার করলে তুমি উপকৃত হবে, বেশী ব্যবহার করলে ধ্বংস হবে।

হ্যাঁ, আর অন্যায় দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করো না। কারণ, সময়ে হক কথা না বললেও এমন নীরবতা অবলম্বনকারী বোবা শয়তান।

মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর

আকীদা ও বিশ্বাসে, দ্বীন মানতে, ইবাদত করতে, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করতে গোঁড়া ও চরমপন্থী হয়ো না; বরং মধ্যমপন্থী হও তুমি সুখী হবে, শান্তির পথ পাবে। মহান আল্লাহ আহলে কিতাবকে বলেন, "হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করো না এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে বিপথগামী হয়েছিল, ফলে তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছিল। আর তারা নিজেরাও ছিল সরল পথ হতে বিভ্রান্ত। *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ আমাদেরকে বলেন, "সাবধান! তোমরা ধর্ম-বিষয়ে অতিরঞ্জন করো না। কারণ, এই অতিরঞ্জনের ফলে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ ১/২১৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

একদা তিন ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর বিবিদের নিকট উপস্থিত হল। যখন তাঁর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলা হল, তখন তারা তা কম মনে করল এবং বলল, নবী ﷺ-এর সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর তো পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর একজন বলল, 'আমি সর্বদা সারা রাত্রি নামায পড়তে থাকব।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা রোযা রাখতে থাকব; কখনও রোযা ত্যাগ করব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি সর্বদা স্ত্রী থেকে দূরে থাকব; কখনো বিবাহ করব না।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সেই সকল লোক, যারা এই এই কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের থেকে অধিকরূপে ভয় করে থাকি এবং তাঁর জন্য অধিক সংযম অবলম্বন করে থাকি। এতদ্সত্ত্বেও আমি কোন দিন রোযা রাখি এবং কোন দিন রোযা ছেড়েও দিই। (রাত্রে) নামাযও পড়ি, আবার ঘুমিয়েও থাকি এবং স্ত্রী-মিলনও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং অতিরঞ্জন ও অবহেলা থেকে দূরে থাক। তোমরা সকালে-বিকালে ও রাতের কিছু অংশে আল্লাহর ইবাদত কর। তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর; তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা যতটা পরিমাণ আমল করতে সক্ষম ততটা আমল করতে অভ্যাসী হও। কারণ, আল্লাহ নিরুদ্যম হবেন না, বরং তোমরাই (বেশী আমল করতে গিয়ে) নিরুদ্যম হয়ে পড়বে। আর (আল্লাহ ও তাঁর) রসূল ﷺ-এর নিকট সেই আমল বেশী পছন্দনীয়, যা কম হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়।" *(ইবনে হিব্বান প্রমুখ)*

ইবাদত ও আমলে বেশী বাড়াবাড়ি পছন্দনীয় নয় এবং তাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন জরুরী বলেই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সমস্ত দিনগুলি রোযা রাখে, তার প্রতি জাহান্নামকে এত সংকীর্ণ করা হয়, পরিশেষে তা এতটুকু হয়ে যায়।" আর এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর হাতের মুঠোকে বন্ধ করলেন। *(আহমাদ ৪/৪১৪, বাইহাকী ৪/৩০০, ইবনে খুঃ ২১৫৪, ২১৫৫নং)*

যেহেতু সে নিজের জন্য কাঠিন্য পছন্দ করে, কষ্ট সত্ত্বেও তাতে নিজের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে, মহানবী ﷺ-এর আদর্শ থেকে বিমুখতা প্রকাশ করে এবং এই মনে করে যে, সে যা করছে তা তাঁর আদর্শ থেকে উত্তম! *(দ্রঃ ফাতহুল বারী ৪/ ১৯৩, যাদুল মাআদ ২/৮৩)*

আদেশ-উপদেশ করতেও মধ্যমপন্থা ব্যবহার করলে অশান্তি সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি হবে না কোন প্রকার ঝামেলা-ঝঞ্ঝট। মহানবী ﷺ বলেন, "হে মানব সকল! আমি যে কর্মের আদেশ করি, তার প্রত্যেকটাই পালন করতে তোমরা কক্ষনই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৮৭১ নং)*

"(দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে) তোমরা সরলতা ব্যবহার কর, কঠোরতা ব্যবহার করো না, মানুষের মনকে খোশ কর এবং তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮০৮৬ নং)*

ভক্তি ও তা'যীমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ ইসলামে। বরং তাতেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা জরুরী।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

হযরত আলী رضي الله عنه বলেন, 'আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভক্তিতে সীমা অতিক্রমকারী ভক্ত এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী বিদ্বেষী।' *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর লোক আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে না; বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা এবং প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৯৮ নং)*

তিনি আরো বলেন, "অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭০৩৯ নং)*

মানুষের মূল্যায়ন করতে মধ্যমপন্থা প্রয়োগ করাতে নিরাপত্তা আছে। কোন ব্যক্তিত্ব বা জামাআতকে নিয়ে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি, আবার কোন ব্যক্তিত্ব বা জামাআতকে নিয়ে অবজ্ঞায় বাড়াবাড়ি করা মুসলিমের উচিত নয়। বরং যে যেমন মানুষ ও জামাআত তার তেমন মূল্যায়ন হওয়া উচিত। ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। অতএব সেই হিসাবে কাউকে ত্রুটিহীন বা ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তার প্রতি অন্যায় আচরণ অবশ্যই ঠিক নয়।

মুসলিমের জন্য উচিত হল যে, ক্রোধ ও খুশী উভয় সময়ে ন্যায়পরায়ণ হবে। উত্তেজনায় দিশাহারা হয়ে অথবা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে অথবা আবেগে আপ্লুত হয়ে কারো প্রতি অন্যায় করবে না। সুবিচার করতে নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবে না। ফাসেককে কাফের জ্ঞান করবে না। যেমন সন্ত্রাসকে জিহাদ মনে করবে না। ব্যবহার করবে না 'মশা মারতে কামান দাগা'র পদ্ধতি।

সাংসারিক জীবনে বহু মানুষ আসে-যায়, যাদের অনেকে বন্ধুরূপে এবং অনেকে শত্রুরূপে পরিচয় লাভ করে মানুষের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে। তাদের সাথেও ব্যবহারে মধ্যমপন্থা প্রয়োগ করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম।

দূরদর্শী সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।" (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে' ১৭৮ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মাঝে মিত্রতা সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা মুমতাহিনা ৭ আয়াত)*

শত্রুর সাথেও ইনসাফ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর; এটা তাকওয়ার নিকটতর কর্ম এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবশ্যই অবহিত। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

ব্যয় ও খরচ করতেও ইসলাম মধ্যপন্থা প্রয়োগ করতে আদেশ করে। আল্লাহর খাস বান্দাগণের একটি গুণই হল অপচয় ও কার্পণ্য না করা। তিনি তাদের প্রশংসা করে বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা অমিতব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। *(সূরা ফুরকান ৬৭ আয়াত)*

বরং তিনি অপব্যয় ও কার্পণ্য করতে নিষেধ করে বলেন,

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না; হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসবে। *(সূরা ইসরা ২৯ আয়াত)*

মানুষের জীবন সব সময় সমান যায় না। আজ যা আছে কাল ফুরিয়ে যেতে পারে। অতএব যৌবনকালে অর্ধেক খাও আর অর্ধেক সঞ্চয় কর। যৌবনের সঞ্চয় বৃদ্ধকালের অবলম্বন।

মুসলিম জাতিই হল মধ্যমপন্থী জাতি। যার মাঝে চরম ও নরমপন্থা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدًاۗ ﴾

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

মুসলিম যেমন নিছক দুনিয়াদার হয় না, তেমনি হয় না নিছক বৈরাগী বা দরবেশ। বরং উভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে চলে মুসলিম। কেননা, তার প্রতিপালক যে বলেন,

﴿ وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর এবং ইহলোক থেকে তুমি তোমার অংশ ভুলে যেও না।

অর্থাৎ, দুনিয়ার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করো না। *(সূরা ক্বাসাস ৭৭ আয়াত)*

এমনকি পথ চলতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পছন্দ করে ইসলাম। মহান আল্লাহ লুকমান হাকীমের উপদেশ উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (সংযতভাবে) মধ্যরূপ পদক্ষেপ কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। *(সূরা লুকমান ১৯ আয়াত)*

প্রতিপক্ষের খন্ডন করতেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। অন্যায় ও অসমীচীন বাক্য প্রয়োগ করো না তার প্রতি। তার মধ্যে অমঙ্গল থাকলে মঙ্গলের কথাকে দৃষ্টিচ্যুত করো না। অপকারিতা উল্লেখ করলে, উপকারিতার কথা ভুলে বসো না। ত্রুটি থাকলেও তার মাহাত্ম্যের কথা বিস্মৃত হয়ো না।

দাওয়াত বা বয়ানের কাজে রাযায়েল ভুলে কেবল ফাযায়েল অথবা ফাযায়েল বাদ দিয়ে কেবল রাযায়েল উল্লেখ করা সঠিক দাওয়াত-পদ্ধতি নয়। জান্নাত উল্লেখ করলে জাহান্নাম এবং জাহান্নাম উল্লেখ করলে পাশাপাশি জান্নাতের কথা উল্লেখ করা মহান আল্লাহর পদ্ধতি। অতএব তুমিও সেখান হতে শিক্ষা নাও।

যেমন তোমার মাঝে আশা থাকবে তেমনি তোমার মাঝে ভয় থাকুক। শরীয়তের সকল নির্দেশ গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য। কিছু নির্দেশ গ্রহণ এবং অন্য কিছু বর্জন মুসলিমের নীতি হতে পারে না।

নারীর ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে মুসলিম। নারীকে অবহেলিতা নাচীজ মনে করে না। যেমন বিশ্বাস করে না বেলেল্লাপনা নারী-স্বাধীনতায়। মুসলিম নারীর সেই মান রক্ষা করে, যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাকে প্রদান করেছেন।

সাংসারিক জীবনে তোমার পান-ভোজন ও ক্ষুধা নিবারণেও মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা জরুরী। নচেৎ যে জিনিসের স্বাদ আছে তা যদি মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কর, তাহলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তোমাকে কষ্ট দেবে। প্রয়োজনের বেশী শরীরে লবণ-চিনি ব্যবহার করলে অবশ্যই তার কুফল আছে। পক্ষান্তরে মিতভাষী, মিতব্যয়ী, মিতাহারী এবং সর্ব কাজে

মিতাচারী কোন দিন লাঞ্ছিত, অভাবগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয় না।

চারটি জিনিসে মানুষের রোগ জন্মায়; অতি কথন, অতি নিদ্রা, অতি ভোজন এবং অতি সহবাসে। তাছাড়া হাতের কাছে পেয়ে সব এক দিনেই খেতে নেই। রয়ে-বসে খেলে তবেই তার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

চারটি কাজ এমন যাতে বুদ্ধিমত্তা বাড়ে; মানসিক চিন্তা থেকে মনকে নির্মল রাখা, পরিমিত পানাহার করা, উপযুক্ত ও উপাদেয় খাদ্য ভক্ষণ করা এবং যথাসময়ে শরীরের অতিরিক্ত বস্তু (মল-মূত্রাদি) বাহির করা। অন্য দিকে অতি সহবাস, নির্জনতা, দুশ্চিন্তা, অতিহাস্য, দুঃখ-দৈন্য এবং যৌন-চিন্তা জ্ঞানের পরিসর হ্রাস করে।

বলা বাহুল্য, খানা খাও পরিমিত, কিন্তু পানি খাও অপরিমিত। যেমন অতি গরম বা অতি ঠান্ডা ভক্ষণ করো না। আর জেনে রেখো যে, অল্প কথা জ্ঞানীর লক্ষণ, স্বল্প আহার স্বাস্থ্যের সহায়ক এবং অল্প নিদ্রা উপাসনাস্বরূপ।

আর জান তো 'অতির কিছু ভাল নয়। অতির প্রায় সবটাই ক্ষতি। অতি পীরিত যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে। যাবে যদি নিত্যি, ঘটবে একটা কীত্তি। অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। অতি বুদ্ধির হা-ভাত। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। অতি মন্থনে বিষ ওঠে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।'

মোট কথা, তুমি তোমার সংসারে-যৌবনে, প্রেমে-বিদ্বেষে, হর্ষে-হাসিতে, দানে-প্রতিদানে, বাক্যব্যয়ে-বাক্সংযমে, এক কথায় সর্ববিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চল, তাহলে তুমি সুখী হবে, অনেক অশান্তি থেকে আশ্রয় পাবে, বহু ঝামেলা থেকে রেহাই হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় উত্তম আদর্শ, সুন্দর বেশভূষা এবং মধ্যমপন্থা নবুঅতের পঁচিশ ভাগের একটি ভাগ।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

তোমার ইসলাম তোমাকে প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে একটি জরুরী মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছে,

﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ ﴾

অর্থাৎ, (হে বিশ্বজাহানের প্রভু!) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। *(সূরা ফাতিহা ৬ আয়াত)*

সেই পথ যে পথ সহজ, সোজা, সরল, ন্যায় ও সত্য। যার মাঝে কোন বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন নেই। কোন টেরামি বা বক্রতা নেই। আর সেটাই হল মধ্যমপন্থা। সেই পথই হল পুরস্কারপ্রাপ্ত আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের পথ।

আর হ্যাঁ, কারো কাছে গোঁড়া বা কড়া বদনাম শুনে মন খারাপ করো না। কারণ কোন্টা গোঁড়ামি ও কোন্টা ঢিলেমি, তা শরীয়ত ছাড়া কোন চিন্তাবিদ বলতে পারবে না। ডাক্তার বলতে পারেন না তোমার পায়জামার কত কাপড় লাগবে, তেমনি কোন দর্জি বলতে পারেন না তোমার পেটের ব্যথার কি ট্যাবলেট লাগবে। তদনুরূপই কোন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, বুদ্ধিজীবী বা অন্য কোন অনৈসলামী শিক্ষিত লোক তোমার আমলের গোঁড়ামি বা ঢিলেমির ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারেন না। আর করলেও না জেনে তাঁর ঐ মন্তব্য হাস্যকর, বিধায় তাতে তোমার মন খারাপ হওয়ার কথা নয় বন্ধু।

মানসিক পরাজয় দূর কর

মুসলিমদের বর্তমান করুণ হাল-অবস্থা দেখে তোমার মনে অনেক কিছুর আশঙ্কা, ভয়, হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। তুমি যদি প্রকৃত মুসলিম হও, তাহলে তোমার মন অবশ্যই ব্যথা ও দরদে টনটন করবে। আর সুখ উড়ে যাবে মনের বাসা থেকে।

অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম থেকে বহু ক্রোশ দূরে। তা বলে তুমি নিরাশ হবে কেন? কেউ তোমার নসীহত না শুনলে বা সে অনুযায়ী আমল না করলে তুমি হতাশ হবে কেন? হেদায়াতের মালিক কি তুমি?

তোমার মনে হতে পারে যে, সবাই উৎসন্নে গেল, সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তা বলে নিরাশ হয়ে তোমার তো বসে থাকা চলবে না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কেউ যখন বলে, 'লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল!' তখন সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী ধ্বংসোন্মুখ।" *(মুসলিম)*

দ্বীনী ব্যাপারে তুমি তোমার থেকে যে নিচে তার দিকে তাকাও না। বরং তোমার চাইতে যে উচ্চে তাকে দেখ। হিম্মত উঁচু করে তোমার ওস্তায থেকেও বড় হওয়ার চেষ্টা কর। নিজের কদর নিজে কর এবং নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না।

তোমার লেবাসে-পোশাকে আচারে-আচরণে বিশেষ করে কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ থেকে দূরে থাক। কারণ, অন্ধ অনুকরণ তোমার দুর্বলতা ও পরাজয়ের লক্ষণ। তুমি মুসলিম। তুমি কাফেরকে আকৃষ্ট করবে। তুমি নিজে আকৃষ্ট হবে না। তুমি চুম্বক হবে, লোহা হবে না।

কাফেরদের পার্থিব উন্নয়ন দেখে, তাদের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখে নিজেদেরকে হেয় মনে করো না। তাদের কাছে দুনিয়া আছে, আখেরাত নেই। আর তোমার লক্ষ্য আখেরাত। তোমার আখেরাত আছে। দুনিয়া পাওয়া তোমার আসল উদ্দেশ্য নয়। প্রয়োজনে তুমিও পার্থিব জ্ঞান লাভ করতে পার। তুমিও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারকে আখেরাতের কাজে ব্যবহার কর।

মুসলিমদেরকে পরাজিত হতে দেখে মনে মনে পরাজয় বরণ ও স্বীকার করে নিও না। বিজয় তোমার জন্যই অবধারিত ও সুনিশ্চিত। তবে বিজয়ের যে শর্ত আছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না। তোমরাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ; যদি তোমরা মুমিন হও। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৯ আয়াত)*

সেই সাথে বিজয় লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাও। এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্য।

পরিবেশের চাপে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে লজ্জা, সংকোচ বা দ্বিধা করো না। যে পরিবেশেই থাক নিজের সুন্দর চরিত্র নিয়ে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ কর। যেখানেই থাক সেখানেই তোমার ব্যবহারে বুঝিয়ে দাও যে, দ্বীনের সব কিছুকে মেনে নেওয়ার

মানেই মৌলবাদ হলেও তা সন্ত্রাস থেকে বহু দূরে। সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের নিকট অথবা দূরের কোন সম্পর্ক নেই।

যেখানেই থাক ইসলামী আকৃতি ও লেবাস পরিধান কর। বিজাতির আকৃতি ও লেবাস ধারণ করার মানেই হল তাদের কাছে পরাজয় বরণ করা।

এ জগতে ভালো মানুষের দুশমন অনেক। ভালো মানুষের হিংসা করে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। তুমি আদর্শ মানুষ বলেই তোমার হিংসা ও শত্রুতা করবে আদর্শহীন মানুষরা, তারা তোমাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতে চাইবে। তা বলে কি তা তুমি নীরবে বরণ করে নেবে? এ পরাজয় স্বীকার করবে কেন? কোথায় তোমার স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা?

কেন লজ্জা করবে অমুসলিম পরিবেশে নামায আদায় করতে? ব্যঙ্গ ও ঠাট্টার ভয়ে কেন তুমি সত্য প্রভুর সত্য উপাসনা পরিহার করবে? তাও কি পরাভব নয়?

বিজাতির শক্তি দেখে তুমি ভয়ে সন্ত্রস্ত? যুদ্ধের আগেই তুমি আত্মসমর্পণ করে পরাজয় বরণ করে তাদের পূজা করতে লাগলে তুমি কি শান্তি পাবে বন্ধু? তোমার দ্বীন বর্জন না করা পর্যন্ত তারা কি তোমার ব্যাপারে ক্ষান্ত হবে ভেবেছ? কোন দিন না। অতএব ঈমানী শক্তি সঞ্চয় কর প্রথমে অতঃপর সঞ্চয় কর মোকাবিলা করার মত অনুরূপ শক্তি, তবেই ফেলতে পারবে শান্তির নিঃশ্বাস।

মনের সুখী বন্ধু আমার! লজ্জা কাটিয়ে ওঠ। লজ্জাবতী বধুর মত ঘোমটা টেনে মুখ বন্ধ করে থেকো না। তোমার চরিত্রে কলঙ্ক ও অপবাদ দিলে, তোমার সুশোভিত ও সুরভিত দেহে কাদা ছুঁড়লে, উপহাসছলে তোমার চুল বা শাড়ি ধরে টানাটানি করলেও কি তুমি মুখ বন্ধ করে রাখবে, নীরবে চোখের পানি ফেলে যাবে এবং মুখে ফুটে তুমি যে সতী তাও প্রমাণ করতে ও বলতে পারবে না? তুমি যে ছিনিমিনি খেলা বা উপহাস করার পাত্র নও তা কি প্রমাণ করতে অপারগ থেকে মনের কষ্ট মনেই সমাধিস্থ রাখবে? তোমার মান-ইজ্জত যে সবার উপরে তা বিশ্বজগতকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তোমার আদর্শ ব্যবহার প্রয়োগ করতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করবে কেন?

বন্ধু আমার! আসল কথা যে তুমি মানসিক আগ্রাসন ও পরাজয়ের শিকার। নচেৎ মানুষের মনগড়া বিধান নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হবে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের বিধানের ব্যাপারে তোমার অনীহা আসবে কেন?

দুশমনদের কাছে তোমার দুর্বলতা ধরা দিও না। নচেৎ সেই দুর্বলতার ছিদ্রপথে তোমার মনের দুর্গে প্রবেশ করে তোমাকে পরাভূত করে ফেলবে, গোলাম বানিয়ে ছাড়বে তোমাকে, অথচ তুমি হয়তো টেরও পাবে না।

শান্তিকামী বন্ধু আমার! বাস্তবে তোমার পরাজয় হলেও মানসিক পরাজয় স্বীকার করে নিও না। বাঘের বাচ্চা যদি কোন প্রকারে ছাগের হাতে বন্দী হয়েই পড়, তাহলে বন্দীদশায় থেকে ছাগ হয়ে যেও না। নচেৎ লাঞ্ছনাময় জীবনে সুখ কোথায় বন্ধু?

পূর্ণ ঈমানী জীবন গড়

মানুষের প্রকৃতি হল আল্লাহর দান। এই প্রকৃতিকে বিকৃত করে যারা, তারা জীবনে সুখী হতে পারে না। সাময়িক সুখ আনয়ন করতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সুখের স্বাদ তারা পায় না। ঈমানী ভান্ডার থেকে যে বঞ্চিত, সে আসলে মানসিক সংকীর্ণতা, লাঞ্ছনা ও অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে। এ কথার খবর দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজে; তিনি বলেন,

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিকর্ (স্মরণ, কুরআন ও বিধান) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে সংকীর্ণময় জীবন---। *(সূরা ত্বাহা ১২৪ আয়াত)*

পূর্ণ ঈমানে রয়েছে হৃদয়াত্মার পবিত্রতা ও প্রফুল্লতা। ঈমান ছাড়া মনের দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি ভাব দূর হওয়ার কোন পথ নেই। ঈমান ছাড়া জীবনের কোন মিষ্টতা নেই, স্বাদ নেই। ঈমান ছাড়া জীবনের কোন স্থিরতা নেই, স্থিতি-স্থাপকতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যেহেতু তারা প্রথমবারেই ঈমান আনে নি, সেহেতু আমি তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই উদভ্রান্ত ছেড়ে দেব। *(আনআম ১১০ আয়াত)*

আপন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের যারা বিশ্বাস ঘাতক তাদের মন হীনতাগ্রস্ত হয়, প্রাণ দুর্বল হয়, হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। *(কুরআন ৩/১৫১)* তাদের অবস্থা এমন হয় যেন আকাশ হতে পড়ে, অতঃপর পাখী তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। *(কুরআন ২২/৩১)* তাদের জীবনে কোন স্থিরতা থাকে না।

আজ বিশ্বে শান্তি নেই। প্রায় সর্বত্রই হিংসা ও ধ্বংস বিরাজমান। কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষ যদি জ্ঞান করে একক আল্লাহ, এক দ্বীন ইসলামকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-শান্তি কায়েম হতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

তোমার ঈমানের দুর্বলতা-সবলতা ও উষ্ণতা-শীতলতা হিসাবে পৃথিবীর বুকে সুখ-শান্তি কম-বেশী হবে। ঈমান ভরা হৃদয় হল মহান প্রতিপালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত। অতএব সে জীবনে যে শান্তি আছে তা বলাই বাহুল্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(সূরা নাহল ৯৭ আয়াত)*

﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ ﴾

অর্থাৎ, আর যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ। *(সূরা কাহফ ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং নাসারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। *(সূরা মাইদাহ ৬৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! যদি তার কোন মঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করে। আর যদি তার কোন অমঙ্গল আসে, তাহলে তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করে ধৈর্য ধরে। (আর উভয় অবস্থাই তার জন্য মঙ্গলময়।)" *(মুসলিম)*

তার মানে এই নয় যে, তুমি আল্লাহর পরীক্ষা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। ঈমানের পরীক্ষা হতে পারে এবং সেই হিসাবে তোমার মান-মর্যাদা নির্ধারিত হতে পারে। আর তাতে প্রয়োজন ধৈর্য ও পরীক্ষার সঠিক জবাব।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দেমাশকের কেল্লায় বন্দী থাকা অবস্থায় বলেছিলেন, 'আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে আমার দুশমনরা আমার কি করে নেবে? আমার জান্নাত ও তার উদ্যান আমার বুকেই আছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই তা আমার সাথে থাকে; আমার কাছ থেকে পৃথক হয় না। আমার বন্দীদশা হল আল্লাহর সাথে একাকীত্ব, আমার হত্যা হল আমার জন্য শহীদী মরণ এবং দেশ থেকে বহিষ্কার হল আমার জন্য (সুখের) ভ্রমণ।'

প্রত্যেক মুমিনই নিজ ঈমান নিয়ে অনুরূপ সুখী হয়; এমন কি দুঃখেও সে সুখী হয়। দুঃখের আগুনে শুয়েও সুখের ফুল নিয়ে স্মিতমুখে খেলতে থাকে।

সুখ ও খুশীর উৎস হল হৃদয়। আর সেই হৃদয় যখন তার প্রতিপালককে নিয়ে উৎফুল্ল হয়, তখন দুনিয়ার অন্য যে কোন সম্পদ অথবা বিপদ তার কাছে সহজ হয়ে যায়। ইবরাহীম বিন বাশ্‌শার বলেন, একদা আমি, ইবরাহীম বিন আদহাম, আবূ ইউসুফ ও আবূ আব্দুল্লাহ ইস্কান্দারিয়া যাওয়ার পথে বের হলাম। পথিমধ্যে জর্ডান নদীর কাছে একটু বিশ্রাম নিতে বসে গেলাম। সেই ফাঁকে শুকনো রুটির কিছু টুকরা খেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলাম। ইবরাহীম নদীতে নেমে পানি পান করলেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে উঠে এসে বললেন, 'হে আবূ ইসহাক! আমরা যে নিয়ামত, মজার জীবন, পরম শান্তি ও সুখের মধ্যে বাস করি তা যদি (দুনিয়ার) রাজা ও রাজপুত্রগণ জানতে পারত, তাহলে তা পাওয়ার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করত!' *(হিলয়াতুল আওলিয়া)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করেছে; সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অধিক ভালোবাসা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ কুফরী থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করা, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করা হয়।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩ নং)*

আমেরিকার এক ধনকুবের কয়েকটি কোম্পানীর মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সর্বদা মানসিক অশান্তি ও অস্বস্তির মাঝে কালাতিপাত করত। তার এক কোম্পানীতে একজন মুসলিম যুবক

কাজ করত। যুবকটি ছিল বড় হাসমুখ এবং সুখী। মালিক যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ করত, তখনই তাকে প্রফুল্ল দেখে আশ্চর্যবোধ করত। একদা তাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেই বসল, 'আমি তোমাকে বড় আনন্দময় দেখি, তার কারণ কি?' যুবকটি বলল, 'কারণ আমি মুসলিম।' মালিক বলল, 'আমি যদি মুসলিম হই, তাহলে আমিও কি আনন্দ লাভ করতে পারব?' যুবক বলল, 'অবশ্যই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

বলা বাহুল্য, যুবকটি মালিককে একটি ইসলামিক সেন্টারে নিয়ে গিয়ে ইসলাম সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করল। ইসলাম গ্রহণের কিছুক্ষণ পর সে অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। আর বলল, আমি জীবনে এই প্রথম বারের মত মানসিক শান্তি ও সুখ অনুভব করলাম। *(ত্বারীকুস সাআদাহ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ فَوَيۡلٞ لِّلۡقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার প্রতিপালকের তরফ থেকে এক আলোতে আছে (সে কি তার মত, যে এরূপ নয়)? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। *(সূরা যুমার ২২ আয়াত)*

পক্ষান্তরে কুফরীর জীবন লাগামহীন, বিক্ষিপ্ত, বড় সংকীর্ণময়। সুখের সাগরে হাবুডুবু খেয়েও কাফের যেন দুঃখের পিপাসায় কাতর থাকে। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তার মনে হয়, যেন কিছুই নেই। এত অস্ত্র, পান্ডা-গুন্ডা এবং দেহরক্ষী রেখেও তার জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকে না। সংকীর্ণতাময় জীবনে সকল ক্ষেত্রে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তঃকরণকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে দেন যে, মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদেরকে কলুষিত করে থাকেন। *(সূরা আনআম ১২৫ আয়াত)*

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! সুখ-শান্তি ও আনন্দের জন্য নিরাপত্তা চাই। আর নিরাপত্তার জন্য ঈমান তথা আল্লাহর বিধানের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা চাই। তা না হলে সুখের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে তার দেখা পাওয়া কঠিন হবে বন্ধু। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোন প্রকার যুল্ম (অন্যায়; শির্ক, পাপ বা অত্যাচার) দ্বারা কলুষিত করে নি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তি এবং তারাই হল সঠিক পথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

সুপ্রিয় বন্ধু আমার যদি তোমার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে আজ মুসলিমরা এত লাঞ্ছিত ও

নিরাপত্তাহীন কেন?

উত্তরে বলতে পার যে, সুখী মানুষদের দুশমন বেশী। তাদের প্রতি হিংসুকদের ছোবল তাদেরকে সুখের নিঃশ্বাস নিতে দেয় না বন্ধু। তাছাড়া ঃ-

'বিশ্বে তারা ছিল সেরা হয়ে মুসলমান,
আজকে তারা লাঞ্ছিত ছাড়িয়া কুরআন।'

ধর্মহীন জীবনের কোন সুখ নেই। যে জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, সে জীবনের কোন মূল্য নেই। 'ধর্মরহিত জীবন সিদ্ধান্তরহিত জীবনের সমান। আর সিদ্ধান্তরহিত জীবন হল হালবিহীন নৌকার সমান।'

ধর্মহীন জীবনে বাহ্যিক কিছু সুখ থাকলেও আসলে তা বিষ ও বিষাদে পরিপূর্ণ। এ কথা তুমি না মানলেও তাদের অনেকেই তা স্বীকার করে।

ফ্রান্সের একজন নও-মুসলিম মহিলা কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র ভ্রমণ করার পর উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলাদের এক সমাবেশে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যে বিষ উদ্‌গীরণ করে ফেলে দিয়ে জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষায় আমরা পাশ্চাত্যের মেয়েরা ইসলামের ছায়া তালাশ করছি, সে বিষই প্রাচ্যের শিক্ষিতা মেয়েরা চেটে-পুটে খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ছে দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি।' *(সাগর সেচা মানিক ২০৩-২০৪পৃঃ)*

নিজের বুকে মানিক রেখে সুখের জন্য কোথায় লোহা অনুসন্ধান করছি আমরা? আমরা সেদিন সুখের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারব, যেদিন আমরা আমাদের স্বরূপ চিনতে পারব। জানতে পারব নিজেরা নিজেকে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান হল আমাদের বুকে সুখের সাত রাজার ধন।

আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর

মানুষের মৌলিক পাঁচটি প্রয়োজনীয় জিনিসের সংরক্ষার জন্য ইসলাম, রসূল তথা কুরআন এসেছে এ পৃথিবীতে। মানুষের জান, ঈমান, জ্ঞান, মান ও ধনকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার জন্য একমাত্র ও অদ্বিতীয় আইন হল আসমানী আইন। মানব-রচিত কোন আইনই সে সবের যথার্থ সুরক্ষা করতে পারে না। দিতে পারে না সে সবে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা। বলা বাহুল্য, যারা ইসলামের তথা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে, তারাই পেতে পারে সে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ۝٢٤ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও, যখন রসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয়ে থাকেন। পরিশেষে তাঁর কাছেই

তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)*

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। *(সূরা আহযাব আয়াত নং ৭১)*

﴿ قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٥٤ ﴾

অর্থাৎ, বলঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত (রসূলের) দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রসূলের কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দেওয়া। *(সূরা নূর আয়াত ৫৪)*

﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ ﴾

অর্থাৎ, মঙ্গল তাদের জন্য যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। *(সূরা রা'দ ১৮ আয়াত)*

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। *(সূরা নূর ৫২ আয়াত)*

﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١ ﴾

অর্থাৎ, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ে আদেশ প্রদান করে এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর নামাযের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٣٢ ﴾

অর্থাৎ, আর আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও। *(সূরা আলে ইমরান ১৩২ আয়াত)*

﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। *(সূরা নূর আয়াত ৬৩)*

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাল ও পদক্ষেপে যদি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত আদর্শ রসূলের অনুসরণ কর, তাহলে তোমার জীবনে কোন প্রকারের লাঞ্ছনা ও অশান্তি আসার কথা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রে যদি আইন-আদালতে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও শান্তির কথা সুনিশ্চিত।

তদনুরূপ মা-বাপের সাথে ব্যবহারে, সন্তান-সন্ততি মানুষ করার ব্যাপারে এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করলে কোনদিন তোমার সংসারে কোন প্রকারের অশান্তি আসতে পারে না। যেমন পর্দার ফরয পালন করলে অনেক অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এবং সেই সকল অশুভ পরিণাম থেকে বাঁচা সম্ভব হবে, যা বেপর্দা পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অবশ্য সংসারে তুমিই মাত্র একা অনুগত ও বাকী অবাধ্য হলে পূর্ণ শান্তি পাওয়া সত্যই কঠিন। তবুও তাতে যে তুলনামূলক অনেক শান্তি পাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঠিক এই ভাবেই আত্মীয়তার বন্ধনে, মানুষের সাথে লেনদেনে, বড়দের সাথে ব্যবহারে তুমি যদি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অনুগত হও, তাহলে তোমার জন্য শান্তি ও সফলতা সুনিশ্চিত।

দিনের বেলায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যাতে রাতে তোমার সুনিদ্রা হয় এবং রাতের বেলায় আনুগত্য কর, যাতে দিনের বেলায় লোকের কাছে লোককে মুখ দেখাতে পার। পরম শান্তি ও নিরাপত্তা আছে ঐ আনুগত্যেই। আনুগত্য হারিয়েই মুসলিম নেমে গেছে অধঃপতনের অতল তলে। তার মান নেই বিজাতির কাছে, মান নেই স্বজাতির কাছেও। এমনকি নিজের মান নিজেও রাখতে পারে না সে!

মওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, মুসলমানগণ আল্লাহর আনুগত্য করতেন, তাঁদের তখনকার শৌর্য-বীর্য ও সৌভাগ্যের কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করে আজ তারা লাঞ্ছনার কোন স্তরে পতিত, -সেটা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি কে না চায়? সুতরাং যে পথে সৌভাগ্য এসেছিল, সেই পথে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি? *(সাগর সেচা মানিক ১৩১ পৃঃ)*

মুসলিমদের এই আল্লাহ-ভোলার কারণে আপতিত দুরবস্থা দর্শন করেই কবি গেয়েছিলেন,

'খোদায় পাইয়া বিশ্ব-বিজয়ী ছিল এক দিন যারা,
খোদায় হারায়ে ভীত-পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা!
আল্লাহর নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফিরে
ভোগ-বিলাসের মায়ায় ভুলে হায় নিল বন্ধন-কারা।
খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন,
দুখে-রোগে-শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ-
এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের
খোদায় হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা।।'

আল্লাহর বান্দা ও দাস হয়ে আল্লাহর কেমন আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে তার উদাহরণ পেশ করেছেন ইবরাহীম বিন আদহাম। একবার তিনি একটি দাস কিনলেন। ঘরে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খাবে?

দাস ঃ যা খাওয়াবেন।

ইব্রাহীম ঃ কি পরবে?

দাস ঃ যা পরাবেন।

ইব্রাহীম ঃ কি নাম তোমার?

দাস ঃ যে নামে ডাকবেন।

ইব্রাহীম ঃ কোন দরখাস্ত আছে কি?

দাস ঃ কেনা গোলামের আবার দরখাস্ত কি থাকতে পারে?

এই সকল উত্তর শুনে ইব্রাহীম বিন আদহাম নিজের জামার কলার ধরে নিজেকে নিজে বলতে লাগলেন, 'ওরে অসহায়! অক্ষম! নিজের জীবনে তুইও আপন প্রভুর সাথে ঠিক তেমন ব্যবহার করিস, যেমন এই গোলাম বলছে।'

এক বিদ্বান বলেন, 'মিসকীন আদম-সন্তান! সে যদি দোযখকে ঠিক সেইরূপ ভয় করত, যেরূপ দারিদ্রকে করে, তাহলে সে উভয় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যেত। সে যদি সেইরূপ বেহেশ্তের লোভ রাখত, যেরূপ দুনিয়ার রাখে, তাহলে সে উভয়ই লাভ করত। আর সে যদি আল্লাহকে গোপনে সেই রকম ভয় করত, যে রকম সে প্রকাশ্যে তাঁর সৃষ্টিকে ভয় করে থাকে, তাহলে সে ইহ-পরকালে সুখী হত।'

সুখ-কামী বন্ধু আমার! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে রয়েছে ইহ-পরকালের পরম ও চরম সুখের রহস্য। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে তুমি প্রয়াসী হবে কি?

আল্লাহকে স্মরণে রাখ

দুঃখের সাগরে ভাসমান বন্ধু আমার! আল্লাহকে স্মরণ কর, দুঃখের বোঝা হাল্কা হবে, জীবনে সুখ ও স্বাদ আসবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌রে (স্মরণে) প্রশান্ত থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহর যিক্‌রেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত কাজ করে, তাদের ফলও হয় উল্ট। মহান আল্লাহ সে কথাও বলেন যে, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণে) বিমুখ হয়, তিনি তার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হত!' কত নিকৃষ্ট সে সহচর।" *(সূরা যুখরুফ ৩৬-৩৮ আয়াত)*

"দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ। তারা স্পষ্ট

বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" *(সূরা যুমার ২২ আয়াত)*

আল্লাহর যিক্র থেকে বিমুখ হওয়ার মানে হল, তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষের মৃত্যু হয়। আর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহর যিক্রে রয়েছে নানাবিধ উপকার; যিক্র শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমন্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুজী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মুমিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে , মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দূরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিমন্দ, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দূরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃতি দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিক্রকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লার আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মুমিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

যিক্রকারীর জন্য ফিরিশ্তা দুআ করেন, যিক্রের মজলিস ফিরিশ্তাবর্গের মজলিস, যিক্রকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন।

যিক্র শুক্রের মস্তক, যিক্র দুআকে কবুলের যোগ্য করে, মুমিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিক্রে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-ওয়া-বিলুস সুইয়িব, ইবনুল কাইয়েম)*

আল্লাহর যিক্রে এমন একটি সুখের স্বাদ আছে, যা শত কষ্টের মাঝে থেকেও কেবল যিক্রকারী বান্দাগণই অনুভব ও আস্বাদন করে থাকেন। সেই স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন ইউনুস নবী মাছের পেটে। সর্বশেষ নবী সওর গুহায়; যখন কাফেররা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর কাছাকাছি হয়ে পড়েছিল। আবূ বাক্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে বলেছিলেন, "চিন্তা করো না আবূ বাক্র। আমরা দুজন নই; আমরা তিনজন আছি। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

আল্লাহর স্মরণের স্বাদ আস্বাদন করেছেন ইউসুফ নবী কারাগারে বন্দী অবস্থায়। সেই তৃপ্তি আস্বাদন করেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বাদশার কশাঘাত খেয়ে। সেই প্রহার সহ্য করে; যে প্রহার কোন উটকে করা হলে, উট মারা যেত!

সুখের সেই আমেজ আস্বাদন করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া কারাগারে সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে বন্দী থেকে। সেই সুখ অনুভব করতে করতে তিনি বলেছিলেন,

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابُۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর; যাতে একটি দরজা

থাকবে। ওর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আযাব। *(সূরা হাদীদ ১৩ আয়াত)*

বাহ্যতঃ আযাব দৃষ্ট হলেও প্রকৃত সুখ ছিল আল্লাহর যিক্রে। আল্লাহর স্মরণ না হলে বিলাস-মহলেও সুখ নেই।

কেউ নাইবা দিল তোমায় ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার কামনায় কেবল আল্লাহকেই ভালোবেসে যাও। তাঁর ভালোবাসা পেলে, তাঁরই স্মৃতি ও স্মরণে তোমার জীবন ধন্য হবে। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে যদি তুমি তাঁরই ধ্যান মনের মধ্যে রাখ, তাহলে অবশ্যই তুমি এমন সুখের তৃপ্তি অনুভব করবে যে, দুনিয়ার বড় থেকে বড় কোন বাদশা তা অনুভব করতে পারে না।

তুমি একাকী থাক মরুভূমিতে, থাক কোন দ্বীপ-দ্বীপান্তরে, থাক রুদ্ধ কারাগার অথবা বদ্ধ কোন ঘরে, থাক বন-জঙ্গল বা অচিন পর্বতে, থাক এশিয়া-ইউরোপ, বা আফ্রিকা-আমেরিকাতে, সেখানে তুমি একা নও বন্ধু। সেখানকার মাটি-পাথর, আলো-অন্ধকার, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই তোমার বন্ধু, এ সবের সৃষ্টিকর্তা তোমার উত্তম সাথী। তাঁর স্মরণে তুমি সব ভুলে যেতে পার। যখন তোমার কেউ ছিল না, কেবল তুমি ছিলে, তখন তিনিই তোমার ছিলেন। যখন তোমার সব হল, তখনও তিনি তোমার ছিলেন। এখন সবাই তোমার নিকট থেকে পর অথবা দূর হয়েছে, এখনও তিনি তোমার সাথী। কাল যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তখন তোমার কেউ সাথ দেবে না, তখনও তিনি তোমারই। সেই চিরসাথীকে না ভুলে তাঁকে নিয়েই তুমি প্রশান্ত থাকতে পার বন্ধু।

অতএব এ মহাবিপদে তোমার ভয় কি? তাঁর কাছে নিরাপত্তা লাভের আশা কর। এ পীড়ার হাতুড়ির আঘাতে তোমার আর্তনাদ কেন? তাঁকে স্মরণ করে তুমি ধৈর্য ধর। মহাদুর্দিনে তুমি নিরাশ কেন? তুমি তাঁর মহাপ্রতিদানের আশা কর। তাঁর যিক্রে তোমার মন সান্ত্বনিত হোক। সর্বক্ষেত্রে তোমারই তো লাভ।

এর থেকে বড় আর কি চাও যে, তুমি তাঁকে স্মরণ করলে, তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। তিনি তো বলেন,

﴿ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২ আয়াত)*

(হাদীসে কুদসীতে) "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি----।" *(বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)*

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে

উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা মুনাফিকূন ৯ আয়াত)*
আল্লাহর যিক্র শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে সফল হওয়ার মূল কারণ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)*

আল্লাহর স্মরণ রুযী লাভে সফল হওয়ার মূল কারণ। তিনি বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

আল্লাহর যিক্র চরম বিপদ থেকে মুক্তিলাভের প্রধান কারণ। তিনি বলেন,

﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

অর্থাৎ, সে (ইউনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।" *(সূরা সা-ফ্ফা-ত ১৪৩- ১৪৪ আয়াত)*

প্রিয়তমের স্মরণে পিরীতের পীড়া উপশম হয়। প্রিয়তম মন থেকে সরে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয়, হৃদয়ে অশান্তি আসে, অপরের ভয় হয়। যার প্রিয়তম আল্লাহ তাআলা, সে যদি তাঁকে স্মরণে রাখে, তাহলে তাঁর সকল পীড়া উপশম হয়, সকল ব্যথা দূরীভূত হয়, সৃষ্টির ভয় অপসৃত হয় এবং যাবতীয় বালা-মসীবত নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

প্রিয়ের কাছে প্রিয়তমের নাম, প্রিয়তমের কথা বড় মধুর লাগে। বারবার তার নাম শুনতে ও মুখে বলতে মিষ্টি লাগে। আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই অনুরূপ মাধুর্য ও মিষ্টতা অনুভব করে থাকে।

সে মানুষের জীবনের কি মূল্য আছে, যে মানুষের কোন প্রিয়তম নেই; যার স্মরণে ও সাক্ষাতে সে সান্ত্বনা পায়, যাকে নিয়ে নির্জনে মুনাজাতে পরম তৃপ্তি লাভ করে থাকে।

মালেক বিন দীনার বলেন, 'আল্লাহর যিকরের মত অন্য কিছু দ্বারা কেউই মিষ্টতা আস্বাদন করে নি।'

হাসান বাসরী বলেন, 'তোমরা তিনটি জিনিসে মিষ্ট স্বাদ অনুসন্ধান কর; নামাযে, আল্লাহর যিকরে ও কুরআন তেলাঅতে। এতে যদি মিষ্টতা পাও তো ভাল। নচেৎ, জেনে রেখো (আল্লাহ-প্রেমের) দরজা বন্ধ।'

কেউ বলেন, 'রঙ-তামাশায় রঙবাজরা যে মজা না পায়, তার থেকে বেশী মজা পায় তাহাজ্জুদে তাহাজ্জুদ-গুযাররা। রাত না থাকলে আমি দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পছন্দ করতাম না।'

কেউ বলেন, 'পুরো একটা বছর তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হওয়ার জন্য বড় কষ্ট স্বীকার করেছি। কিন্তু তাতে সুখ উপভোগ করেছি বিশটা বছর।'

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! আল্লাহর স্মরণের জন্য নিয়মিত (অর্থসহ) কুরআন তেলাঅত কর। তাতেও তুমি দুঃখে সান্ত্বনা ও মনে বল পাবে।

আল্লাহর কাছে দুআ কর

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! যে কোন প্রয়োজন ও বিপদে তোমার প্রতিপালক তোমার কাছে, তোমার সাথে। সেই সময় তুমি তাকে আহবান করলে সত্বর সুফল পাবে। তোমার আহবানে তিনি সাড়া দেবেন। তোমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করবেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।" *(সূরা বাকারাহ ১৮৬)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, অথবা তিনি যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে আহবান করে, যিনি বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। *(সূরা নামল ৬২)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দাকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

সুখ ও সমৃদ্ধির ভান্ডার ভরপুর মহান প্রতিপালকের কাছে। চাইলে এবং তুমি তা পাওয়ার যোগ্য হলেই তো পাওয়া যাবে। দয়া ও ক্ষমার দরিয়া তিনি। প্রার্থনা করলেই তো অর্জন করা যাবে। সুতরাং তাতে তো তোমার দ্বিধা, সংকোচ বা অবজ্ঞা হওয়া উচিত নয় বন্ধু। চাও তাঁর কাছে খুশীর সময়, চাও দুঃখের সময়। বারবার চাও। নাছোড় বান্দা হয়ে চাও। তোমার দুআ কবুল হবেই -এই একীন নিয়ে চাও।

তকদীরের লিখনের কথা বলছ? দুআতে তকদীরও পাল্টে যায়। অতএব দুআ করে তোমার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত কর।

মনঃক্ষুন্ন বন্ধু আমার! যদি ভুল করে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা পেতে চাও, তাহলে আদম নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(সূরা আ'রাফ ২৩)*

যদি কোন কাফের গোষ্ঠী তোমাকে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং সর্বপ্রকার চেষ্টা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তুমি গত্যন্তরহীন নিরুপায় হয়ে যাও, তাহলে নূহ নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًۢا ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কোন কাফেরকে অব্যাহতি দিও না। তুমি ওদেরকে অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা ঈমানদার হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছে তাদের এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে ক্ষমা কর। আর যালেমদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দাও। *(সূরা নূহ ২৬-২৮ আয়াত)*

সন্তানহীন হয়ে বসে না থেকে সবল মনে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে যাকারিয়া নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না। তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৯ আয়াত)*

﴿ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। *(সূরা আলে ইমরান ৩৮ আয়াত)*

রোগ-পীড়ায় জর্জরিত হয়ে নিদারুন ব্যথা সহ্য করতে করতে কাকুতি-মিনতির সাথে আরোগ্য প্রার্থনার সাথে আয়্যুব নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, (হে আল্লাহ!) আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(সূরা আম্বিয়া ৮৩ আয়াত)*

মহাবিপদে পতিত হয়ে সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ দেখে নিরাশ মনের গভীর আবেগে আশার আলো জ্বেলে ইউনুস নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াতের কাজে যদি কোন অসুবিধা ভোগ কর, তাহলে মূসা

নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ۝٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ۝٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ۝٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ۝٢٨ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও; যাতে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। *(সূরা ত্বাহা ২৫-২৮ আয়াত)*

যদি কোন ফিরআউনের চাপের মুখে পড়ে তোমার সত্য পথে কাঁটা পড়ে যায়, তাহলে মূসা নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةٗ وَأَمۡوَٰلٗا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَۖ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ ۝٨٨ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনের শোভা ও সম্পদ দান করেছ, যা দিয়ে - হে আমার প্রতিপালক - ওরা (মানুষকে) তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর এবং ওদের হৃদয় মোহর করে দাও। কারণ, ওরা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। *(সূরা ইউনুস ৮৮ আয়াত)*

পাপী মানুষের জন্য যদি তোমার মন ব্যথিত হয়ে থাকে, তাহলে ঈসা নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝١١٨ ﴾

অর্থাৎ, তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মাইদাহ ১১৮ আয়াত)*

দেশের সরকার ও অধিকাংশ মানুষ যদি তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমার ধ্বংস কামনা করে, তাহলে তাওহীদের ইমাম ইবরাহীম নবী ও আমাদের সর্বশেষ নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ۝١٧٣ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩ আয়াত)*

যদি তোমার দেশ ও মাতৃভূমি থেকে তোমার দুশমনরা তোমাকে বহিষ্কার করে দেয়, তাহলে মহানবীকে আল্লাহর শিখানো দুআ তুমি বল,

﴿ رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বাহির কর। আর তোমার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর। *(সূরা ইসরা ৮০ আয়াত)*

দ্বীন বাঁচাতে গিয়ে বিধর্মীদের ভয়ে যদি তোমাকে কোন সময় কোন দেশ ত্যাগ করতেই হয়, তাহলে আসহাবে কাহফের মত দুআ করে বলো,

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةً وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدًا ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি নিজে হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করে দাও। *(সূরা কাহফ ১০)*

কোন দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায় যদি তোমার বিরুদ্ধে একজোট হয়, তাহলে লূত নবীর মত দুআ করে বল,

﴿ رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। *(সূরা আনকাবূত ৩০ আয়াত)*

কোন পরাক্রমশালী, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের অত্যাচার হতে আশ্রয় চাইতে মূসা নবীর কওমের মত দুআ করে বল,

﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحۡمَتِكَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর। *(সূরা ইউনুস ৮৫-৮৬ আয়াত)*

তদনুরূপ ইবরাহীম নবী ও তাঁর অনুসারীদের মত দুআ করে বল,

﴿ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের পীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মুমতাহিনাহ ৫ আয়াত)*

নানা মসীবতের জমাট বাঁধা পাথর এসে জীবনের পর্বতগুহার দরজা যদি বন্ধ করে দেয়, তাহলে নেক আমলের অসীলায় ব্যথা ভরা করুণ মন নিয়ে সকাতর প্রার্থনা কর।

দুআ হল মুমিনের হার্দিক ও দৈহিক ব্যাধির ঔষধ। অতএব যদি তুমি কোন রোগ-বালায় পড়ে অশান্তি ভোগ করতে থাক, তাহলে দুই হাত তুলে আসমানের দরজায় করাঘাত কর।

দুআ হল মুমিনের অস্ত্র। অতএব তুমি যদি দুর্বল অথবা সবল, অস্ত্রহীন অথবা সশস্ত্র মুজাহিদ হও, অথবা কোন শত্রু-নিধন করতে চাও, তাহলে দুই হাত তুলে এই আসমানী ক্ষেপণাস্ত্র (রকেট) ব্যবহার কর। তোমার শত্রুর উপর বিজয়-কেতন হবে এই দুআ।

দুআ বালা-মসীবতে সান্ত্বনার সাথী, সংকীর্ণতায় প্রশস্ততার প্রবেশদ্বার, ব্যথা-বেদনার উপশমকারী মলম। দুই হাত তুলে সেই মলম ব্যবহার কর, সকল ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প ও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে আল্লাহর নিকট থেকে। এই সময়ে তুমি তাঁর দরবারে দরখাস্ত দিয়ে নিজের গত্যন্তরহীনতার কথা নির্জনে জানাও। তিনিই তোমার এ দুর্দশা ও দুরবস্থা দূর করবেন।

ঋণের বোঝা যদি তোমার কোমর ভেঙ্গে থাকে, দিনের বেলায় লাঞ্ছনায় লোককে মুখ

দেখাতে ইচ্ছা না হয় এবং রাতের বেলায় দুশ্চিন্তায় তোমার ঘুম না আসে, অথবা হিংসুকের হিংসা এবং দুশমনের দুশমনি যদি তোমার মনের শান্তি ও স্বস্তি কেড়ে নেয়, তাহলে হৃদয়ের দ্বার খুলে মনের ব্যথা জানিয়ে মনের সৃষ্টিকর্তাকে বল,

[illegible]

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্নি অল আজ্যি অল কাসালি অল বুখ্লি অল জুব্নি অ য্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী)*

হে শোষিত-বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত বন্ধু! নিরাশ না হয়ে প্রাণ খুলে মহান প্রভুর কোর্টে তোমার এ মামলা তুলে দাও। আর জেনে রেখো যে, তোমার দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রকার অন্তরাল নেই।

দারিদ্রের জ্বালা ও ক্ষুধার তাড়নায় উত্যক্ত বন্ধু আমার! মহান খাদ্যদাতার কাছে উপস্থিত হৃদয় নিয়ে এবং মঞ্জুর হবে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দুই হাত তুলে তোমার দরখাস্ত পেশ কর। তিনি তোমার অন্ন যোগাবেন।

রুযী-সন্ধানী বন্ধু আমার! চাকুরীর জন্য বহু দরখাস্ত দিয়েছ, বহু সার্টিফিকেট জমা করেছ, বহু ব্যাকিং লাগিয়েছ; এমন কি হয়তো অবৈধ ঘুসও দিতে কসুর কর নি, তবুও চাকুরী হয়নি। কিন্তু গভীর রাতের অন্ধকারে গোপনে রুযীদাতা মহান আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে একবার গভীর বেদনার সাথে দরখাস্ত পেশ করেছ কি?

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বন্ধু! তুমি যদি তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে খুশী আনতে চাও, তাহলে আল্লাহর কাছে দুআ কর এই বলে,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আব্দুকা অবনু আব্দিকা অবনু আমাতিক, না-স্বিয়াতী বিয়্যাদিক, মা-যিন ফিইয়্যা হুকমুক, আদলুন ফিইয়্যা ক্বাযা-উক, আসআলুকা বিকুল্লিস্মিন হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিক, আউ আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিক, আবিস্তা'ষারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইন্দাক; আন তাজআলাল কুরআ-না রাবীআ ক্বালবী অনূরা স্বাদরী অজালা-আ হুযনী অযাহা-বা হাম্মী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশ গুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক

সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(আহমাদ ১/৩৯১, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

উপস্থিত বিপদ দূর করার জন্য এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ কর,

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইন, অ আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিওনা। এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই। *(আহমাদ, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

আল্লাহর রহমতের আশাধারী বন্ধু আমার! আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ, তাঁর উপর একবার দরূদ পাঠ করলে মহান আল্লাহ তোমার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।

সুখের আশাধারী বন্ধু আমার! দুআ কর তোমার দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার জন্যঃ-

﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾

উচ্চারণঃ- রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। *(সূরা বাক্বারাহ ২০১ আয়াত)*

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আস্লিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ আস্লিহ লী দুন্য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্লিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্র্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর যা আমার সকল কর্মের হেফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুসলিম ৪/২০৮৭)*

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্দুন্য়্যা অলআ-খিরাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩/ ১৮০)*

নামাযে সান্ত্বনা নাও

দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধু আমার! তোমার দুর্দশা ও দুরবস্থার কথা একান্ত আপনজনকে নিভৃত আলাপে নামাযের মাধ্যমে জানাও।

বিপদের ভার যখন তোমার মাজা ভেঙ্গে ফেলে, হৃদয়ের হা-হুতাশ যখন তোমাকে ছারখার করে ফেলে, শত্রুর শত্রুতা ও অত্যাচারীর অত্যাচারের তরঙ্গমালা যখন তোমার বক্ষসমুদ্র-তটে বারবার আঘাত হানে, কোন দুষ্কৃতী যখন তোমার প্রাণ হরণ করতে চায়, তখন নামাযের মাধ্যমে সান্ত্বনা নাও, আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানাও, উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাও।

নামায হল মুমিনের মুনাজাত, নামায দাস ও তার প্রভুর মাঝে এক সেতুবন্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে তার প্রভুর সহিত মুনাজাত (গোপনে বাক্যালাপ) করে।" *(আহমাদ, বুখারী ৫৩১নং, মালেক, মিশকাত ৮৫৬ নং)*

নামায গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ও বিপদে সাহায্য, নোংরা ও অশ্লীল কর্মে প্রতিবন্ধক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। বিনীতগণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য নিশ্চিতভাবে তা কঠিন কাজ। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী। *(ঐ ১৫৩ আয়াত)*

নামায বিপদে সহায়ক এবং তারই মাধ্যমে সাহায্য পাওয়া যায় বলেই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, বিশেষ প্রয়োজন, ইস্তিস্কা, ইস্তিখারা প্রভৃতির নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে।

মহানবী ﷺ যখন কোন কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়তেন, তখন নামায পড়তেন। *(আহমাদ ১/২০৬, আবূ দাঊদ ১৩১৯, নাসাঈ, মিঃশকাত ১৩২৫নং)*

নামায মুমিনদের হৃদয়ের এবং কিয়ামতের জ্যোতি। মহানবী ﷺ বলেন, "নামায হল জ্যোতি।" *(মুসলিম ২২৩নং)*

সুখ-অন্বেষী বন্ধু আমার! নামাযে খেয়াল কর; তুমি এক অপরাধী, ক্ষমার ভিখারী। তুমি এক পলাতক দাস, অনুতপ্ত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ-প্রার্থী। তুমি একজন দুর্বল ক্ষমতাহীন, ক্ষমতার ভিখারী। তুমি একজন নিঃস্ব অসহায়, সাহায্য ও সহায়তার অভিলাষী। পথভ্রষ্ট,

পথ-নির্দেশের আশাধারী। ক্লিষ্ট ও পীড়িত, নিরাপত্তা ও নিরাময়ের ভিখারী। রুযীহীন, রুযীর ভিখারী। আর মনে রাখ যে, এসব ভিক্ষা তুমি তাঁর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজায় পাবে না, পেতে পার না। তাই তো তুমি প্রত্যেক রাকআতে বলে থাক,

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ﴾

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করে থাকি এবং তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। *(সূরা ফাতিহা ৪ আয়াত)*

নামায মুমিনদের অন্তরের প্রফুল্লতা ও চক্ষুর শীতলতা। মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।" *(আহমাদ ৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫, নাসাঈ ৭/৬১, হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে ৩১২৪নং)*

অতএব নামাযে তোমার চক্ষু শীতল হোক। হৃদয়-মন ভরে উঠুক শান্তি ও স্বস্তিতে। উপশম হোক সকল প্রকার ব্যথা ও বেদনার। একদা তিনি বিলাল ﷺ-কে বললেন, "নামাযের ইকামত দিয়ে তদ্দ্বারা আমাদেরকে শান্তি দাও, হে বিলাল!" *(আবূ দাউদ ৪৯৮৫, মিশকাত ১২৫৩ নং)* অতএব তুমিও তোমার মনের পরম শান্তি নামাযেই খুঁজে পাবে।

মনের খুশী ও স্ফূর্তি আনয়ন করতে তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়। তা না পারলেও ফজরের নামাযের জামাআত যেন তোমার কোনক্রমেই না ছোটে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গাঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক গাঁটের সময় এই মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে দেয়, 'তোমার এখনো লম্বা রাত বাকী। সুতরাং এখনও ঘুমাও।' অতঃপর সে যদি জেগে আল্লাহর যিক্র করে, তবে একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর ওযু করলে আর একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর নামায পড়লে সকল বাঁধনগুলোই খুলে যায়। ফলে ফজরের সময় সে উদ্যম ও স্ফুর্তিভরা মন নিয়ে ওঠে। নতুবা (তাহাজ্জুদ না পড়লে) আলস্যভরা ভারী মন নিয়ে সে ফজরে উঠে।" *(মালেক, বুখারী ১১৪২নং, মুসলিম ৭৭৬নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

'মসজিদে ঐ শোনরে আযান চল্ নামাযে চল্,
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই - বক্ষে পাবি বল।
ওরে চল্ নামাযে চল্।।
ময়লা-মাটি লাগলো যা তোর দেহ-মনের মাঝে-
সাফ হবে সব, দাঁড়াবি তুই যেমনি জায়নামাযে;
রোজগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল।
ওরে চল্ নামাযে চল্।।'

কিন্তু তুমি যদি নামাযীই না হও, তাহলে কি আর বলব তোমাকে? তোমার জন্মের সময় তোমার কানে আযান দেওয়া হল, অথচ মরণের আগে পর্যন্ত তুমি নামায পড়লে না। জেনে রেখো তোমার জীবনও বড় সংকীর্ণ সময়ের; আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মত।

প্রত্যেক কাজে সওয়াবের আশা রাখ

যে কোন বালা-মসীবতে ধৈর্য ধরে তুমি সওয়াবের আশা রাখ, তাহলে তার ধার-ভার হাল্কা হয়ে যাবে। পরকালের প্রতিদানের আশায় মনে সান্ত্বনা পাবে।

আপনজন কেউ হারিয়ে গেছে, এ জগৎ ছেড়ে তোমাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে যাত্রা করেছে, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

দেহের কোন অঙ্গ চলে গেছে, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা ব্যবসায় তোমার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

কোন দীর্ঘ রোগ-জ্বালায় ভুগছ, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

সাধ্য, সময়, কর্তব্য বা বেতনের বাইরে অতিরিক্ত কাজে বিরক্ত হচ্ছ, কষ্ট পাচ্ছ, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

তোমার খাদেম বা লেবারকে তুমি বেশী বেতন দিয়ে সওয়াবের আশা রাখ। ঈদ ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাদেরকে উপহার দাও, বোনাস দাও। বেতন কম দিলেও দেখবে তাতে তোমার উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমন কি তোমার স্ত্রীর জন্য যা খরচ কর, বাড়িতে ছেলে-মেয়ের জন্য, মা-বাপ, ভাই-বোন বা অন্য কোন আত্মীয়র জন্য যা ব্যয় কর, তা তোমার উপর ভারি হলেও, তাতেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ।

যালেমের যুলমেও ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ। যুলমের বোঝা হাল্কা লাগবে।

যে কোনও ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করে, তাতে ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা রাখ। দুঃখ পাবে না, মনে কষ্ট হবে না। উপরন্তু উপকার হবে দ্বিগুণ।

তাক্বওয়া অবলম্বন কর

তাক্বওয়া মানে পরহেযগারী, সংযমশীলতা, সাবধান হওয়া, ভয় করা, বেঁচে চলা ইত্যাদি। পরিভাষায় যথাসাধ্য আদেশ ও বিধেয় কর্ম পালন করে এবং সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কর্ম থেকে এমনকি কিছু বৈধ কর্ম থেকেও দূরে থেকে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেওয়াকে তাকওয়া বলা হয়।

কুরআন মাজীদের বহু জায়গাতেই মুমিনকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন এর আদেশ দেওয়া হয়েছিল পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণকেও।

যাঁরা মুত্তাকী, তাঁরা আল্লাহর ওলী। যাঁর তাকওয়া যত বেশী, তিনি তত বড় আল্লাহর ওলী। তাঁদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তাও নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহর আওলিয়া (বন্ধু)দের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না; যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৩ আয়াত)*

তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿١٩٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

যে যত বড় পরহেযগার, সে আল্লাহর নিকট তত বড় মর্যাদাসম্পন্ন।

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক পরহেযগার। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ পরহেযগার মানুষদের সাথী। তিনি বলেন,

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৪ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকেন যারা মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ। *(সূরা নাহল ১২৮নং)*

পরহেযগার মানুষদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী। মহাভয়ঙ্কর দিনেও তাঁদের বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, তবে মুত্তাকীরা নয়। *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)*

সংযমশীল মানুষ সফলকাম হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই হল সফলকাম। *(সূরা নূর ৫২ আয়াত)*

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

আর সেই সফলতা ও মহাপুরস্কার হল আল্লাহর বেহেশ্ত্। তিনি বলেন,

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾

অর্থাৎ, আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে তাদের পাপ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে সুখদায়ক জান্নাতে (নাঈমে) প্রবেশ করাতাম। *(সূরা মায়েদাহ ৬৫ আয়াত)*

﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, যারা পরহেযগার তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৫ আয়াত)*

﴿ لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্ত্। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আল্লাহর নিকট যা আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম। *(ঐ ১৯৮ আয়াত)*

﴿ لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য বহুতলবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ রয়েছে; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। *(সূরা যুমার ২০ আয়াত)*

অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।"

আর অধিকাংশ কোন অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।" *(তিরমিযী ২০০৪নং, ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া রাখে, আল্লাহ তাকে সুস্থ বিবেক দান করেন। তিনি বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং

তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি মঙ্গলময়। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

পরহেযগার লোকেরা শত বিপদে রক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর আযাব ও গযব থেকে বাঁচিয়ে নেন। তিনি বলেন,

﴿ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যারা ঈমান এনেছিল এবং মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। *(সূরা নাম্‌ল ৫৩ আয়াত)*

যারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সব কাজ সহজ করে দেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান দান করেন, বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় করে দেন, তাদেরকে ধারণাতীত জায়গা থেকে রুযী দান করেন এবং তাদের গোনাহ-খাতা মাফ করে প্রচুর সওয়াব দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে ব্যক্তির জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। *(সূরা ত্বালাক ২-৩)*

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴿٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। এ হল আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। *(ঐ ৪-৫আয়াত)*

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি জনপদের অধিবাসিবৃন্দ ঈমান আনত ও পরহেযগার হত, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা মিথ্যায়ন করল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম। *(সূরা আরাফ ৯৬ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, আকাশে রয়েছে আমাদের রুযীর উৎস; সূর্য ও মেঘমালা। বৃষ্টি হয়, ফসল ফলে। এ ছাড়া পৃথিবীতে গুপ্ত রয়েছে কত গুপ্তধন খনিজ পদার্থ। এ সব সুখের সামগ্রী মহান আল্লাহ মুমিন-মুত্তাকী বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কাফেররা তা পাবে না।

সুখ-লোভী বন্ধু আমার! তাকওয়া বা সংযম এমনই জিনিস যে, তার বাঁধন একবার বিচ্ছিন্ন

হলে মানুষ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তার স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্যার মত প্রবাহিত হয়। আর তাতে তার আদর্শ, শিক্ষা, চরিত্র সবই ভেসে যায়; এমনকি শেষে লজ্জাও আর অবশিষ্ট থাকে না। নির্লজ্জ হয়ে যখন সমাজে বসবাস করে তখন তার মান-সম্ভ্রম বলতেই থাকে না। ঘৃণিত হয় মানুষের চোখে, সংসারে এমন কি তার অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রীর কাছেও। সুখের আশা তো দূরের কথা তখন অশান্তি ও অপরাধ তার মন ও প্রাণের ব্রত হয়। পক্ষান্তরে তাকওয়া হল চরিত্রের বন্ধন। সে বন্ধন সুদৃঢ় থাকলে তোমার শান্তির সংসার সুনিশ্চিত থাকবে।

মুত্তাকী মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায় না। মনের দ্বন্দ্বে সত্য ও সঠিক পথ পায়। ভ্রষ্ট ও অশান্তির পথে কোন সময় তার পা বাড়ে না। সুখী মানুষের জন্য আল্লাহর ভয় হল জীবনের উৎস।

তুমি মুত্তাকী হও, মুত্তাকীর সাথে বন্ধুত্ব গড়, মুত্তাকীর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন কায়েম কর; শান্তি পাবে। আর দুনিয়াদারীর মন-মানসিকতা রাখলে দুনিয়াদারী পাবে; কিন্তু তাতে শান্তির নিশ্চয়তা পাবে না।

আল্লাহর উপর ভরসা রাখ

সকল কাজের দায়িত্বভার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, ছোট-বড় সকল কাজে তাঁরই উপর ভরসা করা, তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখা, তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত সকল কর্মে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা, তাঁর তরফ থেকে মুক্তি, উপায় ও আরোগ্যের আশা রাখা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ বান্দার মঙ্গলই চান এবং তিনি বান্দার লাঞ্ছনা চান না - ঈমানের সুফলমূলক মুমিনের অন্যতম সদ্‌গুণ।

ভয় কিসের তার, যার হিফাযত স্রষ্টা করেন। সেই প্রদীপের নিভে যাওয়ার কি ভয় হতে পারে, যে প্রদীপের হিফাযতকারী স্বয়ং বাতাসই।

ইব্রাহীম নবীকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হল। তিনি জীবনের দায়িত্ব সোপর্দ করলেন সুমহান উকীল স্রষ্টার হাতে। তিনি বললেন,

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩ আয়াত)*

যার ফলে তাঁর উকীল মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন; আগুনকে করে দিলেন শান্তিময় শীতল।

শেষনবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য পৌত্তলিকরা বিরাট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হামলা করার ধমক দিলে তাঁরাও তাঁদের উকীলকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব সোপর্দ করে বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লা-হু অনি'মাল অকীল।'

সুতরাং তাঁদের যে সুফল দাঁড়াল তা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, অনন্তর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল, তাদেরকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৪ আয়াত)*

মানুষ হল দুর্বল জীব। কিন্তু পার্থিব শক্তি নিয়ে হয় শক্তিশালী। তবে তার থেকে বড় শক্তি হল আধ্যাত্মিক শক্তি। আল্লাহর শক্তিতে শক্তি সব শক্তি থেকে বড় শক্তি।

অতএব দুর্বল মনের বন্ধু আমার! ভয় কিসের? আল্লাহর শক্তিতে শক্তি সঞ্চয় করে ভয়কে জয় কর। ব্যাধি বা মসীবতগ্রস্ত হলে, গরীব ও নিঃস্ব হয়ে গেলে, কোন দুশমনকে ভয় হলে, কোন যালেমের যুলম আশঙ্কা হলে অথবা কোন প্রকার সন্ত্রাসে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে হৃদয়ের দ্বার খুলে বল, 'হাসবুনাল্লা-হু অনি'মাল অকীল।'

তোমার উকীল, তোমার রব তোমার জন্য যথেষ্ট।

﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (الفرقان ٠٣١)

বিপদে-আপদে, বালা-মসীবতে, দুশমনের দুশমনির ক্ষেত্রে অথবা যে কোন প্রয়োজনে নির্ভরস্থল একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, পালনকর্তা, ভাগ্যবিধাতা। অতএব তিনিই আমাদের একক মাবূদ এবং একক ভরসাস্থল। তাঁরই উপর ভরসা রাখা উচিত প্রত্যেক মুসলিমের এবং বিশেষ করে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের। যেহেতু ঈমান ও ইসলামের একটি শর্ত এই যে, মঙ্গল আনয়নে এবং অমঙ্গল দূরীকরণে মুমিন ও মুসলিম তাঁরই উপর ভরসা রাখবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে আল্লাহরই উপর ভরসা কর। *(সূরা মাইদাহ ২৩)*

﴿ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, (মূসা বলেছিল,) হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাক, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। *(সূরা ইউনুস ৮৪ আয়াত)*

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর মুমিনদের উচিত, আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মুমিনের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণকালে কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। *(সূরা আনফাল ২ আয়াত)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন,

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি কোন কাজের সঙ্কল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

আর মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা রাখবেই বা কেন? তিনি ছাড়া আর কেউ আছে কি, যে বালা-মসীবত দূর করতে পারে? বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? রুযী দিতে পারে? দুশমন থেকে বাঁচাতে পারে?

আকাশ থেকে কে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে? কে ফলাতে পারে সোনার ফসল? কে দিতে পারে সুখ-সম্মান-সমৃদ্ধি ও সন্তান? মহান আল্লাহ বলেন, তিনিই।

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তোমাকে কল্যাণ দান করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি তোমাকে ক্লেশ দান করেন তবে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তোমাকে কল্যাণ দান করার ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা ইউনুস ১০৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

অর্থাৎ, বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক। *(সূরা যুমার ৩৮)*

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন। তার বিপদ বা বালা দূর করে দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴾

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয় আল্লাহ তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা আনফাল ৬২ আয়াত)*

আল্লাহর উপর ভরসার ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীর;

(১) কেবল আল্লাহর উপর ভরসাকারী ঃ এরা তদবীর না করেই ভরসা করে। এরা দৈহিক পরিশ্রম করে না এবং মনে কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে না।

(২) কেবলমাত্র তদবীর বা ব্যবস্থাবলম্বনের উপর ভরসা রাখে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখেনা।

(৩) আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং সেই সাথে তদবীরও করে। এই শ্রেণীর মানুষ হল প্রকৃত মুমিন।

বুঝা গেল, তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তদবীরের প্রয়োজন আছে। (অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বিনা তদবীরেও বান্দাকে বহু কিছু দান করতে পারেন।) মুমিনের আসল ভরসা আল্লাহর উপর থাকে এবং ব্যবস্থাবলম্বন একটা হেতুমাত্র, যা পরিহার্য নয়। আল্লাহর নবী ﷺ- এর মত আল্লাহর উপর কে যথাযথ ভরসা ও তাওয়াক্কুল রাখতে পারে? অথচ তিনি সফরে সম্বল সাথে নিতেন। যুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও করতেন।

এক ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করার ধরন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে বলল, 'আমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর নির্ভর করব, নাকি উট ছেড়ে দিয়ে?' উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "বরং তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি উপকরণ বিনাও সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম হল, উপকরণ ও কারণ দ্বারাই কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। তিনি যে সকল উপকরণ ও কারণ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে (মানুষের জন্য ব্যবহার) কিছু আছে বৈধ, কিছু অবৈধ। মানুষ অবৈধ উপকরণ ও কারণ ব্যবহার করতে পারে না।

পক্ষান্তরে বৈধ উপকরণ ও কারণ ব্যবহার বৈধ। আর তা হল দুই প্রকার; কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মুমিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না। অবশ্য যাদু, ঐন্দ্রজালিক, শির্কী ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু তা ব্যবহার করা অবৈধ।

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ বৈধ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না। কারণ, তা হবে গায়রুল্লাহর উপর ভরসা রাখার নামান্তর।

বলা বাহুল্য, রোগ-মসীবতে পড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা মুমিনের উচিত নয়। অধৈর্য হলে অবৈধ উপকরণ বা চিকিৎসা ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ হল বৈধ উপকরণ ও চিকিৎসা ব্যবহার। যেহেতু শরয়ী চিকিৎসা মহানবী ﷺ নিজে ব্যবহার করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ আছে। যখন রোগের সঠিক ওষুধ নিরূপিত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে সে রোগটি সেরে উঠে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "এমন কোন রোগ নেই, আল্লাহ যার ওষুধ অবতীর্ণ করেন নি। *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৫৫৫৮-নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা করো না। আল্লাহ হারামকৃত বস্তুর ভিতরে আরোগ্য রাখেন নি।" সুতরাং যথার্থ চিকিৎসায় দোষ নেই। দোষ হল অবৈধ চিকিৎসায়।

রুযী-সন্ধানী বন্ধু আমার! আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখ, আর সেই সাথে তদবীরও করে যাও। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" *(আহমাদ)*

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পাখী বাসাতে বসে থেকে রুযী পাবে, তা নয়। বরং তাকে বাসা হতে বের হয়ে যেতে হবে। আর তবেই সে সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরবে। বলা বাহুল্য, উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে বান্দাকে। আর এ জন্যই আল্লাহর আদেশ হল,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর। *(সূরা নিসা ৭১ আয়াত)*

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখ। *(সূরা আনফাল ৬০ আয়াত)*

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থাৎ, নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

ইয়ামানবাসীগণ সঙ্গে সম্বল না নিয়েই হজ্জ করতে যেত; তারা বলত, 'আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী।' তারা হজ্জ করত। আর মক্কাবাসীদের কাছে এসে যাচ্ঞা করত। এর ফলে আল্লাহর আদেশ এল,

﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত, বুখারী)*

উমার বিন খাত্তাব ﷺ ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কারা?'

তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী।' উমার ﷺ বললেন, 'বরং তোমরা (অবৈধভাবে পরের মাল) ভক্ষণকারী। আল্লাহর উপর ভরসাকারী হল সেই ব্যক্তি, যে জমিতে বীজ ফেলে তাঁর উপর ভরসা করে।'

এক ব্যক্তি হাতেম আসাম্মকে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের বুনিয়াদ কি আপনার নিকট? তিনি বললেন, এর বুনিয়াদ হল ৪টি; আমি জানি যে, আমার রুযী আমি ছাড়া অন্য কেউই খেতে পারে না, যাতে আমার মন নিশ্চিন্ত আছে। আমি জানি যে, আমার কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করবে না, তাই আমি নিজেই তা নিয়ে ব্যস্ত। আমি জানি যে, মৃত্যু আমার নিকট অকস্মাৎ আসবে, তাই আমি তার জন্য সদা প্রস্তুত থাকি। আমি জানি যে, আমি যেখানেই থাকি কোন সময়েই আল্লাহর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হই না, তাই সর্বদা আমি তাকে লজ্জা করি।

বিপদগ্রস্ত বন্ধু আমার! তদবীর কর কিন্তু তাওয়াক্কুল ভুলে যেও না অথবা আল্লাহর আগে কোন সৃষ্টির উপর তাওয়াক্কুল রেখে বসো না। নচেৎ ফল বিপরীত হবে। যেমন চাকুরীর জন্য চাকুরীস্থলে গেলে, চাকুরী পাওয়ার আশা পেলে না। সেখান থেকে উপর মহলে গেলে, সেখানেও কোন আশার আলো দেখলে না। তারপরেও গেলে মন্ত্রীর কাছে, কিন্তু সেখানেও নিরাশ হতে হল। পরিশেষে সকল দরজা বন্ধ দেখে আল্লাহর দরজার কথা মনে পড়ে নামাযের মুসাল্লায় দুআ করতে লাগলে, 'আল্লাহ গো! আমার সব দুয়ার বন্ধ হতে পারে, কিন্তু তোমার দুয়ার খোলা আছে। তুমি আমার একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দাও।'

এমন কথা বলতে তোমায় লজ্জা হওয়া উচিত। সব দুয়ারে লাথি খেয়ে পরিশেষে আল্লাহর দুয়ার চিনতে পারলে? কেন, প্রথমবারেই তাঁর দুয়ার চিনতে পারলে না? কেন তাঁর দুয়ারে প্রথমে করাঘাত করে তারপর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সৃষ্টির দুয়ারে গেলে না? এখন কি তুমি তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করতে পার? কেবল ঠেলায় বা ঠেকায় পড়ে আল্লাহর নাম নিতে চাও? তাতে কি আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশঙ্কা হয় না?

তোমার ইসলাম বলে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিম্নের দুআ পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হয়, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। দুআটি হল,

[illegible].

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই। *(আবূ দাঊদ ৪/৩২৫, তিরমিযী ৫/৪৯০)*

তোমার সংসারে শয়তান থেকে বাঁচতে পারলেও অনেক অশান্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। আর যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, শয়তান তাদেরকে ভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে, তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই। *(সূরা নাহল ৯৯ আয়াত)*

দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার মামলায় কোর্টে বিচারে জিতে যাওয়ার জন্য উকীল ধরে। তাতে কেউ হারে, আবার কেউ জিতেও যায়। তুমি তোমার সর্বপ্রকার মামলায় জিতার জন্য তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালককেই উকীলরূপে মেনে নাও, তাঁরই উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখ, তুমি সর্বদাই জিত পাবে। অনেক সময় হার মনে হলেও সেটাই তোমার জিত হবে। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উকীল। তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক। তিনি বলেন,

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। *(সূরা যুমার ৬২ আয়াত)*

অতএব নিশ্চিন্ত হও বন্ধু আমার। তোমার উকীল ও কর্মবিধায়ক তো আল্লাহ। অতএব সকল মামলায় তোমাকে হারায় কে? মসীবতে তোমাকে ধ্বংস করে কে? কোন্ শত্রু তোমার ক্ষতি করতে পারে? কে তোমাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে?

'কারো ভরসা করিস্ নে তুই এক আল্লাহর ভরসা কর।
আল্লাহ যদি সহায় থাকেন ভাবনা কিসের, কিসের ডর।।
রোগে-শোকে, দুখে-ঋণে নাই ভরসা আল্লা বিনে
মানুষের সহায় মাগিস্ (তাই) পাসনে খোদার নেক-নজর।।'

তওবা ও ইস্তিগফার সুখের একটি কারণ

অপরাধী ও পাপী মানুষ সুখী হতে পারে না। কোন কোন পাপে সাময়িক সুখ উপভোগ করা গেলেও পরক্ষণে পাপের পীড়া কামড় দেয়, ফলে মানসিক বিষাদ অনুভূত হতে থাকে পাপীর মনে। পক্ষান্তরে তওবা করলে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে জীবন নবায়িত হয়। জীবনের নতুন খাতা ও নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর তাতে মানুষ সুখী হয়। বেঁচে যায় বহু অশান্তি থেকে। বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

তওবার পর কোন কোন পাপ সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আঘাত খাওয়ার পর মানুষের চেতনা ফিরে। পাপের মাঝে মানুষ শিক্ষা পায় এবং অনেক সময় শাস্তিও পায়। ফলে পরের জীবনকে সে সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর তাতেই আছে মানুষের পরম শান্তি।

নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকলে আল্লাহর তরফ থেকে রুযী আসে। মহান আল্লাহ হযরত নূহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "(নূহ বলল,) আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন।

তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা।" *(সূরা নূহ ১০-১২)*

তিনি অন্যত্র বলেন, আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) কর, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। *(সূরা হূদ ৩ আয়াত)*

আল্লাহর নিকট তওবা, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা সাফল্যের একটি শিরোনাম। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

"তবে যে ব্যক্তি তওবাহ করে ও সৎকাজ করে সে তো অচিরে সফল কাম হবে।" *(কুঃ ২৮/৬৭)*

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

পাপ থেকে ফিরার পর তওবার পরশমণির স্পর্শে পাপরাশি পুণ্যরাশিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি এ সব (মহাপাপ) করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে (জাহান্নামে) তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করবে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। *(সূরা ফুরকান ৬৯-৭০ আয়াত)*

বান্দা তওবা করলে আল্লাহ খুশী হন। হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দাস যদি ফিরে আসে তাহলে খুশীর কথাই বটে। আল্লাহর তাতে যদিও কোন লাভ বা উপকার নেই, তবুও তিনি তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে খুশী হন। তওবার ফলে তিনি এত খুশী হন, এত খুশী হন যে, তার উদাহরণ বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, এক মুসাফির তার উট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উট গায়েব হয়ে গেল। উটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পড়ে জেগে উঠে দেখল তার উট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, 'আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!' মহানবী ﷺ বলেন, (হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) "তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উট-ওয়ালা অপেক্ষা

অধিক খুশী হন!” *(বুখারী, মুসলিম ২৭৪৭ নং,প্রমুখ)*

আল্লাহ চান যে, বান্দা তওবা করুক। আর এ জন্যই দিনে-রাতে হাত বাড়িয়ে রাখেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোমরা তওবা কর। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেও না। তিনি সমস্ত গোনাহকে মাফ করে দেবেন। এমন কি ১০০টি খুন করলেও বিশুদ্ধ তওবার ফলে তা মাফ হয়ে যাবে। তিনি বান্দার জন্য তার মায়ের থেকেও বেশী দয়াশীল।

মহানবী ﷺ-এর কোন পাপ ছিল না। তবুও তিনি প্রত্যহ ১০০ বার তওবা করতেন। উম্মতকে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বান্দা পাপ করলে তার হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর তওবা করলে সে দাগ মুছে যায়। নতুবা কালো হতে হতে হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়। আর তখন তার শান্তি থাকে না, স্বস্তি থাকে না।

মুসলিমের জন্য ওয়াজেব; যখন সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে তখন শীঘ্রতার সহিত তওবার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং এ কাজে গয়ংগচ্ছ অথবা ঢিলেমি না করা। কারণ, প্রথমতঃ সে জানে না যে, তাকে কোন ঘড়িতে মরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এক পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে। তাই সত্বর তওবা না করলে হয়তো বা পাপের বোঝা নিয়েই মরতে হয় অথবা পাপের বোঝা আরো ভারি হতে থাকে।

কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম তওবা। তওবা হল- অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি ফিরে আসার নাম।

এই তওবার রয়েছে কয়েকটি শর্ত; সে শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হয় না ঃ-

(১) তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অন্য কাউকে খোশ করার জন্য অথবা কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তওবা হলে চলবে না।

(২) সাথে সাথে পাপ বর্জন করতে হবে। পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা গ্রাহ্য নয়।

(৩) বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে। লজ্জিত না হলে উন্নাসিকতার সাথে তওবা গ্রহনীয় নয়। হযরত আলী ﷺ বলেন, ‘পাপের কাজ করে লজ্জিত হলে পাপ কমে যায়। আর পুণ্য কাজ করে গর্ববোধ করলে পুণ্য বরবাদ হয়ে যায়।’

(৪) পুনরায় মরণ পর্যন্ত তার প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। তা না হলে তওবা বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ কি?

(৫) কোন মানুষের অধিকার হরণ করে পাপ করলে সে অধিকার আদায় করে তবে তওবা করতে হবে। তা না হলে কুঁয়োতে মরা বিড়াল ফেলে রেখে পানি তুলে পানি পাক করার ব্যবস্থা নিলে কি হবে?

(৬) তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয়। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। পক্ষান্তরে তাদের জন্য তওবা নয়, যারা (আজীবন) মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।' আর যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তো তারা যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছি। *(সূরা নিসা ১৭- ১৮ আয়াত)*

পাপ-লাঞ্ছিত বন্ধু আমার! তওবা কেবল মুখে নিয়মিত দুআ পড়ার নাম নয়। তওবা হল পাপ করে ফেলার পর মনে অনুশোচনা, লাঞ্ছনা ও দ্বিতীয়বার না করার সঙ্কল্প আনার নাম। তওবা সৃষ্টি হয় মনের অনুতাপে মনের ভিতর থেকে আল্লাহর মহাশাস্তির ভয়ে। উদাহরণ স্বরূপ মায়েয বিন মালেকের তওবা। তিনি জানতেন যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যু। তবুও নিজেকে তওবার জন্য পেশ করলেন নববী দরবারে।

মায়েয বললেন, আল্লাহর রসূল! আমি পাপ করেছি। আমাকে পবিত্র করে দিন।

আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।

কিন্তু মায়েযের বিবেক মানল না; কিছু পরে অথবা পরের দিন আবার এসে বলল, আল্লাহর রসূল! আমি পাপ করেছি। আমাকে পবিত্র করে দিন।

মহানবী ﷺ বললেন, ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।

অনুরূপ তিনবার ফিরিয়ে দেওয়ার পরেও চতুর্থবারে এসে মায়েয আবার একই কথা বললেন।

মহানবী ﷺ এবারে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কোন অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেব?

মায়েয বললেন, ব্যভিচার থেকে। আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি।

মহানবী ﷺ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ও পাগল তো নয়?

সাহাবাগণ বললেন, না। ও পাগল নয়।

মহানবী ﷺ বললেন, ও মদ খায়নি তো?

সাহাবাগণ তাঁর মুখ শুঁকে দেখলেন, মদের কোন গন্ধ নেই।

মহানবী ﷺ বললেন, সম্ভবতঃ তুমি কোন মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখেছ। অথবা তাকে স্পর্শ করেছ। অথবা তাকে চুম্বন দিয়েছ।

মায়েয বললেন, না। আমি ব্যভিচার করেছি।

মহানবী ﷺ বললেন, তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ?

মায়েয বললেন, জী হ্যাঁ। আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলুন!

মহানবী ﷺ বললেন, সুর্মাকাঠি যেমন সুর্মাদানে প্রবেশ করে অথবা রশি যেমন কুঁয়োতে প্রবেশ করে সেইরূপ তুমি সঙ্গম করেছ? তুমি কি জান, ব্যভিচার কাকে বলে?

মায়েয বলল, জী হ্যাঁ। স্বামী নিজ স্ত্রীর সঙ্গে যা করে আমি তাই করে ফেলেছি।

আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে কোন প্রকারে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি বিবেকের দংশনে পাপের শাস্তি ভোগার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরিশেষে গর্ত খুঁড়ে (কোমর পর্যন্ত গেড়ে) পাথর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলা হল।

মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এমন তওবা করেছে যে, যদি তা একটি জাতির মাঝে ভাগ করে দেওয়া হত, তাহলে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হত! আর তার জন্য সে এখন জান্নাতের নদীসমূহে গোসল করছে!!

এরপর গামেদ গোত্রের এক মহিলা এসে অনুরূপ তওবা করতে চাইল; বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন।

মহানবী ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ওঃ! তুমি ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর।

মহিলাটি বলল, আপনি কি মায়েযের মত আমাকেও ফিরিয়ে দিতে চান? আল্লাহর কসম! ব্যভিচারের ফলে আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি।

মহানবী ﷺ বললেন, ঠিক আছে। (তোমার পেটের সন্তানকে তো আর মারতে পারি না।) সন্তান প্রসব করার পর তুমি এস।

যথাসময়ে সন্তান প্রসব করার পর একটি বস্ত্রখন্ডে বাচ্চাকে জড়িয়ে এনে বলল, আল্লাহর রসূল! এই যে আমি সন্তান প্রসব করে ফেলেছি। এখন আমাকে পাক করে দিন!

মহানবী ﷺ বললেন, কিন্তু তোমার বাচ্চাটাকে দুধ পান করাবে কে? যাও, দুধ ছেড়ে অন্য খাবার খেতে শিখলে তুমি এস, তোমাকে পাক করে দেব।

মহিলা জানত যে, তার শাস্তি হল মৃত্যু। সে বাঁচার ইচ্ছা করলে আত্মগোপন করতে পারত। সেই সময় তার সাথে কোন পুলিশ-পাহারা ছিল না। তবুও বিবেকের দংশনে পবিত্র হওয়ার জন্য তার মন ছট্‌ফট্‌ করছিল। পাপ বুকে নিয়ে বেঁচে থেকে শান্তি নেই মুমিনের মনে। তাই পবিত্র হওয়ার জন্য ছেলে কখন রুটি খেতে শিখবে তারই অপেক্ষা।

একদিন ছেলেটি রুটি খেতে পেরেছে। রুটির একটি টুকরা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মহানবীর দরবারে এসে উপস্থিত হয়ে মহিলা বলল, আল্লাহর রসূল! এই যে, আমার বাচ্চা দুধ ছেড়ে রুটি খেতে শিখে নিয়েছে। এখন আমাকে পবিত্রা করে দিন!

ছেলেটিকে এক আনসারীর দায়িত্বে দিয়ে মহানবী ﷺ তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। ফলে তাকে মেরে ফেলা হল।

তিনি এই তওবাকারী মহিলার জন্য বলেছিলেন, সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি মদীনার ৭০ জন লোকের মাঝে অথবা হিজায (মক্কা ও মদীনা) বাসী লোকদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় অথবা যালেম যদি অনুরূপ তওবা করে তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে!

তবুক যুদ্ধে তিনজন সাহাবী; কাব বিন মালেক, মুরারাহ বিন রাবী ও হিলাল বিন উমাইয়া অংশগ্রহণ না করে যে পাপ করেছিলেন, তার জন্য তাঁদেরকে তওবার উপর বড় কষ্ট স্বীকার

করতে হয়েছিল। মহানবী ﷺ-এর আদেশক্রমে সমাজ তাঁদের সাথে ৫০ দিন বয়কট করেছিল। এমনকি তাঁদের সাথে একটি লোকও কথা পর্যন্ত বলত না, সালাম করলে সালামের জবাবও দিত না। তাঁদের স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত তাঁদের কাছ ঘেঁসতে মানা করে দেওয়া হল!

এঁদের তওবার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি অপর তিনজনকেও ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল; শেষ পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন, যাতে তারা তওবা (প্রত্যাবর্তন) করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা তাওবাহ ১১৮ আয়াত)*

আবূ লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির একই (মতান্তরে অন্য একটি) অপরাধ করলে তিনি নিজেকে শিকল দিয়ে মসজিদের খুঁটিতে এক সপ্তাহ ধরে বেঁধে রাখলেন। নামায ও পেশাব-পায়খানার সময় তাঁর স্ত্রী অথবা কন্যা এসে শিকল খুলে দিত। তিনি বিবেকের দংশনে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি নিজে নিজে বাঁধন খুলব না, কিছু খাবও না, পানও করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ আমার তওবা কবুল করেছেন।'

পরিশেষে তিনি ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর তাঁর তওবা কবুল হয়। তা শুনেও তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজে এ বাঁধন খুলব না; যতক্ষণ না আল্লাহর রসূল ﷺ নিজে এসে আমার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। অতএব মহানবী ﷺ এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন! *(উসুদুল গা-বাহ দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, তওবা হল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উদ্ভূত অনুশোচনার নাম, যার অন্তর্দাহে মানুষ ততক্ষণ জ্বলতে থাকে, যতক্ষণ না তার প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয়েছে।

যার এমন মন ও সাধনা আছে, সে অবশ্যই সুখী মানুষ। ভুল করে যে তা স্বীকার করে, সে হল শান্তিপ্রিয় মানুষ। অন্যায় করে যে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়, সে নিশ্চয় মহৎ মানুষ।

শরয়ী ইল্‌ম অনুসন্ধান কর

এ দুনিয়ায় তালেব বহু ধরনের আছে। তালেবে মাল, তালেবে জাহ (নেতৃত্ব), তালেবে হাওয়া (কাম) প্রভৃতি। কিন্তু তালেবে ইল্‌মই হল এদের মধ্যে সুখী মানুষ।

শরয়ী ইল্‌ম মানুষের আত্মাকে প্রশান্তি দান করে। তালেবে ইল্‌মের ঈমান মজবুত হয়, আধ্যাত্মিকতায় মনোবল সুদৃঢ় হয়, ইল্‌মের পরশমণি দ্বারা দুঃখকে সুখে পরিণত করতে সক্ষম হয়। এই ইল্‌ম তার প্রত্যেক সফরের সাথী হয়। যেখানে যায়, ইল্‌ম সেখানেই সাথে যায়। ত্রিজগতে; অর্থাৎ ইহকাল, মধ্যকাল ও পরকালে ইল্‌ম দ্বারা নানা মর্যাদায় মন্ডিত হয় তালেবে ইল্‌ম। কাছে মাল ও নেতৃত্ব না থাকলেও ইল্‌ম মানুষকে সম্মানিত করে রাখে।

পক্ষান্তরে ইল্ম না থাকলে মাল ও নেতৃত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন থাকে। মাল ও নেতৃত্ব অপসৃত হলে মর্যাদাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

একদা এক সমুদ্র সফরে পানি-জাহাজে এক আলেম কোথাও যাচ্ছিলেন। জাহাজে বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল। কোন দুর্ঘটনার কারণে জাহাজ-ডুবি হলে সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার ফলে ধনবান ব্যবসায়ীরা জীবনে বাঁচলেও পথের ভিখারীতে পরিণত হল। পক্ষান্তরে আলেম যে শহরে পৌঁছলেন, সে শহরের মানুষ তাঁকে বিভিন্নরূপে সম্মান প্রদর্শন করল।

লোকেরা অসিয়ত চাইলে বললেন, 'তোমরা তোমাদের ব্যবসায় এমন পণ্যদ্রব্য গ্রহণ কর, যাতে জাহাজ-ডুবি হলেও তা ডুবে যাবে না। তোমরা ইল্ম শিক্ষা কর, যা ধ্বংস হবার নয়।'

এখান থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, জ্ঞানী লোকের বাড়িঘর সর্বত্র। পক্ষান্তরে মূর্খ লোকের কোন ঘরবাড়ি নেই।

একদা আলী ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করা হল; 'বিদ্যা এবং অর্থের মধ্যে কোন্‌টি বড়?'

উত্তরে আলী ﷺ বললেন, অর্থ থেকে বিদ্যাই বড়, কারণ ঃ-

১। বিদ্যা নবীদের সম্পত্তি, আর অর্থ ফিরআউনের সম্পত্তি।
২। বিদ্যা মানুষকে রক্ষা করে, আর মানুষ অর্থকে রক্ষা করে।
৩। বিদ্বানের বন্ধু সৃষ্টি হয়, আর অর্থশালীর সৃষ্টি হয় শত্রু।
৪। বিদ্যা বিতরণে বৃদ্ধি পায়, আর অর্থ বিতরণে হ্রাস পায়।
৫। বিদ্যান ব্যক্তি উদার হয়, আর অর্থবান ব্যক্তি কৃপণ হয়।
৬। বিদ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, আর অর্থ ক্রমশঃ হ্রাস পায়।
৭। বিদ্যা চুরির ভয় নেই, কিন্তু অর্থ চুরির আশঙ্কা আছে।
৮। বিদ্যা গণনার অপেক্ষা রাখে না, পক্ষান্তরে অর্থ হিসাব করে রাখতে হয়।
৯। বিদ্যা অন্তর আলোকিত করে, আর অর্থ অন্তরে কালিমা সৃষ্টি করে।
১০। বিদ্যা নবীদেরকে এ কথা বলিয়েছে, "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি।" অর্থাৎ, আমরা তোমারই বান্দা। আর অর্থের অহংকারে নমরূদ-ফিরআউন আল্লাহকে অস্বীকার ও খোদায়ী দাবি করেছে।
১১। ধন বিচারাধীন হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় বিচারক।
১২। ধন সঞ্চয়কারীরা জীবন থাকতেই মারা যায়, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়কারীরা মরণের পরও জীবিত থাকেন। যাঁদের দেহ তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি থেকে যায় সকলের মনে।

অনুরূপভাবে জ্ঞানের মাধ্যমে অর্থ লাভ করা যায়, কিন্তু অর্থ দিয়ে জ্ঞান কেনা যায় না।

একজন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, উলামা শ্রেষ্ঠ, নাকি ধনীদল? বললেন, উলামাই শ্রেষ্ঠ। বলা হল, তাহলে উলামাকে ধনীদের দরজায় বেশী বেশী আসতে দেখা যায়, অথচ ধনীদেরকে উলামাদের দরজায় ততটা বা মোটেই দেখা যায় না কেন? বললেন, কারণ উলামারা ধনের কদর জানেন। আর ধনীরা জ্ঞানের কদর জানে না তাই।

সবচেয়ে মূল্যবান ধন হল, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান, সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হল, মূর্খতা। আর সবচেয়ে উচ্চ কৌলিন্য হল সচ্চরিত্রতা।

এই সেই ইল্‌ম, যদ্দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের মর্যাদা সুউন্নত করে থাকেন। *(সূরা মুজাদালাহ ১১ আয়াত)*

এক আরবী কবি বলেন,

'আমি দেখেছি যে, ইলমের অধিকারী ব্যক্তি হলেন সম্ভ্রান্ত।
যদিও তাঁর পিতামাতা নীচ বংশের হন।
ইল্‌ম সর্বদা তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে।
পরিশেষে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ও তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে থাকেন।
তাঁরা তাঁর প্রত্যেক বিষয়ে অনুসরণ করে থাকেন;
যেমন মেষপাল তার রাখালের অনুসরণ করে থাকে।
তাঁর বাণী ও বক্তব্য দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়।
আর যিনি আলেম হন তিনিই ইমাম হন।
যদি ইল্‌ম না হত তাহলে আত্মা সুখী হতো না
এবং হালাল-হারাম চেনাও সম্ভবপর হতো না।
ইলমের বদৌলতেই লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি আছে,
আর মূর্খতায় আছে অপমান ও অসম্মান।
আলেম হন উন্নয়ন পথের পথপ্রদর্শক ও দিগ্‌দিশারী
এবং তিনিই হন অন্ধকার মোচনকারী প্রদীপ।
যে ইল্‌ম রসূল ﷺ হতে আগত।
তাঁর উপর আল্লাহর তরফ হতে দরূদ ও সালাম বর্ষণ হোক।

(জামিউ বায়ানিল ইল্‌মি অফাযলিহ ১/৫৪)

এই সেই শিক্ষা, যার অন্বেষণের পথে চললে বেহেশ্তের পথে চলা হয়। আল্লাহ এমন শিক্ষার্থীর জন্য বেহেশ্তের পথ আসান করে দেন। *(মুসলিম, মিশকাত ২০৪)*

এই সেই শিক্ষা, যার তালেবের জন্য ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের ডানা বিছিয়ে থাকেন। তালেবে ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা করেন।

এই সেই জ্ঞান, যার জ্ঞানীর জন্য সমগ্র বিশ্ববাসী (আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রকার বাসিন্দা) এমনকি পানির মাছ এবং গর্তের পিপড়াও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

এই সেই শিক্ষা, যার শিক্ষিত ব্যক্তি আবেদ (অধিক নফল ইবাদতকারী) ব্যক্তি অপেক্ষা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ; যেরূপ রাত্রের আকাশে সমগ্র তারকামন্ডলী অপেক্ষা পূর্ণিমার চন্দ্র শ্রেষ্ঠ। বরং একজন সাধারণ সাহাবীর তুলনায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মান যেমন উচ্চে ঠিক তেমনিই আবেদের তুলনায় একজন আলেমের মান অনুরূপ উচ্চে। কারণ, আলেমরা হলেন আম্বিয়ার ওয়ারেস। সেই ইলমের ওয়ারেস যাতে রয়েছে জাতির জীবন। *(আবু দাউদ ৩৬৪১, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২২৩, দারেমী, মিশকাত ২১২-২১৩ নং)*

এই সেই বাঞ্ছিত ইল্‌ম, যা কেউ সংরক্ষণ ও প্রচার করলে তার মুখ উজ্জ্বল ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৩০ নং)*

এই সেই নির্দেশমালা, যা না হলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিভ্রান্তির ঘন অন্ধকারে শান্তির পথ খুঁজে পায় না। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৬ নং)*

এই সেই শিক্ষা, যে শিক্ষা যার পেটে আছে সে অভিশপ্ত নয়; আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে দূরে নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্‌র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

এমন ইল্‌ম যার পেটে নেই সে হতভাগা বৈ কি?

মানুষের জন্য প্রথম ফরয ঃ জ্ঞান। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আদেশ ঃ পড়। যত বড়ই আবেদ হোক, ইল্‌ম না হলে ইবাদত শুদ্ধ হয় না; বরং অনেকাংশে বিদআত হয়।

জ্ঞানেই আনন্দ, জ্ঞান নির্জনতার সাথী, জীবনের বন্ধু।

জ্ঞান যার নেই, তার শক্তি ও সাহস বলতে কিছুই নেই। যে দেশ শিক্ষিতের দেশ, সে দেশ বড় শক্তিশালী। যে দেশের লোক শিক্ষিত সবাই, সে দেশ বিজয়ী হয়, পরাভূত হয় না।

জ্ঞান অন্তরের প্রাণ-সদৃশ। কেননা, তা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে দূরে রাখে। জ্ঞান চোখের আলো স্বরূপ। জ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকারে আলো পাওয়া যায়। সূর্যের আলোকে যেমন পৃথিবীর সকল কিছুই আলোকিত হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞানের আলোকে জীবনের যাবতীয় অন্ধকার দিক আলোকোদ্ভাসিত হয়ে যায়।

ইল্‌মের (জ্ঞানের) মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে প্রকৃত আলেম নয়, সে তা দাবী করে এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞানী বললে সে খোশ হয়। আর মূর্খতার নিন্দা প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মূর্খ হয়েও কেউ নিজেকে মূর্খ মনে করতে চায় না এবং কাউকে মূর্খ বললে, সে রাগান্বিত হয়। *(হযরত আলী)*

ফিরিশ্তার জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তি নেই। জন্তুর জ্ঞান নেই, প্রবৃত্তি আছে। মানুষের জ্ঞান আছে, প্রবৃত্তিও আছে। সুতরাং যার প্রবৃত্তি সংযত ও জ্ঞান আলোকিত, সে ফিরিশ্তার ন্যায়। পক্ষান্তরে যার জ্ঞান পরাভূত এবং প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল, সে পশুর ন্যায়।

মানুষের ইল্‌ম বাড়লে তাকওয়া বাড়ে, কামনা-বাসনা কমে যায়; 'ইল্‌ম যত বাড়ে, বাসনা ততই ছাড়ে। চাই নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ। যে তাজ বিষয় আনে মুহূর্তে বিনাশ।'

কিন্তু যে আলেমের আমল নেই, তার ইল্‌মে সুখ নেই।

শেখ সা'দী বলেন, শিক্ষা করেও যে তার অপপ্রয়োগ করল, সে যেন সুখের সামগ্রী জমা করে অগ্নিদাহ করল। বেআমল আলেম, যেমন বিনা মধুর মৌচাক। যে ইল্‌ম শিখল অথচ তদনুযায়ী আমল করল না, সে সেই চাষীর মত, যে জমিতে চাষ দিল এবং তাতে কোন কিছু রোপন করল না। সে এক অন্ধের মত; যে হাতে প্রদীপ নিয়ে পথ চলে। সে সেই শিকারীর মত; যে শিকার করে, কিন্তু কাবাব খায় অপরে।

আমলহীন আলেম তীরবিহীন তীরন্দাজের মত। এমন আলেম ফুল-ফলহীন বৃক্ষের মত। সেই ধনাগারের মত; যেখান থেকে খরচ করা হয় না।

বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু। আলেমের আমল থাকলে ইল্‌ম থাকে, আমল না থাকলে ইল্‌ম বিদায় নেয়। কারণ, আমল হল ইল্‌মের সারবস্তু। আমলহীন দুনিয়াদার লোভী আলেম ইসলামের যতটা ক্ষতি করে, ততটা ক্ষতি ইবলীসেও হয়তো করে না।

অতএব জ্ঞানী ও শিক্ষিত বন্ধু আমার! তোমার জ্ঞান ও শিক্ষা যদি তোমাকে অসঙ্গত কর্মে বাধা দেয়, তাহলে তুমি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষ। তোমার কর্তব্য যদি তুমি বোঝ, তাহলে তুমি একজন জ্ঞানী মানুষ। আর সেই কর্তব্য যদি পালন কর, তাহলে তুমি আরো বড় জ্ঞানী। তুমি যদি তোমার বর্তমানকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হও এবং পরিস্থিতি অনুসারে চলতে পার, তাহলে তুমি জ্ঞানী মানুষ।

যার কাছে শরয়ী ইল্ম নেই, তার জীবন ষোল আনাই বৃথা। ইল্ম না থাকলে আল্লাহকে জানতে পারবে না, সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করতে সক্ষম হবে না এবং প্রত্যেক অধিকারীর সঠিক অধিকার আদায় করতে পারবে না।

শরয়ী জ্ঞানের আলেম অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে (কোন কোন দেশে) সরকারী চাকরী না পেলেও কবর, কিয়ামত ও দোযখের মহাসমুদ্রে তুফানের সময় সাঁতার কেটে নাজাত পাওয়ার বিদ্যা তাঁর থাকে। আর এ হল মহাসাফল্য। তিনি ও তাঁর মত শিক্ষিত লোকের জন্য কবরের তিনটি প্রশ্নের উত্তর সহজ হয়ে যাবে। অতএব তাঁদের জীবনের ষোল আনাই সফল। কিন্তু এ বিদ্যায় অশিক্ষিত লোকেরা যখন উত্তর দিতে অক্ষম হবে তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পড়ও নি, জানও নি!

একদা এক শিক্ষিত ভদ্রলোক নদীপথে এক মাঝির নৌকায় চড়ে যাত্রা করছিল। কথায় কথায় সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, মাঝি বীজগণিতের সূত্র জান? বলল, না। বলল, তাহলে তোমার জীবনের চার আনাই মিছে। ভূগোল জান? বলল, না। বলল, তাহলে তোমার জীবনের ৮ আনাই মিছে। জ্যামিতি জান? বলল, আজ্ঞে না। বলল, তাহলে তোমার জীবনের ১২ আনাই মিছে। এমন সময় আকাশে মেঘ দেখা দিল, ঝড় এল। নৌকা ডুবুডবু। শিক্ষিত লোকটি বলল, মাঝি এবারে কি হবে? বলল, নৌকা ডুবে যাবে। আপনি সাঁতার জানেন তো? বলল, না। বলল, তাহলে আজ্ঞে, আপনার জীবনের ষোল আনাই মিছে।

হযরত আলী ﷺ হযরত হাসানকে লক্ষ্য করে বলেন, সবচেয়ে বড় ধন হল জ্ঞান, সবচেয়ে নিম্ন মানের দীনতা হল মূর্খতা এবং সবচেয়ে বড় বংশ হল সুন্দর চরিত্র।

পক্ষান্তরে মূর্খতা একটি অভিশাপ। মূর্খতা এমন জিনিস যে, তা আত্মীয়তা, প্রতিবেশ ও বন্ধুত্ব কিছুরই খাতির করে না। মূর্খের সাথে বাস করার মানেই হল আগুনের সাথে বাস করা।

মূর্খতা হল মনের রাত্রি। সেই রাত যেখানে আছে, সেখানে না আছে চাঁদ, না আছে তারা। মূর্খ মানে অন্ধ। আর অন্ধের নিকট তো সব রঙই সমান। (কানার রাত-দিন সমান।) হুর ও ভূত সমান। তার কাছে আদর্শ-অনাদর্শ সবই সমান। মূর্খের ধন থাকতে পারে, কিন্তু মনে শান্তি থাকতে পারে না।

প্রিয় বন্ধু আমার! আলেম না হয়ে যদি আলেম সাজতে চাও, অজ্ঞ হয়ে যদি তুমি নিজেকে বিজ্ঞ মনে কর, তাহলে তুমি বড় মূর্খ। আলেম না হয়ে যদি আলেমের কান কাটতে চাও, তাহলে তুমি আরো বড় মূর্খ। আর আলেমের সাথে মুখের তর্কে জিতে গেলেই বা তোমার কদর কিসের? পাথর যদি সোনার বাটি ভেঙ্গেই ফেলে, তাহলে তাতে সোনার কদর কমে যায় না এবং পাথরেরও কোন মূল্য বৃদ্ধি পায় না।

চিরতরে জ্ঞানীজন সুখীজন। আর মনের সুখ হল সবচেয়ে বড় সুখ।

সুখের পরিবেশ তৈরী কর

সুখ পাওয়ার জন্য সুখের পরিবেশ তৈরী করা জরুরী। সে পরিবেশ না হলে বহু সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয় মানুষকে। দুনিয়ার বুকে সুখ অর্জন করার জন্য তৈরী করার মত পরিবেশ হয় স্ত্রী-সন্তান, পিতামাতা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে। তাদের সাথে সুখের সম্পর্ক বজায় থাকলে তোমার সুখ আছে। নচেৎ না।

স্ত্রী-সুখ

নিয়তি মানুষকে যা দান করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দান তার (পুণ্যময়ী) স্ত্রী। সুখের যন্ত্র হল একজন মনের মত স্ত্রী। কথায় বলে, 'নারী সুখে নিদ্রা যাই, চিত্ত সুখে গান গাই।'

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও স্নেহ সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। *(কুরআন ৩০/২১)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।" *(মুসলিম ১৪৬৭ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিসঃ ২৮২নং)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সদিচ্ছাময়ী সতী সহধর্মিনী পুরুষের জন্য একটি রত্নভান্ডার। সর্বাপেক্ষা উত্তম গৃহ সেইটি, যে গৃহে সাধ্বী রমণী বাস করে। যে পুরুষের ঘরে সুচরিতা ও প্রিয়বাদিনী স্ত্রী নেই, তার বনও যা ঘরও তাই।

পার্থিব জীবন একটি সফরের নাম। সে সফর কয় দিনের তা কারো জানা নেই। সফরের পথ বড় বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ, পিচ্ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর। সে পথে প্রয়োজন একজন সহায়ক সঙ্গীর। যে পথ চলতে সাহায্য করবে, কষ্টে সান্ত্বনা ও সাহস দেবে, সঙ্গে ছায়ার মত থেকে মনের আতঙ্ক দূর করবে। বলা বাহুল্য, জীবন সফরের উত্তম সঙ্গী হল পতিব্রতা স্ত্রী। যে স্ত্রীর কাম্য হল স্বামীর মনস্তুষ্টি।

কেমন সেই কাল্পনিক বেগম? কি কি গুণাবলী তার?

পতিব্রতা স্ত্রীর গুণাবলী হল ঃ-

(১) স্বামীর মূল্যায়ন কারিণী ঃ এ কথা জানা যে, স্বামীর মর্যাদা তার থেকে বড়। এ মর্যাদা দিয়েছেন খোদ সৃষ্টিকর্তা নিজে। তিনি বলেন, "পুরুষ হল নারীর কর্তা।" *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)* "তাদের উপরে পুরুষের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।" *(সূরা বাক্বারাহ ২২৮ আয়াত)*

(২) ধৈর্যশীলা ঃ স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ি যেমনই হোক সব কিছুর ব্যাপারে ধৈর্য ধরে পুণ্যময়ী স্ত্রী। স্বামীর আপদে-বিপদে, রোগে-দুখে-শোকে ও অভাবে ধৈর্য ধারণ করে সে।

(৩) কৃতজ্ঞ ঃ সদিচ্ছাময়ী স্ত্রী আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে। কৃতজ্ঞতা করে স্বামীর। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, বাযযার, হাকেম ২/১৯০, বাইহাকী ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

সামান্য ত্রুটি দেখে সমস্ত উপকার, উপহার ও প্রীতি-ভালোবাসাকে ভুলে যাওয়া নারীর সহজাত প্রকৃতি। কিছু শিক্ষা বা শাসনের কথা বললে মনে করে, স্বামী তাকে কোনদিন ভালোবাসে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসিনী হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৯নং)*

(৪) বিনয়াবনতা; যার মাঝে অহংকার নেই। সলজ্জা; যে প্রগল্‌ভ নয়। যে সুরমার চোখের সুর্মা অপেক্ষা চরিত্রে লজ্জা-শরমের চমক অধিক।

(৫) ভুল স্বীকারকারিণী ঃ প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭ নং)*

পক্ষান্তরে যে স্ত্রীকে রাজি করার জন্য স্বামীকে রাত জাগতে হয় অথবা তাকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে ও ছোট সাজতে হয় সে স্ত্রী যে গুণবতী নয়, তা বলাই বাহুল্য।

(৬) সুহাসিনী, সুবাসিনী, সুশোভিতা, সুনয়না ঃ মহানবী ﷺ বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয়। সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(ঐ ১০৪৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "শ্রেষ্ঠা রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃক্‌পাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(ঐ ১৮৩৮নং)*

দাঊদ ﷺ বলেন, খারাপ মেয়ে তার স্বামীর পক্ষে বৃদ্ধ মানুষের ঘাড়ে ভারী বোঝের মত। আর ভালো মেয়ে হল সোনার মুকুটের মত; তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অবশ্যই সতী নারী পর পুরুষের দিকে নজর তুলে দেখে না। চোখ হল মনের আয়না।

চোখেই নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। নারীকে অন্য কিছু দেখে চেনা যায় না। এরা সর্বদা স্ব স্ব চোখের পিছনে লুকিয়ে থাকে। তাছাড়া সমুদ্রের গভীরতার চেয়ে নারীর মনের গভীরতা অনেক বেশী। তার অতলস্পর্শী গভীরতার নাগাল পেতে পুরুষকে বহু নাকানি-চুবানি খেতে হয়। আর মনের উপর কারো হাত নেই, কারো মনের উপর জোর খাটানোর চেষ্টা বৃথা।

(৭) সুভাষিণী, ধীরা, যার ঠান্ডা মেজাজ আছে, যে ঠান্ডা কথা বলে, যার বাড়ির ভিতরের আওয়াজ বাইরে যায় না। পক্ষান্তরে যে ঘরে মোরগের চেয়ে মুরগীর রব উচ্চতর, সে ঘর বড় দুঃখের ঘর।

(৮) স্বামীর অবর্তমানেও বিশ্বস্ত, স্বামীর ধন-মাল ও তার নিজের দেহ ও ইজ্জতের হিফাযতকারিণী। মহান আল্লাহ বলেন, "সুতরাং সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।" *(কুরআন ৪/৩৪)*

নারীর নারীত্বের প্রধান সম্পদ হল তার দেহের নিভৃতে রক্ষিত মূল্যবান মোহর; যা সাপের মাথার মণির চেয়েও দামী। সাপ মণি-হারা হলে গাছের সাথে মাথা কুটে অঘোরে প্রাণ হারায়। পক্ষান্তরে ঝিনুক জীবন দেয়, তবু বুকের মুক্তোটি কাউকে নিতে দেয় না। *(সাগর সেচা মানিক ২১১ পৃঃ)*

(৯) আদেশ পালনকারিণী, অনুগতা, যে স্বামীর মনের ও যৌবনের চাহিদা মিটাতে গড়িমসি অথবা বাহানা করে না।

(১০) শোকে-দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী ঃ দুঃখের কথা যাদের কাছে বলে শান্তি ও সান্ত্বনা পাওয়া যায় এবং দুঃখের ভার হাল্কা হয়, তারা হল সুহৃদ বন্ধু, গুণবান ভৃত্য, অনুকূল স্ত্রী এবং মনের মত স্বামী।

(১১) পুণ্যময়ী, আল্লাহর আনুগত্যে স্বামীর সহায়িকা ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ হৃদয়, (আল্লাহর) যিক্‌রকারী জিহবা এবং আখেরাতের কাজে সহায়িকা মুমিন স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ১৮৫৬নং)*

"আল্লাহ সেই স্বামীর প্রতি দয়া বর্ষণ করেন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকে জাগায়, আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। আল্লাহ সেই স্ত্রীর প্রতিও দয়া বর্ষণ করেন, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকে জাগায়, আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা মারে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে ৩৪৯৪নং)*

এক বেনামাযী স্বীকার করে যে, বিবাহের পর তার স্ত্রী যখন বিছানার পাশে তাহাজ্জুদ পড়ে তার হেদায়াতের জন্য দুআ করত, তখন তা শুনে তার মনের গভীরে দ্বীনের আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং সেও ফরয সহ তাহাজ্জুদের নামায পড়তে তওফীক লাভ করে। আর সেই সাথে তাদের দাম্পত্যে অনাবিল সুখের জোয়ার আসে।

এক নামাযী বন্ধু স্বীকার করেন যে, আযান হলে তাঁর স্ত্রী আর তাঁকে ঘরে বসতে দেয় না; মসজিদে যেতে তাকীদ ও বাধ্য করে!

অনেকের স্ত্রী স্বামীকে লিখতে ও পড়তে বারবার তাকীদ করে। ব্যবসায় গেলে অসিয়ত করে বলে, "আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন। কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু (হারাম খেয়ে) জাহান্নামে ধৈর্য ধরতে পারব না!"

একজন ডাক্তার সাহেব স্বীকার করেন যে, তাঁর দাড়ি রাখার ব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে বড় অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। পক্ষান্তরে আর এক যুবক স্বীকার করে যে, বিবাহের পর তার স্ত্রী তাকে দাড়ি চাঁছতে বাধ্য করেছে!

অধিকাংশ পুরুষের জীবনে বৃহৎ উন্নতি অথবা অবনতির পিছনে বৈধ অথবা অবৈধভাবে একজন নারীর হাত থাকে। সেই নারী পুরুষকে সমৃদ্ধ করে অথবা তার প্রতিভা বিলীন ও মলিন করে ফেলে। সুখের সামগ্রী আনয়ন করে নতুবা দুঃখের বন্যা বয়ে আনে। আসলে নারী হল অস্ত্রের মত; সে স্বামীর উপকার করে আবার অপকারও।

পুরুষের পক্ষে নারীই হল সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর। অধিকাংশ ফিতনার মূল কারণ হল নারীঘটিত অথবা নারী সম্পর্কিত। পুরুষের তুলনায় নারীর জ্ঞান অর্ধেক। কিন্তু ক্ষতি সাধনের ব্যাপারে নারীর বুদ্ধি পুরুষের চাইতে ডবল। আর মানুষের জানা মতে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো জলশক্তি হল নারীর চোখের অশ্রু। অশ্রু হল নারীর অস্ত্র।

কিন্তু যে নারী পুরুষের প্রতিভাকে প্রতিভাত করতে সহায়িকা হয়, সময়ে-অসময়ে স্বামীর মনে আনন্দের জোয়ার আনে, স্বামীর সম্পদে বর্কতের কারণ হয়, সুখে-দুঃখে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করে, স্বামী-সুখে বনবাসকেও স্বর্গবাস মনে করে, স্বামীর সেবা যার জীবনের ব্রত হয়, স্বামী যে বেহেশ্তের প্রবেশ-দ্বার সে কথার খেয়াল রেখে স্বামীর মনস্তুষ্টিকে নিজের মনের উপর প্রাধান্য দেয়, সে নারী প্রকৃত পতিব্রতা নারী। 'পতিসুখে থাকে মতি, তবেই তাকে বলি সতী।' এমন স্ত্রী সত্যপক্ষে স্বামীর জন্য একটি বেহেশ্তী নিয়ামত।

কোন এমন প্রতিষ্ঠিত সফল ব্যক্তি নেই, যার সফলতায় তার কোন সুহৃদ বন্ধু বা প্রেমময়ী স্ত্রী অথবা হিতাকাংখী মানুষ তার সহযোগিতা করেনি। আমাদের প্রত্যেকেই তার জীবনে কোন না কোন মানুষের কাছে ঋণী; চাহে সে পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত, কাছের হোক অথবা দূরের, তার স্বার্থ থাক অথবা না থাক। তারা মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে থাকে, যখন সে মাটিতে পড়ে যায়। আলোর বাতি তুলে ধরে, যখন সে অন্ধকারে পথ হাতরায়। মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দেয়, যখন দুনিয়া তাকে মস্ত বড় হাতুড়ি নিয়ে মাথায় আঘাত করতে থাকে। তারা তাকে সহানুভূতির মিষ্টি হাসি দেখায়, যখন দুনিয়া তাকে ক্রোধের দাঁত দেখায়।

শুধু স্ত্রীর কথাই নয় তোমাকেও ভালো হতে হবে স্ত্রীর কাছে। স্ত্রীকে পতিব্রতা করে গড়ে তোলার জন্য তোমারও কিছু ভূমিকা ও কর্তব্য অবশ্যই আছে। যে স্ত্রীর কাছে ভাল সে সবার চেয়ে ভাল। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি নিজ স্ত্রীর নিকট তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি।" *(তাঃ, হাঃ, দাঃ, আযিঃ ২৬৯পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, "সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"

এ তো গেল আদর্শ স্ত্রীর কথা। এমন স্ত্রী যার আছে সে সত্যই সুখী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন

আদর্শ স্ত্রী যদি না পাওয়া যায় তাহলে সুখ কোথায়?

উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'নারী তিন প্রকার; প্রথম প্রকার নারী; যারা হয় সরলমতী, সতী এবং আত্মসমর্পণকারিণী, অর্থের ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করে, স্বামীর অর্থের অপচয় ঘটতে দেয় না। দ্বিতীয় প্রকার নারী সন্তানের আধার। আর তৃতীয় প্রকার নারী হল সংকীর্ণ বেড়ি; আল্লাহ যে বান্দার জন্য ইচ্ছা তার গর্দানে তা লটকিয়ে দেন।' *(আল ইক্দুল ফারীদ ৬/ ১১২)*

এখন তোমার স্ত্রী যদি ঐ তৃতীয় প্রকারটি হয়, তাহলে কি করবে? তাহলে সুখ ও শান্তির জন্য তোমাকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, কৌশল অবলম্বন করতে হবে, ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মেনে ও মানিয়ে চলতে হবে। নচেৎ তুমি সুখের নামে হাত ধুয়ে ফেল।

মহান আল্লাহ বলেন, "আর তাদের সহিত সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না বাসে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্খী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্ট। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮-নং)*

অতএব যদি নারীর দ্বারা লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বক্র অবস্থাতেই তুমি ওর দ্বারা লাভবান হও। আর যদি সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও, তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে; অর্থাৎ তাকে তালাক দিতে হবে।

নব-পরিণীত বন্ধু আমার! মেয়েদের মধ্যে অনেক সুন্দরী মেয়ে লোক পাওয়া যায়, কিন্তু নির্ভুল মেয়ে মানুষ পাওয়া কঠিন।

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন যে, "মনুষ্য-সমাজ হল শত উঁটের মত; যার মধ্যে একটা ভালো সওয়ার-যোগ্য উঁট খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২৩৩২ নং)*

স্ত্রী তোমার বিপদস্বরূপ হলেও উপায় কি বল? তার চেয়ে বড় বিপদ হল এই যে, তাকে না নিয়ে তোমার চলবেই না। নারী পুরুষ ব্যতীত এবং পুরুষ নারী ব্যতীত অসম্পূর্ণ।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! আত্মসমালোচনা করে দেখ, হয়তো বা দাম্পত্য জীবনের ঐ দুঃখ-জ্বালার জন্য তোমার স্ত্রী নয়, বরং তুমিই দায়ী। জেনে রেখো যে, দাম্পত্য সুখের রহস্য আছে তোমার ধনে এবং যৌবনে। অতএব তোমার ধন-যৌবন যথেষ্ট না থাকলে দুঃখের জন্য স্ত্রীকে দায়ী করো না।

তোমার কর্কশ বাক্য, রূঢ় ব্যবহার, অবহেলা, অপরিচ্ছন্নতা, অহংকার, নিষ্ঠুরতা, রোমান্সী স্ত্রীর ক্ষেত্রে রোমান্সহীনতা প্রভৃতি তোমার স্ত্রীর রূপ-যৌবনকে নষ্ট করে দিতে পারে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করি, যেমন সে আমার জন্য

সাজসজ্জা করে।' আর আল্লাহ তাআলা বলেন, "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের--।" *(কুরআন ২/২২৮)*

যে স্ত্রী তার স্বামীর মূল্যায়ন করে না এবং যে স্বামী তার স্ত্রীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, সে দাম্পত্যে সুখ-শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

পক্ষান্তরে যে স্ত্রীর মাঝে প্রেম নেই, জ্ঞান নেই, গুণ নেই সে যতই পরমা সুন্দরী হোক, উচ্চ বংশীয়া হোক অথবা ধনবতী হোক, তাকে নিয়ে সুখ নেই বন্ধু। প্রকৃত সুখ রূপে নয়, প্রকৃত সুখ আছে দ্বীনে ও গুণে। ইসলামের নীতি অনুসারে তুমি যদি স্ত্রী গ্রহণ করে থাক, বিবাহের সময় কপালের চোখ দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য না দেখে, মনের চোখ দিয়ে অন্তরের সৌন্দর্য দেখে থাক, তাহলে সুখের আশা করো। নচেৎ তোমার ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই।

যে ভাগ্যে এসে গেছে, সেটাই তোমার ভাগ এবং যেটা তোমার ভাগে এসেছে, সেটাই তোমার ভাগ্য। কি করতে পার? গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তো করতে পার না? মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করা তো সহজ নয় বন্ধু!

রূপ-সৌন্দর্য মনকে মুগ্ধ করতে পারে, মানসিক সুখ দিতে পারে না। তার জন্য চারিত্রিক গুণের দরকার। সুদর্শনা নারী রত্ন বিশেষ ঠিকই, কিন্তু সুচরিতা নারী একটি রত্নভান্ডার।

যে নারী গর্বিতা, সে নারীকে নিয়ে পুরুষের কোন সুখ নেই। আর যে জিনিস নারীকে গর্বিত করে, তা হল নারীর রূপ। উপরন্তু ফুলের সৌরভ আর রূপের গৌরব থাকে না বেশী দিন। মালার ফুল বাসি হলেই তার মর্যাদা কমে যায়। তবে অকারণে গর্ব কিসের ও কয় দিনের?

দাম্পত্য জীবন বড় সূক্ষ্ম, বড় আদর্শভিত্তিক। দাম্পত্য সংসার বড় স্পর্শকাতর। এ প্রেমের মহল দেখতে মহল হলেও, তা আসলে ঠুনকো কাঁচের গড়া। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আর প্রেমের যে হৃদয় একবার ভেঙ্গে যায় তা আর জোড়া লাগে না। ঠুনকো কাঁচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত হয়ে যায়। মানুষের ভগ্ন হৃদয়েরও এই অবস্থা। বিক্ষত মানুষের হৃদয়কে সারিয়ে তোলা বড় কঠিন। আর তখন জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

আর পরিবর্তন করার কথা ভাবছ? কিন্তু পরিবর্তন করে কি সুখের নিশ্চয়তা আছে বন্ধু? নতুন স্ত্রীই যে তোমার মনের মত হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? একাধিক বিবাহ করা সুন্নত হলেও তার শর্ত আছে। আর সেই শর্ত পালন করে তোমার সংসার যে সুখের হবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়?

পরিশেষে মহান আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত; তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (দ্বীনী বিষয়ে অন্যায় থেকে তওবা করলে ও পার্থিব বিষয়ক অন্যায়ে) তোমরা যদি ওদেরকে মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ওদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

সন্তান-সুখ

এ সংসারে সুখ-সামগ্রীর অন্যতম জিনিস হল সুসন্তান। সন্তানহীন দম্পতির মনে সুখ নেই। আবার অনেক কুসন্তানের মাতা-পিতার মনেও সুখ নেই। যেমন অনেক ১ বা ২টি সন্তানের সংসারও সুখী সংসার নয়। পক্ষান্তরে অনেক বহু সন্তানের মা-বাপ পরম সুখী। আসলে সন্তান-সুখ বা যাই বল না কেন, এ সব ভাগ্যের ভোগ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সেই উপভোগ করতে দেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। অবশ্য সে ভোগ অনুসন্ধান করতে বাধা নেই কারো।

'নির্ধারিত কাল পূর্বে হয় না মরণ,
ঔষধের ত্রুটি কেহ করে কি কখন?'

অপত্যহীন বন্ধু আমার! সন্তান না হলে আল্লাহর কাছে চাও, চিকিৎসা কর। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেও না। জেনে রেখো, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَـٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা, তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। *(কুরআন ৪২/৪৯-৫০)*

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। এতে ওদের কোন হাত নেই। আল্লাহ মহান এবং ওরা যাকে তাঁর অংশী করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। *(কুরআন ২৮/৬৮)*

অতএব কারো প্রতি খাপ্পা না হয়ে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি আশা ও ভরসা না রেখে প্রতীক্ষা কর। যাকারিয়া নবীর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হয়েছে, অনুরূপ হয়েছে ইবরাহীম নবীর। আলাইহিমুস সালাম।

তোমার সন্তান হয়নি, হয়তো সন্তান তোমার জন্য কল্যাণকর নয়। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ ﴾

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। *(সূরা তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

সন্তান না হলে ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট হও। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তাতে তোমার কোন মঙ্গল আছে।

তাছাড়া সন্তান যে তোমার সুখের কারণ হবে, তা হওয়া জরুরী নয়। নূহ নবীর সন্তান য়াম

তাঁর সুখের ছিল না। অনুরূপ কত লোকের সন্তান তাদের জন্য বিষফোঁড়া স্বরূপ।

আর পরপর মেয়ে হয়েছে বলেও দুঃখের কিছু নয় বন্ধু। হয়তো বা তাতেই তোমার পরীক্ষা ও মঙ্গল আছে। জাহেলী সমাজে কন্যা সন্তান অনাদৃতা হলেও তাতে তোমার বড় সওয়াব রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" *(আহমদ ৩/ ১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

মা আয়েশা [illegible] প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ করে তার দু'টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।" *(বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)*

সন্তানসুখী বন্ধু আমার! সন্তান নিয়ে সুখ চাইলে সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর আদেশক্রমে সন্তান-সন্ততিকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম-হৃদয় কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।" *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

সন্তান আজকের শিশু, কালকের পিতা, ভবিষ্যতের নাগরিক। জাতির ভাবী আশা।

'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের অন্তরে।'

সন্তান পিতা-মাতার ঘাড়ে আমানত স্বরূপ। আর মহান আল্লাহ আমানতকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে আদেশ করেছেন। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)* এবং তাতে খেয়ানত করতে নিষেধ করেছেন। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)* তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর সন্তানের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে।

মানুষ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জারী থাকে নেক সন্তানের দুআ। নেক সন্তান তৈরী করতে পারলে সুখ আছে পিতার ইহকালে এবং পরকালে।

যদি সুসন্তান পাওয়ার আশা কর, তাহলে নিম্নের উপদেশ ও নির্দেশাবলী পালন কর ঃ-

১। দ্বীনদার গুণবতী স্ত্রী নির্বাচন করে বিবাহ কর। নচেৎ নিম গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করো না। মহিলার রূপ, ধন ও বংশ না হলেও দ্বীনদার গ্রহণ কর। যেহেতু -

মায়ের হাতে গড়বে মানুষ, মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জগতে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

২। মিলনের সময় দুআ পড়। দুআ পাঠ করে সহবাস করলে উক্ত সহবাসের ফলে সৃষ্টি সন্তানের কোন ক্ষতি শয়তান করতে পারে না। *(বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৩। আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চেয়ে দুআ কর। *(সহীহ দুআ ও যিক্র দ্রষ্টব্য)*

৪। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার কানে আযান দাও।

৫। ছেলে হোক অথবা মেয়ে ভূমিষ্ট হলে তাতে খোশ হও। যেহেতু সবই তো আল্লাহর দান। কন্যা ঠিকমত মানুষ করলে সে তোমার দোযখের পর্দা হবে। আর কন্যা বলে অপছন্দ করো না। কারণ হতে পারে তাতেই তোমার সার্বিক কল্যাণ আছে। আল্লাহ জানেন, তুমি জান না। যেহেতু বেটা না হয়ে ল্যাঠা বা ব্যথাও তো হতে পারে?

আর খবরদার কোন ভয়ে তাদেরকে হত্যা করো না। কেননা বিশেষ করে খেতে দেওয়ার ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। *(সূরা ইসরা ৩১ আয়াত)*

৬। সন্তানের জন্য কথায় কথায়; খুশী অথবা রাগের সময় হেদায়াতের দুআ কর। আর কোন সময়ই বদ্দুআ করো না। কারণ সন্তানের হকে মা-বাপের দুআ কবুল হয়। আর তাতে তোমার নিজেরই ক্ষতি।

৭। সন্তানের সুন্দর দেখে নাম রাখ। অসুন্দর নাম রেখে ছেলে-মেয়েকে লজ্জা দিও না।

৮। যথাসময়ে ছেলের তরফ থেকে ২টি ও মেয়ের তরফ থেকে ১টি আকীকা কর।

৯। যথাসময়ে ছেলের খতনা করাও।

১০। উর্ধ্বপক্ষে পূর্ণ ২ বছর তাকে মায়ের দুধ পান করাও।

১১। সর্বপ্রথম তাকে কালেমা শিখিয়ে দাও এবং ঈমানী বীজ বপন কর তার হৃদয়-মনে।

১২। সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাযের আদেশ কর। দশ বছরে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং ছেলে-মেয়ের বিছানা পৃথক করে দাও।

১৩। সুন্দর চরিত্র শিক্ষা দাও। শিশুর প্রকৃতি বড় স্বচ্ছ। অতএব সে তোমাদের পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী গড়ে উঠবে সে খেয়াল রেখো।

১৪। সকল প্রকার অসচ্চরিত্রতা থেকে দূরে রেখো।

১৫। ছেলেদের সামনে মার্জিত কথাবার্তা বলো। কারণ, তারা তো তোমাদের ভাষা শুনেই কথা বলতে শিখবে। নোংরা কথা বলবে না। তাদের সামনে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াও করবে না খারাপ কথা বলে। তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলো না।

১৬। সন্তানের জন্য নিজে নমুনা হও। আর জেনে রেখো, দুধ গুণে ঘি, মা গুণে ঝি। আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি। যেই মত কোদাল হবে সেই মত চাপ, সেই মত বেটা হবে যেই মত বাপ। সাধারণতঃ এরূপই হয়ে থাকে।

১৭। ছেলেদের সামনে স্ববিরোধিতা থেকে দূরে থাক। তুমি যেটা কর তা করতে সন্তানকে নিষেধ করলে ফলপ্রসূ হবে না।

১৮। তাদের সাথে ওয়াদা করলে ওয়াদা পূরণ কর। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

১৯। ঘর থেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা দূর কর। অশ্লীল ছবি, ভিডিও, টিভি ইত্যাদি ঘরে রেখো না। বাইরেও দেখতে দিও না। নচেৎ, তাতে তাদের পড়াশোনা যাবে, চরিত্রও যাবে।

২০। পারলে শ্লীলতাপূর্ণ ক্যাসেট এনে রাখতে পার। গান-বাজনা ও অশ্লীলতা-বর্জিত ক্যাসেট হল বর্তমানে মুসলিমদের বিকল্প বস্তু।

২১। যৌন-চেতনার সাথে সাথে যৌন অপরাধ থেকে দূরে রাখার শতভাবে চেষ্টা কর। খেয়াল রাখ, যাতে তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার না হয়ে বসে।

২২। তাদেরকে মেহনতী ও কর্মঠ হতে অভ্যাসী বানাও। সকল প্রকার বিলাসিতা থেকে দূরে রাখ।

২৩। তাদের বয়স অনুযায়ী ব্যবহার পরিবর্তন কর। ছেলে বড় হলে ভায়ের সাথে যেমন ব্যবহার কর, তেমনি তার সাথেও কর।

২৪। তাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। তাদের খোঁজ-খবর নাও। কোথায় যায়-আসে, কোথায় রাত্রিবাস করে, তাদের বন্ধু কে ইত্যাদি তদন্ত করে দেখ। তবে হ্যাঁ, তাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলো না এবং বেশী বিশ্বাসও করে বসো না।

২৫। ছোট ভুলকে বড় করে দেখো না। যত পার ক্ষমা প্রদর্শন কর।

২৬। যেমন ভুল, ঠিক তেমনি শাস্তি প্রয়োগ কর। লঘু পাপে গুরু দন্ড ব্যবহার করো না। মশা মারতে কামান দেগো না। নচেৎ, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। হ্যাঁ, যেমন দুনিয়ার কাজের জন্য তাদেরকে মারধর কর তেমনি দ্বীনের কাজের জন্যও সমান খেয়াল রেখো।

২৭। খবরদার শাসনের ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্রয় দেবে না। তোমার স্ত্রীরও উচিত নয়, তুমি শাসন করলে তার প্রশ্রয় দেওয়া অথবা ছেলে-মেয়ের কোন পাপ গোপন করা।

২৮। তাদের পড়াশোনার জন্য ভালো স্কুল বেছে নাও। খবরদার এমন স্কুলে দেবে না, যেখানে তার আকীদা বেদ্বীনের আকীদা হয়ে যায়।

২৯। যথাসম্ভব ছেলেমেয়ের সাথে বাস কর এবং তাদের থেকে দূরে থেকো না।

৩০। মসজিদ, জালসা ও ইল্‌মী মজলিসে তাদেরকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হও।

৩১। বিয়ের বয়স হলে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দাও। নচেৎ তারা কোন পাপ করে বসলে তোমারও পাপ হবে।

৩২। ভরণ-পোষণ, স্নেহ-প্রীতি, উপহার ও দানে সকলের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখ। সন্তান এক স্ত্রীর হোক অথবা একাধিক স্ত্রীর, পিতার কাছে সকলে সমান।

৩৩। তাদের প্রতি স্নেহশীল হও। মমতা প্রদর্শন কর।

তরবিয়তের এই মৌলনীতি গ্রহণ করে চললে - ইন শাআল্লাহ - ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি সুখী হবে। অবশ্য বাইরের কোন পরিবেশ যদি তাকে পরিবর্তন করে দেয়, তবে সে কথা ভিন্ন।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ

মানুষ একা একা সুখ পায় না। একা থাকলে মনের শান্তি পাওয়া যায় না। চাই আপনজনকে, আত্মীয়-স্বজনকে। যারা একঘরে থাকে অথবা রগকাটা হয় তারা আসলে সুখী মানুষ নয়। পক্ষান্তরে তারা সমাজেও নিন্দাহ এবং মহান আল্লাহর কাছেও। এই জন্য তিনি তার বিধান দিয়েছেন ইসলামে। তিনি বলেন,

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক। আর জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকেও ভয় কর। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝٢٦ ﴾

অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও পথচারীর প্রাপ্য অধিকার আদায় কর। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। *(সূরা ইসরা ২৬ আয়াত)*

সুসম্পর্ক যে বজায় রাখে না, আত্মীয়তার বন্ধন যারা ছেদন করে তারা আসলে মানুষের কাছে অভিশপ্ত এবং আল্লাহর কাছেও। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ۝٢٥ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

মহানবীর আদেশ হল, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ।" *(সহীহুল জামে ১০৮-নং)*

আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা মুমিনের গুণ। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।" *(বুখারী)*

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়কারীর সাথে মহান আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মহানবী ﷺ বলেন, "জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, 'যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" *(বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি রচনা করলেন। অতঃপর যখন তিনি তা শেষ করলেন, তখন 'জ্ঞাতিবন্ধন' উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' আল্লাহ বললেন, 'আচ্ছা। তুমি কি রাজি নও যে, তোমাকে যে অক্ষুন্ন রাখবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখব

আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করব?' 'জ্ঞাতিবন্ধন' বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, তাহলে তাই তোমাকে দেওয়া হল।' অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা চাইলে পড়ে নাও,

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিশাপ করেছেন, আর করেছেন বধির ও দৃষ্টি-শক্তিহীন। *(সূরা মুহাম্মদ ২২-২৩ আয়াত।) (বুখারী ৫৯৮৭ নং মুসলিম ২৫৫৪ নং)*

জ্ঞাতিবন্ধন নষ্ট করার শাস্তি পরকালে তো আছেই, ইহকালেও সত্বর তার শাস্তি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।" *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৪২১১নং, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৫৭০৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর আনুগত্য করা হয় এমন আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি যে আমলের সওয়াব পাওয়া যায়, তা হল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। আর যে বদ আমলের শাস্তি সত্বর দেওয়া হয়, তা হল বিদ্রোহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা।" *(বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫৩৯১নং)*

পরকালে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টকারী বেহেশ্তে যাবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।" সুফয়্যান বলেন, 'অর্থাৎ (রক্ত-সম্পর্কীয়) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।' *(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬ নং, তিরমিযী)*

পক্ষান্তরে যে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে সে বেহেশ্ত্ প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, 'আরে, কি হল ওর কি হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬নং, মুসলিম ১৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। অতঃপর সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত আমল হল, তাঁর সাথে শির্ক করা। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" *(সহীহুল জামে ১৬৬নং)*

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় করাতে শুধু সুখই নেই বরং তাতে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়।

রুযীতে বর্কত ও প্রশস্ততা আসে। মহানবী ﷺ বলেন "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী প্রশস্ত হোক এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" *(বুখারী + মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

"আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখাতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, পরিজনের মধ্যে সম্প্রীতি থাকে এবং আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়।" *(সহীহুল জামে ৩৭৬৮-নং)*

যে ভাবেই সম্ভব আত্মীয়তার সম্পর্ক জীবিত রাখ। আসা-যাওয়ার মাধ্যমে, টেলিফোনের মাধ্যমে, সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখ।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আর্দ্র রাখ; যদিও তা সালাম দিয়ে হয়।" *(সহীহুল জামে ২৮৩৮-নং)*

তাদের কেউ যদি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তবুও তুমি লজ্জা দূর করে গায়ে পড়ে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। আদর্শ মানুষের কাজ হল, সে তাকে নিকটে করে যে তাকে দূর ভাবতে চায়, তাকে দান করে যে তাকে বঞ্চিত করতে চায় এবং তাকে ক্ষমা করে দেয় যে তার উপর অত্যাচার করে। মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।" *(সহীহুল জামে ৩৭৬৯নং)*

"সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সে তা কায়েম করে।" *(বুখারী)*

দ্বীন-দরদী বন্ধু আমার! পূর্ণরূপে দ্বীন মানার জন্যই অনেকে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইবে না। অনেকে পর্দার কারণে, অনেকে 'কড়া' বলে বদনাম করে, কেউ বা তুমি গরীব বলে, কেউ বা তুমি হক কথা বল বলে, কেউ বা তুমি সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান কর বলে তোমার সাথে মিশতে, তোমার ঘর আসতে চায় না। এটিও একটি দুঃখের কারণ অবশ্যই। কিন্তু তোমার কর্তব্য কি হবে তখন? তুমিও কি তাদেরই মত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবে? তাহলে তুমিও তো তাদেরই মত হলে। তোমার ও তাদের মাঝে পার্থক্য থাকল কি বন্ধু?

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রেখে চলতে চাই; কিন্তু আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যবহারে ধৈর্য ধরি; কিন্তু তারা আমার প্রতি মূর্খের মত আচরণ করে। (এখন আমি কি করতে পারি?)

উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি যা বললে, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে যেন তুমি তাদেরকে গরম ছাই আহার করাও। (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) আর তুমি যতক্ষণ তোমার এই কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য এক সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে।" *(মুসলিম)*

আত্মীয় যদি বেনামাযী, বিদআতী, কাফের, নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী হয়, তাহলে তাদেরকে নসীহত করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। তাতে বিফল হলে তাদেরকে বর্জন কর, শান্তি পাবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালোবাসে, যদিও সে (বিশ্বাসী) তাদের পিতা অথবা পুত্র, ভ্রাতা অথবা একান্ত আপনজন কেউ হয়----।" *(সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, রক্তের সম্পর্কের চাইতে ঈমানী সম্পর্কই অধিকতর মজবুত।

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর

প্রত্যেক সন্তানের কাছে পিতামাতা সবচেয়ে বড় মূল্যবান ধন। সবচেয়ে নিকটতম আপন। কিন্তু সংসারে ভুল বুঝাবুঝির ফলে নানা চক্রে তারা পর হয়ে যায়। তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়। তাই মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ ও আদেশ দিয়েছেন যুগে যুগে।

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গে (সদ্ব্যবহার করবে)। আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; তৎপর তোমাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে। যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে। *(সূরা বাক্বারাহ ৮৩ আয়াত)*

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে ভালোবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু (উঃ) বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। আর অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' *(সূরা বনী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

পিতা-মাতার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে কুরআনের বয়ান শোন। ইবরাহীম عليه السلام নিজ মুশরিক পিতার সাথে কিভাবে কথোপকথন করেছেন; কুরআন বলে,

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা! যে শুনে না দেখে না এবং আপনার কোন কাজে আসে না আপনি তার ইবাদত করেন কেন?

হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান, যা আপনার নিকট আসে নি। সুতরাং আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো।

হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করেন না; শয়তান দয়াময়ের (আল্লাহর) অবাধ্য।

হে আমার পিতা! আমি আশঙ্কা করি আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং আপনি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বেন।

পিতা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছো? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবোই। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।

ইব্রাহীম বলল, আপনার নিকট হতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা মারইয়াম ৪২-৪৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মাতা-পিতার জন্য অসিয়ত করে বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তবে তুমি তাদেরকে মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো যা তোমরা করতে। *(সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত)*

ইসলাম পিতামাতার খিদমতকে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি বর্ণনা করে তাদেরকে বিরাট মর্যাদা দান করেছে। এমন কি কঠিন ইবাদত পালনের উপরও তাদের খিদমত অগ্রাধিকার পেয়েছে।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা-বাপ জীবিত আছে কি?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তাদের মাঝে জিহাদ কর।" *(বুখারী, মুসলিম ২৫৪৯নং)*

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি হিজরত ও জিহাদের উপর আপনার নিকট বায়াত করতে চাই। আর এতে আমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করি।' তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।' তিনি বললেন, "আর তুমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা কর?" লোকটি বলল, 'হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর।" *(মুসলিম ২৫৪৯ নং)*

জাহেমাহ ؓ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ؓ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

এখানে নফল জিহাদের কথা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরয হলে মা-বাপের অনুমতির অপেক্ষা থাকবে না।

পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করলে সন্তানের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এক গোনাহ করে ফেলেছি। আমার কি কোন তওবাহ (প্রায়শ্চিত্ত) আছে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছে

কি?" লোকটি বলল, 'জী না।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমার খালা আছে কি?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার সেবাযত্ন কর।" *(তিরমিযী ১৯০৪নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১৫৫)*

পিতা-মাতা যদি সন্তানের প্রতি খোশ থাকে, তাহলে মহান আল্লাহও প্রসন্ন থাকেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযী, হাকেম, বাযযার, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৬নং)*

অবশ্য পিতার তুলনায় মাতার রয়েছে বেশী অধিকার। কারণ, সন্তান লালন-পালনে মায়ের কষ্টটাই বেশী। বিশেষ করে গর্ভধারণ, জন্মদান এবং দুগ্ধদান বড় বড় এই ৩ কষ্টের কারণে মায়ের হক বাপের তুলনায় ৩ গুণ বেশী।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কাছে সৎসংসর্গ পাওয়ার অধিক হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি আবারও বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' এবারে তিনি বললেন, "তোমার বাপ।" *(বুখারী + মুসলিম)*

পিতা-মাতার খিদমত বেহেশ্তে যাওয়ার একটি অসীলা। যে এই অসীলা থাকতেও বেহেশ্তে যেতে পারে না, সেই প্রকৃত হতভাগ্য।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপেই চড়ে বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন।" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! --- যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি 'আ-মীন' বললাম। ---" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পিতা হল বেহেশ্তের মধ্যম দরজা। সুতরাং তোমার ইচ্ছা হলে তার যত্ন নাও, না হলে তা নষ্ট করে দাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

পিতামাতার খিদমত দুআ কবুল হওয়ারও অন্যতম অসীলা।

প্রসিদ্ধ গুহাবন্দীদের মধ্যে একজন তার দুআতে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার খুব বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও নৈশ দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের জন্য নৈশ দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে নিজ কোন পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর তাঁদের শিয়রে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইভাবে ফজর হয়ে গেল। আর আমার পদতলে আমার শিশু ছেলেমেয়েরা (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। অতঃপর তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাদের সেই নৈশ দুধ পান করলেন।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজ তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে এই

পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।'

পিতামাতার সেবার অসীলায় এই দুআর ফলে পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গিয়েছিল।

পিতামাতার জীবনে এবং বিশেষ করে তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার মক্কার পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, 'আপনি কি অমুকের পুত্র অমুক?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি লোকটিকে নিজের গাধা ও পাগড়ী দান করে দিলেন। তা দেখে লোকেরা অবাক হল। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হল তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের প্রিয়জনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।" আর ঐ লোক ছিলেন আমার পিতা উমারের বন্ধু।' *(মুসলিম ২৫৫২নং, প্রমুখ)*

মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কার না নেই? কিন্তু মা যদি তোমার বিপরীতগামিনী হয়, কাফের বা বিধর্মিনী হয়, তাহলে তুমি কি করতে পার তখন?

কি উপায় নেবে তখন? আল্লাহর কথা শোন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে (সন্তানকে) কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে; যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করবে, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। *(লোকমান ১৪-১৫ আয়াত)*

এ অবস্থায় মায়ের জন্য হিদায়াত প্রাপ্তির দুআ কর। আবূ হুরাইরা আম্মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আম্মা রেগে উঠে আল্লাহর নবী ﷺ-কে গালাগালি করতেন! আবূ হুরাইরা মহানবী ﷺ-কে ঘটনা খুলে বলে তাঁর জন্য হিদায়াতের দুআ করতে বললেন। তিনি দুআ করলেন। আবূ হুরায়রা দুআর মাঝে সুসংবাদ নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে দেখলেন, আম্মা তখন (মুসলমান হওয়ার জন্য) গোসল করছেন।

কিন্তু মা যদি হকপথে ফিরে না আসে, তাহলে কি তুমি মায়ের সুখ দেখবে, না হকের আকর্ষণ? নিঃসন্দেহে হকের আকর্ষণই তোমাকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। আর মায়ের

সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সাহাবী সা'দ বিন আবী অক্কাস ইসলামে দীক্ষিত হলেন। সে কথা শুনে তাঁর মা পানাহার বন্ধ করে দিলেন। আর কসম করে বললেন যে, সা'দের ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। কিন্তু সা'দ নিজের ঈমানে অবিচল থাকলেন এবং বললেন, 'মা! আপনি জেনে নিন যে, যদি আপনার মত ১০০টি মা হয় এবং একটি একটি করে সকলে মারা যায়, তবুও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করব না। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি খান, না হলে না খান!'

অবশ্য একদিন ও এক রাত পরে তিনি পানাহার করেছিলেন। *(সিয়ার আ'লামিন নুবালা ১/১০৯)*

আসমা বিন্তে আবী বাক্র আল্লাহর নবী ﷺ-এর বিনা অনুমতিতে তাঁর মুশরিক মায়ের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। উম্মে হাবীবার পিতা তাঁর বাসায় এলে স্বামী (মহানবী ﷺ)এর বিছানা গুটিয়ে নিতেন।

মায়ের খিদমত তথা সেবাযত্ন করার কিছু উজ্জ্বল নমুনা রয়েছে আমাদের কাছে। নিতান্ত ক্ষুধার তাড়নায় এক জামাআত সাহাবার সাথে আবূ হুরাইরা ﵁ মহানবী ﷺ-এর গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁদেরকে দুটি করে খেজুর খেতে দেন। আবূ হুরাইরা ﵁ একটি খেজুর খান এবং একটি খেজুর মায়ের জন্য লুকিয়ে নেন! মহানবী ﷺ-এর দৃষ্টিতে তা ধরা পড়লে তিনি তাঁকে বলেন, "দুটোই তুমি খেয়ে নাও। তোমার মায়ের জন্য আমি পৃথক দিচ্ছি।"

উয়াইস ক্বারনীর নাম প্রায় সকলেরই জানা। তিনি ছিলেন মায়ের বড় খিদমতগুযার। মা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলেই তিনি মদীনায় এসে মহানবী ﷺ-এর সাথে দেখা করে সাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি। তবুও তিনি এত বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, মহানবী ﷺ তাঁকে নিজ কামীস দান করে গিয়েছিলেন এবং উমার ﵁-কে বলেছিলেন, সে (ইয়ামান থেকে) মদীনায় এলে তাকে বলো, সে যেন তোমার জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার) দুআ করে!

মরণের পরেও মায়ের জন্য মন কাঁদে সন্তানের। মধ্যজগতে মা কিসে শান্তি পাবেন তার খেয়াল করে অনেকে অনেক রকম ব্যবস্থা নিয়ে ঈসালে সাওয়াব করে থাকেন।

সা'দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি, তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?' নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।' *(বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ)*

একদা সা'দ বিন উবাদাহ ﵁ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

এ বয়ান নিয়ে সা'দ ﵁ একটি কুয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(সহীহ আবু দাউদ ১৪৭৪ নং)*

আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা করে দেব কি?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ করে দাও।' *(ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪,*

আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌছত।" *(আবূ দাউদ ২৮৮৩নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)*

কিন্তু তাতেও কি মায়ের একাংশ হক বা শুকর আদায় করা সম্ভব হয়? কক্ষনো না। মা-বাপের যে দান তার প্রতিদান কিছু নেই। তাদের ঋণ পরিশোধ করা মোটেই সহজ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "কোন সন্তান কোন পিতাকে প্রতিদান দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাকে ক্রীতদাস হিসাবে পায় এবং খরীদ করে স্বাধীন করে তবে (কিছুটা আদায় হবে)।" *(মুসলিম ১৫১০, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রমুখ)*

একদা এক ব্যক্তি তার মা-কে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করছিল। সে তাকে বলল, 'মা! আপনি কি মনে করেন যে, আমি আপনার বিনিময় আদায় করতে পেরেছি?' ইবনে উমার ؓ পাশ থেকে তা শুনতে পেয়ে তাকে বললেন, 'হ্যাঁ হে অধম! মাত্র একটি বার প্রসব বেদনার বিনিময়।' *(মাকারিমুল আখলাক ২৪৬নং)*

এক ব্যক্তি উমার ؓ-কে বলল, 'আমার মা বার্ধক্যের শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। এখন তিনি তাঁর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন সারতে আমার পিঠে চড়েই যান। এতে আমি কি তাঁর হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছি?' তিনি বললেন, 'না। কারণ, সে যখন তোমার সেবা করেছে, তখন মনে মনে কামনা করেছে যে, তুমি বেঁচে থাক। আর তুমি ওর সেবা করছ, আর মনে মনে কামনা করছ যে, সে মারা যাক।'

আল্লাহর কাছে মা-বাপের এত বড় মর্যাদা যে, তারা সন্তানের হক্কে দুআ অথবা বদ্দুআ করলে কবুল হয়ে যায়। আর সেই জন্য তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে দুআ নিতে হয় এবং তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা থেকে দূরে থেকে বদ্দুআ থেকে সাবধান থাকতে হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের জন্য তার মা-বাপের দুআ বা বদ্দুআ।" *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

পিতা-মাতার ডাকে তৎপর সাড়া দেওয়া জরুরী। এমন কি নফল ইবাদত ছেড়েও মা-বাপের আহবানে সাড়া দিতে হবে। নচেৎ সে অবস্থাতে তারা কষ্ট পেয়ে বদ্দুআ দিলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মায়ের বদ্দুআয় জুরাইজ আবেদের সাথে বেশ্যা মেয়ের কলঙ্ক রটার কথা হাদীসে প্রসিদ্ধ।

কিভাবে মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করবে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ ঃ-

১। মা-বাপের নাম ধরে ডেকো না।
২। পথ চলতে তাদের আগে আগে চলো না।
৩। তাদের বসার আগে তুমি বসো না।
৪। তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর।
৫। মিষ্টি কথা দিয়ে তাদেরকে প্রয়োজনে নসীহত কর।
৬। তাদের ডাকে সত্বর সাড়া দাও।
৭। তাদের দাওয়াত কবুল কর।
৮। তাদের সাথে নরম মেজাজে কথা বল।
৯। তাদের মুখের উপর মুখ দিও না।
১০। বৈধ ও বিধেয় বিষয়ে তাদের আদেশ পালন কর।
১১। তাদের ভরণ-পোষণ বহন কর।
১২। প্রয়োজনে তাদের দৈহিক খিদমত কর।
১৩। তাদের আগে পানাহার করো না।
১৪। তাদের জন্য দুআ কর।
১৫। তাদের কাছে দুআ চাও।
১৬। তাদের ভুল-ত্রুটিকে দৃষ্টিচ্যুত কর।
১৭। তাদের উপর তোমার স্ত্রীকে প্রাধান্য দিও না।
১৮। তাদের যথার্থ সম্মান কর।
১৯। তাদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না।
২০। তাদের পরিচয় গোপন করো না। তারা যেমনই হোক, তবুও তারা তোমার মা-বাপ।
২১। এমন কাজ কর, যাতে তারা খুশী হয়।
২২। তোমার বিরোধী হলেও দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্‌ভাবে বাস কর।
২৩। খবরদার! পিতামাতাকে কোন সময় গালি দিও না। কারণ, তাদেরকে গালি দেওয়া কাবীরা গোনাহ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম কাবীরা গোনাহ।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়?!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সরাসরি না দিলেও) সে অপরের পিতাকে গালি দেয় ফলে সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং এভাবে অপরের মাতাকে গালি দেয় ফলে সে তার মাতাকে গালি দেয়।" *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

মা-বাপের কোন সময় অবাধ্য হয়ো না। কাজ যদি হারাম না হয়, তাহলে তা সম্পাদন করতে মোটেই অস্বীকার করো না। কারণ, মহানবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।" *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)*

একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি

আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গোনাহর কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলা।" *(বুখারী ৫৯৭৬, মুসলিম ৮৭নং, তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা এবং অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা।

আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সহিত শির্ক করা, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী ৬৬৭৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)

আর তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করে যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।" *(আহমদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

ইসমাঈল ﷺ কত বড় পিতার বাধ্য সন্তান ছিলেন যে, পিতা তাঁকে যবেহ করবেন তা জানতে পেরেও তাঁর আনুগত্য করেছেন। বলেছিলেন, 'আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলরূপে পাবেন।' *(সূরা সাফ্‌ফাত ১০২ আয়াত)*

তদনুরূপ স্পষ্ট দোষ লক্ষ্য করলে পিতা যখন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে আদেশ করলেন, তখনই নির্দ্বিধায় তিনি তালাক দিয়েছিলেন। এরূপ আব্দুল্লাহ বিন উমারও তালাকের আদেশ পালন করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পিতার আনুগত্যের বেনযীর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

অবশ্য বিনা দোষে নিছক হিংসায় 'দেখতে লারি চলন বাঁকা' বলে স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে ছেলের সে হুকুম মানা বৈধ নয়। তবে অবশ্যই স্ত্রী ও পিতা উভয়কে রাজী ও শান্ত করা তার কর্তব্য।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদের নিকট এসে বলল, 'আমার বাপ আমাকে আমার স্ত্রী তালাক

দিতে আদেশ করছে, আমি তা পালন করব কি?' তিনি বললেন, 'তালাক দিও না।' লোকটি বলল, 'হযরত উমার তাঁর ছেলে ইবনে উমারকে তাঁর স্ত্রী তালাক দিতে বললে আল্লাহর রসূল তাঁকে (ইবনে উমারকে) তালাক দিতে আদেশ করেননি কি?' উত্তরে ইমাম আহমাদ বললেন, 'তোমার বাপও কি উমারের মত?' কারণ, উমার (রাঃ) কারো প্রতি যুলুম করবেন -তা কল্পনার বাইরে। হয়তো তিনি ঐ মেয়েটির ব্যাপারে এমন কিছু জানতেন যার কারণে তালাক দেওয়া জরুরী ছিল। তাই নবী ﷺ ইবনে উমারকে তাঁর পিতার কথা অনুসারে তালাক দিতে আদেশ করেছিলেন। সুতরাং স্ত্রীর স্বভাব মন্দ হলে অবশ্যই মা-বাপের কথায় তালাক দিতে হবে। *(ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৭৫৫-৭৫৬)*

খবরদার মা-বাপের পরিচয় গোপন করে তাদেরকে ছোট করো না। তুমি যত বড়ই হও না কেন, তাদের মর্যাদা তোমার থেকে উপরে। যেমন পরের বাপকে বাপ বলে নিজের মর্যাদা বর্ধনের অপচেষ্টাও করো না। যেহেতু তা হল বিরাট পাপের কাজ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।" *(বুখারী ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩নং, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮৮-নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, "এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।" *(আহমদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৮৬নং)*

শান্তিপ্রিয় বন্ধু আমার! আশা করি তুমি সেই ছেলেদের মত নও, যে ছেলে বাপ-মায়ের সংসারে লাথি মেরে প্রেয়সীর সাথে চলে গিয়ে সংসার করে। কারণ, তার মা-বাবা সে প্রেমে রাযী নয় তাই। 'দুনিয়া পিয়ার কী দুশমন হ্যায়' এবং 'দোস্তী কুরবানী চাহতী হ্যায়' বলে মা-বাপকে কুরবানী দিয়ে প্রেম টিকিয়ে রাখে!

এখানেই শেষ নয়, বরং কোন কোন ছেলে তার মা-বাপকে ঘর থেকে বের করে দেয়। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বৃদ্ধ-খোঁয়াড়। এর কারণ, (১) স্ত্রীর সাথে তাদের বনিবনাও হয় না। (২) তারা একটানা অসুস্থ থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অথবা তাদের কেউ বিরক্তি প্রকাশ করে (৩) অতিরিক্ত বিলাসিতা বা সুখভোগে অসুবিধা বোধ করে।

বরং অনেকে হত্যা করে দেয়, পথের কাঁটা দূর করার জন্য!!!

সেই মা যে রাতের পর রাত জাগরণ করেছে তোমার আরামের জন্য, কষ্টের পর কষ্ট বরণ

করেছে শুধু তোমার শান্তির জন্য। যে মা কত কষ্ট করে তোমাকে পেটে ধারণ করেছে এবং সে সময় কত মাথা ব্যথা, পা ফুলা, গা ঘোরা, বমন প্রভৃতি অসুস্থতা নীরবে খুশীর সাথে সহ্য করেছে। যে তোমাকে তোমার নিতান্ত দুর্বল অবস্থা থেকে সবল অবস্থায় কত যত্নের সাথে পৌঁছে দিয়েছে। সেই সময় তোমাকে নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, যে সময় তা ছাড়া তোমার আর অন্য কোন খাদ্য ছিল না।

সেই পিতা যে বড় পরিশ্রম ও মেহনত করে বাড়ি বানায়, মাল জমায় এবং ছেলের জন্য যাবতীয় সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে। কিন্তু বিবাহের পর ছেলে অথবা তার স্ত্রী তাদেরকে সেই বাড়ি ও সুখ-সামগ্রী থেকে বের করে দেয়! এর মত নেমকহারামি দুনিয়াতে আর কি হতে পারে?

স্ত্রীর সাথে মা-বাপের বনিবনাও না হলে অভিনয় কর। স্ত্রীকে বুঝাও। স্ত্রী হক পথে থাকলে মা-বাপের সাথে প্রকাশ্যে রাযী থাক। স্ত্রী নাহক পথে থাকলে তাকে শাসন কর।

এ কথা সত্য যে, কোন কোন মা-বাপের ব্যবহার বড় নীচ ও নোংরা হয়। ছেলে ভালো, কিন্তু তাদের ঘুম থেকে উঠতে দেরী দেখলে বলে, 'লায়লা-মজনুর মত গলা ধরে শুয়ে থাক।' কাপড় ছিঁড়ে গেলে বলে, 'পাছায় ফাল আছে নাকি?' বেশী ভাত খেলে ছোট সরায় মেপে ভাত দেয়। আর সে ঘরের 'বউ ভাঙ্গলে সরা, গেল পাড়া-পাড়া। গিন্নী ভাঙ্গলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।' 'পেটের শত্রু ভুঁড়ি, (আর সে) ঘরের শত্রু বুড়ি।'

আবার কোন কোন মা-বাপ ভালো হয়, কিন্তু ছেলে খবীস। একটি ছেলে হলেও শান্তি নেই। পরিবার-পরিকল্পনাও কাজের নয়। বউ শ্বশুর-শাশুড়ী চায় না; চায়, 'একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।' আর 'বউ গিন্নী হলে তার বড় ফরফরানি, মেঘ ভাঙ্গা রোদ হলে তার বড় চরচরানি।' সেই সংসারে বড় অশান্তির ঝড় নামে। বিশেষ করে ছেলে মেড়া হলে তো আরো। তার কোন আনন্দে 'মেগের কুটুম হারমানা, ভাতারের কুটুম আসতে মানা' হয় বউ-এর কাছে। ছেলে তার কাছে নিতান্ত গোবেচারা হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশী ছেলের নিকট বউ-এর অভিযোগ করলে ছেলে অধমের মত জবাব দেয়, 'মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না, পরের মেয়ে রাখি কোথায়?'

আর সে সময় পাড়ার লোকদের কৌতুহল বড় বৃদ্ধি পায়। সেই ছেলে-বউকে নিয়ে নেতাদের রাজনীতি চলে। বাপ-মা যা না বলে, তার শতগুণ বেশী বলে পাড়ার অকর্মণ্য শাঁকচুন্নীরা; এমন কি আঁচলধরা পুরুষরাও! 'যার গরু সে বলে বাঁঝা, পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন!' 'মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে।'

অথচ বাপ-বেটা বা শাউড়ী-বয়ে ঝগড়া হলে এক তরফা শুনে উলুখাগড়ার মুখ খোলা উচিত নয়। কারণ, বাপ-বেটায় মিল হয়, কিন্তু তাদের কথা থেকে যায়। বাপের দেওয়া আঘাত ছেলে সহজে হজম করে নেয়, কিন্তু হজম করতে পারে না পাড়া-পড়শীর কথার ঐ যাক্কুম পাতাকে। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন পেটে যন্ত্রণা দেয় এবং ওলখেকো পোড়ার-মুখো-মুখীদের প্রতি ঘৃণা ও অশুভ কামনা থাকে।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অধিকাংশ এ ধরনের মনোমালিন্য ঘটে আপোসের ভুল বুঝাবুঝির কারণে।

আমি জানি বন্ধু! তোমার জ্ঞান থাকলেও পাড়ার লোকে তোমাকে অজ্ঞান ও ক্ষেপা বানিয়ে ছাড়বে। সুতরাং সেই সময় ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করার চেষ্টা করো। তা না হলে তোমার জীবনের সুখের পরিবেশে এটাই হবে বড় দুর্ঘটনা।

সুতরাং তোমার বাড়ি ও প্রতিবেশীর পরিবেশ নোংরা হলে আগে থেকে সাবধান হয়ে যাও। নচেৎ আমার বড় ভয় হয় যে, তোমার মরা দেহের গোশ্ত্ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে সমাজের ঐ বেরহম-বেশরম চিল-শকুনরা।

হ্যাঁ, আর খবরদার ব্যবহারে স্ত্রীকে মায়ের উপর প্রাধান্য দিও না। বউকে নমস্কার এবং মা-কে তিরস্কার করো না। একটি কথোপকথন শোন ঃ-

মা ডাক দিল ছেলেকে ঃ বাবা পাঁচু!

ছেলে ঃ উঃ, কি যে বলে বুড়িটা? হ্যাঁঃ, কি চাই? কি হল?

মা ঃ আমার খুব পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে বাবা, একবার হাসপাতাল নিয়ে চ।

ছেলে ঃ তোমার ফরমায়েশি গাদা। আমি ব্যস্ত আমার সময় নেই।

মা ঃ আমাকে খালি হাসপাতালে ছেড়ে আয় বাবা।

ছেলে ঃ কিন্তু আমি যে ব্যস্ত বললাম।

মাঃ কিসে ব্যস্ত বাবা? আমি তো দেখছি তুই ঘরে বসেই আছিস।

ছেলে ঃ হ্যাঁ বুড়ি আমার বসে থাকা মোটেই দেখতে পারবে না।

মা ঃ না বাবা আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি যে রে।

ছেলে ঃ ঝামেলার দরকার নেই। আর বেশী কথা বলারও দরকার নেই। আমি তোমাকে নিয়ে যাব; কিন্তু ৫ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে যাও। নইলে আমি চলে যাব।

মা ঃ এক্ষনি বাবা এক্ষনি।

কিন্তু একদা বিবি বলল ঃ এই পাঁচু!

পাঁচু ঃ কি কি কি বলছ?

বিবি ঃ আজ পার্কে যেতে চাই।

পাঁচু ঃ অসুবিধা নেই। কোন পার্কে? আর কিছু ?

বিবি ঃ চল তাহলে।

পাঁচু ঃ আমি তোমার জন্য গাড়িতে অপেক্ষা করছি, তাড়াতাড়ি করো না। ধীরে ধীরে এস!

ভেবে দেখ বন্ধু! একদিন যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন মা-বাপকে 'এটা কি? ওটা কি?' বারবার কত আটাং-পাটাং প্রশ্ন করেছিলে। কিন্তু শত খুশীর সাথে তারা তোমাকে বারবার সঠিক জবাবটাই মিষ্টি সুরেই দিয়েছিল। কোন রকমের বিরক্তি প্রকাশ করে নি তারা। আর আজ যখন বুড়ো-বুড়ি হয়ে (ছেলের দরে) গেছে জেনেও তাদের কেউ যখন গাছের ডালে ধাঁধাঁ চোখে কিছু দেখে তোমাকে প্রশ্ন করে, 'ওটা কি রে বাবা?' তখন তুমি জবাবে বল, 'বক গো বক।'

কিন্তু দুর্বল কানে বুঝতে না পেরে পুনরায় প্রশ্ন করলে দ্বিতীয়বার জবাবে বল, 'ধুত বুড়ো কোথাকার! বলছি বক। বুড়িয়ে বক চিনছে না বুড়ো!'

মা মা-ই। রান্না সেরে গোসল করে ও করিয়ে খেতে বসে ২/১ থাবা তুলেছে এমন সময় কচি

ছেলে পায়খানা করে দিলে হেসে বলে 'ছিঃ ছিঃ।' তারপর খাওয়া বাদ দিয়ে তা সানন্দ-চিত্তে পরিষ্কার করে। কিন্তু বুড়িয়ে যাওয়ার পর সেই মা কাপড়ে বেসামাল হয়ে গেলে, 'বুড়ির হুঁশ নেই---' ইত্যাদি কথা শুনতে হবে। তাই স্থবিরতা থেকে আল্লাহর নবী পানাহ চাইতেন।

ছেলে একদিন দেরী করে বাড়ি ফিরলে ঘর-দুয়ার করে মা ঘুমায় না। কিন্তু তাদের কেউ দেরী করলে কয়টা ছেলে চিন্তিত হয়?

ছেলের পেছনে মা-বাপ কত খরচ করে? কিন্তু ছেলে মা-বাপের পিছনে খরচ করতে কার্পণ্য করে। বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি। আর মাকে পরায় নিম্নমানের সুতির। গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউ-এর হাতে সোনার বালা। মার গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি! মা খায় ধান ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে। মা পায় না কাঁথা সিলায়ের সুতো, বেটার পায়ে চৌদ্দ সিকের জুতো।

কিন্তু এটা কি ইনসাফ বন্ধু! যদি তাই হয়, তাহলে মনে রেখো, 'পাত পড়ে কলি হাসে, ওরে কলি তোরও এ দিন আছে। ঘুঁটে পুড়ে গোবর হাসে, ওরে গোবর তোরও একদিন আছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল, টিট ফর টাট।'

মহানবী ﷺ বলেন, "দুটি পাপ এমন রয়েছে, যার শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত করা হয়; বিদ্রোহ ও পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ২৮১০নং)*

বিদ্রোহী বন্ধু আমার! একটা গল্প শোন। এক যুবক ছেলে তার বাপকে মারতে মারতে হেঁচড়ে নিয়ে বাড়ির সদর দরজা পার করে পথে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল। বাপ বলল, 'ওরে আমাকে দরজার বাইরে বার করিস্‌নে রে! আমি আমার বাপকে এর থেকে বেশি নিয়ে যেতাম না রে!!'

ছেলে বলল, 'দরজা পর্যন্ত তোর আসল পরিশোধ। আর বাড়তি রাস্তা পর্যন্ত তোর সূদ। আজ সূদে আসলে তোকে ভোগ করতে হবে!!!'

'যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।'

এক বউ তার বুড়ি শাশুড়ীকে ঘৃণাভরে মাটির মালসায় ভাত দিত। একদিন অসাবধানতায় সেটি ভেঙ্গে যায়। তা দেখে বউ চিল্লিয়ে পাড়ার লোক জমা করে। বলে, 'এবার বুড়িকে মেঝেয় খাল কেটে ভাত দিব।--- '

ইত্যবসরে তার যোগ্য ছেলে কলেজ থেকে ফিরল। তুলকালাম দেখে ব্যাপার বুঝে দাদীকেই বকতে শুরু করল সে। শুরুতে অবাক হল অনেকে। কিন্তু শেষে সে বলল, 'বুড়ি ওটা ভাঙ্গল কেন? আমিও ঐ মালসাতেই আমার মা-কে ভাত দিতাম!'

তখন টনক নড়ল মায়ের। কথা বেড়ে গেল এবং তাই হল, যা নোংরা পরিবেশে হয়ে থাকে।

জেনে রেখো বন্ধু! তুমি ও তোমার মাল বাপের উপার্জিত ধন। অতএব সেই মাল তাদের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করো না। অবশ্য এমন বাপও আছে যে ছেলেকে একটি পয়সাও পকেটে রাখতে দেয় না। বয়েরও সবকিছু কিনতে চায় সে! অথচ সুখ আছে এই দুয়ের মাঝে। একে অপরকে ভুল না বুঝাতে।

পরিশেষে তুমি ছোট্ট শিশু ঈসার মত বল,

﴿ وَأَوْصَٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ ﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন যেন আমি নামায ও যাকাত আদায় করি এবং আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকি। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য বানান নি। *(সূরা মারয়্যাম ৩১-৩২ আয়াত)*

নেক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী হল সন্নিহিত গৃহে পাশাপাশি বসবাসকারী মানুষ। এমন মানুষ যদি মুসলিম ও আত্মীয় হয়, তাহলে তার রয়েছে ৩টি হক; আত্মীয় না হলে দুটি হক। অমুসলিম আত্মীয় হলেও তার ২টি এবং অনাত্মীয় হলে ১টি হক রয়েছে, আর তা হল প্রতিবেশীর হক।

নেক প্রতিবেশী অন্যতম সুখের সম্পদ এবং তা সৌভাগ্যবান লোকেই পেয়ে থাকে। প্রতিবেশী সৎ হলে অনেক ঝগড়া-বিবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নচেৎ কেবল ছেলে-ছেলে, মুরগী-ছাগল নিয়েই কত শত অশান্তি সৃষ্টি হয় প্রতিবেশীর সাথে। তিক্ত হয়ে ওঠে সুখের পরিবেশ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

মহান আল্লাহ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত করে বলেন,

﴿ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে ভালোবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

মহানবী ﷺ প্রতিবেশীর গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন,

"জিবরীল প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত (বিশেষ উপদেশ) করতেই আছেন। এমনকি পরিশেষে আমার মনে হল যে, প্রতিবেশীকে আমার ওয়ারেস বানানো হবে!" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ, সহীহুল জামে ৫৬২৮নং)*

"আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করছি।" *(সহীহুল জামে ২৫৪৮নং)*

প্রতিবেশীর প্রতি কুব্যবহার অথবা অত্যাচার করা কাবীরা গোনাহ। কোন প্রকারে তাকে কষ্ট দেওয়া, তার বাড়ির দিকে নিজের বাড়ির জানালা বা ড্রেন খুলে রেখে, কোন প্রকার শব্দে, দুর্গন্ধে অথবা কুদর্শনে তাকে অতিষ্ঠ ও উত্যক্ত করা বৈধ নয় কোন মুমিনের জন্য। এমন করলে সে পূর্ণ মুমিন থাকতে পারে না, বিধায় বেহেশ্তে যেতে পারে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না!" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে কে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ৪৬ নং, আহমদ ২/২৮৮)*

"সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে মুমিন কে তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমদ ৬/২১, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪৯নং)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?) তিনি বললেন, "সে বেহেশ্তে যাবে।" *(আহমাদ ২/৪৪০, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১৬৬, সহীহ তারগীব ২৫৬০নং)*

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে অভিশপ্ত। *(সহীহ তারগীব ২৫৫৮নং)*

শুধু কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত হওয়াই নয়, বরং প্রতিবেশীর কষ্টে ধৈর্য ধারণ করাও পূর্ণ ঈমান ও নেক প্রতিবেশীর পরিচয়।

ফকীহ আবুল লাইষ সমরকন্দী বলেন, নেক প্রতিবেশীর আচরণ হল ৪টি; তার সাধ্যমত প্রতিবেশীর সহযোগিতা করে সান্ত্বনা দেওয়া, তার কাছে যা আছে তাতে লোভ না করা, তাকে কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়া এবং তার কষ্টদানে ধৈর্য ধরা।

অপরাধ তো অপরাধই। তবুও প্রতিবেশীর হকে কোন অপরাধ করা বহুগুণ অপরাধ। এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর জন্য রক্ষক স্বরূপ। কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, বেড়া যদি ক্ষেত খায়, তাহলে তার পাপ অবশ্যই বেশী।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর -অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে -এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা

করা।” আমি বললাম, ‘অতঃপর কোন পাপ?’ তিনি বললেন, “প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তোমার ব্যভিচার করা।” আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭, ৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট। তদনুরূপ প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি করা অধিকতর নিকৃষ্ট।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫০৪৩নং)*

মুমিনের উচিত হল, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে (ও তার সম্মান করে)। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন নিজ মেহমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(মুসলিম ৪৮নং)*

তিনি আরো বলেন, “তুমি পরহেযগার হও, তাহলে তুমিই হবে সবচেয়ে বড় আবেদ। তুমি অল্পে তুষ্ট হও, তাহলে তুমিই হবে সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞ। তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা অপরের জন্য কর, তাহলে তুমি হবে (প্রকৃত) মুমিন। তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, তাহলে তুমি হবে (প্রকৃত) মুসলিম। আর হাসি কম কর, যেহেতু অধিক হাসিতে হৃদয় মারা যায়।” *(সহীহুল জামে ৪৫৮০, ৭৮৩৩নং)*

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারে দেশ আবাদ ও শান্তিময় থাকে, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। মহানবী ﷺ বলেন, “আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করলে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের ভালোবাসা লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তাহলে তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর, সত্য কথা বল এবং তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৪০৯নং)*

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর নিকটে সর্বোত্তম বন্ধু হল সেই যে তার বন্ধুর কাছে উত্তম এবং তাঁর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হল সেই যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।” *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩২৭০নং)*

বলা বাহুল্য, যে প্রতিবেশীর কাছে ভাল লোক সেই আসলে ভাল লোক। যে প্রতিবেশীর

কাছে মন্দ সে মন্দ।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি ভাল কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) ভাল কাজ করেছ। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর মুখে বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছ, তাহলে তুমি (সত্যই) মন্দ কাজ করেছ।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৬১০নং)*

নগণ্য কিছু উপহার দিয়ে, তরকারী উপঢৌকন পাঠিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাতে আপোসের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাদের জন্য কিছু পাঠানোকে তুচ্ছ ভেবো না; যদিও বা তা ছাগলের খুরই হোক না কেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৭৯৮-৯নং)*

একদা মহানবী ﷺ আবূ যার্রকে বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি (গোশ্ত্ বা অন্য কিছুর) ঝোল বানাবে, তখন তাতে পানি বেশী করে দিও। অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে উপঢৌকন দিও।" *(মুসলিম২৬২৫নং)*

আর প্রতিবেশী ক্ষুধায় কালাতিপাত করলে তার জন্য দায়ী হবে প্রতিবেশী। জেনেশুনে ক্ষুধা নিবারণ না করলে মুমিনের ঈমানের পরিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। "সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী উপবাস থাকে।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫৩৮২নং)* "সে আমার প্রতি মুমিন নয়, যে ভরপেট খেয়ে রাত্রি যাপন করে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় থাকে এবং সে তা জানে।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৫০৫নং)*

এমনকি তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে যদি এমন কোন ফল খাও, যে ফল তোমার প্রতিবেশী খেতে পারে না, তাহলে তাদেরকে উপহার স্বরূপ কিছু ফল দিতে না পারলে তার ছাল যেন দরজার সামনে ফেলে রেখো না। যাতে প্রতিবেশীর ছেলেরা তা দেখে মনে দুঃখ না পায়।

প্রতিবেশীর জন্য যথাসম্ভব হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, প্রয়োজনে তাকে উপদেশ ও সুপরামর্শ দেওয়া প্রতিবেশীর কর্তব্য। কথায় বলে পড়শীর মুখ না আরশির মুখ। প্রতিবেশীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে, ঠিক তেমন ব্যবহার তুমিও তার কাছ থেকে পাবে। তাছাড়া প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর আয়নার মত হওয়া উচিত। এমনিতেই এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না বা আরশিস্বরূপ।

প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা কর্তব্য। প্রতিবেশী বাড়িতে না থাকলে তার বাড়ির দেখা-শোনা, তার পরিবার-সন্তানের শরয়ী আদবের ভিতরে থেকে খোঁজ-খবর নেওয়া কর্তব্য। কোন কাজে প্রতিবেশীর এক ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক প্রতিবেশীর কর্তব্য। কথায় বলে, 'এক ঝিঁকে মাছ লাগে না সেই বা কেমন বঁড়শী, এক ডাকে দেয় না সাড়া সেই বা কেমন পড়শী?'

পাশাপাশি বাস করে যে সাহায্য-সহানভূতির প্রয়োজন তা যদি প্রতিবেশী না করে তাহলে সে নিজ নবীর আদেশের নাফরমান। কারণ তিনি বলেন, "কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাষ্ঠখন্ড গাড়তে বাধা না দেয়।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)*

প্রতিবেশীর সাথে বিদ্বেষ রাখা উচিত নয় কোন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসকারী মানুষের। তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে ঝগড়া করা ভদ্র মানুষের পরিচয় নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম বাদী-প্রতিবাদী হবে দুই প্রতিবেশী।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ২৫৫৭নং)*

প্রতিবেশীর দরজা নোংরা করে, তার বাড়ির দিকে ময়লা ফেলে অথবা কোন প্রকারের এমন অশোভনীয় আচরণ করা উচিত নয়, যাতে পরিবেশ দ্বন্দ্বমুখর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ আচরণ করা উচিত, যেমন নিজের জন্য অপরের নিকট থেকে আশা করা হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ৪৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

সত্য কথা এই যে, প্রতিবেশী খারাপ হলে সেখানে বাস করা বড়ই দুষ্কর। বিশেষ করে যদি সে চোয়াড়, মাতাল বা লম্পট হয়, তাহলে সেখানে বাস করার চেয়ে জঙ্গলে বাস করা উত্তম। বিশেষ করে পাড়া-গ্রামের পরিবেশ একটি পুকুরের মত। পুকুরের এক ঘাটে কেউ পানি নাড়লে তার সব ঘাটে গিয়ে ঢেউ লাগে। গ্রামের এক বাড়িতে কিছু ঘটলে, সব বাড়িতে তার খবর রটে যায়। আবার অনেক সময় উল্টাও রটে। ফলে অনেক সময় 'যার গরু সে বলে বাঁঝা, আর পাড়া-পড়শী বলে সাত-বিয়েন। মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে, আর পাড়া-পড়শীর ধবলা ওড়ে।' প্রভু যিনি পাপ দেখেও গোপন করেন, কিন্তু প্রতিবেশী না দেখেও হাল্লা করে! এমন পড়শী আসলে যে বঁড়শী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছোটলোক প্রতিবেশীর মন্দ আচরণে প্রতিবাদ করবে? প্রতিবাদ করলে তোমার মান মাঠ-ময়লা হবে। বিষ্ঠায় ঢেলা মারলে নিজের গায়ে ছিটকে পরবে। তার চেয়ে ধৈর্য ধরে সে অন্যায় হজম করে নেওয়া অনেক ভাল।

এই জন্যই মহানবী ﷺ দুআতে বলতেন, "হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৪, সহীহুল জামে' ১২৯৯নং)*

"হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে।" *(হাকেম ১/৫৩২, নাঃ ৮/২৭৪, সহীহুল জামে' ১২৯০নং)*

শান্তিকামী বন্ধু আমার! তুমিও পানাহ চাও মন্দ প্রতিবেশী থেকে। নচেৎ তুমি তোমার দুখের ভাত সুখ করে খেতে পাবে না।

প্রশস্ত বাড়ি

প্রশস্ত বাড়ি এ দুনিয়াতে মানুষের জন্য একটি সুখের বিষয়। বিপরীত দিকে সংকীর্ণ বাড়ি একটি দুঃখের বিষয়। এ কথার সাক্ষি দিয়েছেন খোদ মহানবী ﷺ। তিনি বলেন, "মানুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

বাড়ি প্রশস্ত হলে বাড়ির লোকের মন প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ, চাপাচাপি লাগে না কাজে-কর্মে ও চলা-ফিরাতে। সুবিধা হয় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মধুর সময় অতিবাহিত করতে। সুবিধা হয় মেহমানদের। গায়র-মাহরাম নারী-পুরুষের অবৈধ দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে বিনা অসুবিধায় বসবাস করতে পারে।

পক্ষান্তরে বাড়ি সংকীর্ণ হলে, একটি বা দুটি কামরা হলে, সে বাড়িতে মেহমানদের অসুবিধা হয়, মেহমান রাখাও বাড়ি-ওয়ালার জন্য বড় ঝামেলার কাজ হয়। দম্পতিদের দাম্পত্য সুখ লুকোচুরির প্রেম-খেলায় পরিণত হয়। গায়র মাহরামদের অবাধ মিলামিশার ফলে পাপ তো হয়ই; কখনো কখনো অঘটন ঘটার ফলে অশান্তি ও অভিশাপ নেমে আসে বাড়ির ভিতরে। আর তখনই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সংকীর্ণ বাড়ি।

সংকীর্ণ বাড়ি সংকীর্ণ বেড়ির মত। আবার তাতে যদি প্রাচীর না থাকে তাহলে তো গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

যত কষ্টই হোক, বাড়ির প্রাচীর ও পর্দা হওয়া জরুরী। বাড়ির ভিতরে পায়খানা বা গোসলখানা হওয়া জরুরী। ব্যবস্থা হওয়া উচিত পানির। মুসলিম বাড়ির ইজ্জত হল পানির ব্যবস্থা ও বাথরুম। তা না হলে সে বাড়ির ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বড় কষ্ট হয়। ইজ্জত যায় মেয়েদের।

অনেক মানুষের ধারণা যে, অনেকের জন্য বাড়ি অশুভ বস্তুরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আসলে বাড়িতে জিন-ভূত যাই বল, বাড়ি সংকীর্ণ হওয়া এবং বাড়ির মানুষের চরিত্রহীন শয়তান জিনের মত হওয়াই তার অশুভ হওয়ার পরিচয়।

অতএব বাড়ি থেকে জিন-ভূত তাড়াবার আগে বাড়িটাকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নাও। শয়তান জিন ও মানুষকে বাড়ি প্রবেশে বাধা দাও। তারপর বাড়িতে নিয়মিত সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। তবেই শয়তান দূর হবে।

অন্যথা বাড়িতে যে বাঁধনই বাঁধ, কোন কাজ দেবে না। শির্কী বাঁধ তো কোন কাজেরই নয়।

গরীব মানুষ হলেও চেষ্টা কর যথাসম্ভব প্রশস্ত বাড়ি করার। নচেৎ দুনিয়ার সুখ অনেকাংশে তিক্ত হয়ে উঠবে বন্ধু!

আসল সুখ পরকালে

এ পৃথিবীর বুকে মানুষ যতই সুখের অধিকারী হোক না কেন, সে সুখ নির্মল নয়। যতই শান্তির মালিক হোক না কেন, সে শান্তি অনাবিল নয়। কিন্তু পরকালের সুখ অতুলনীয়, অকল্পনীয়, সকল সৌন্দর্য অমলিন ও নিখুঁত।

সেখানে হাসি আছে, কান্না নেই। সুচিন্তা আছে, দুশ্চিন্তা নেই। আনন্দ আছে, বেদনা নেই। প্রীতি আছে, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদ নেই। সেখানে কেবল সুখ আছে, কোন দুঃখ, কর্মব্যস্ততা ও বিপদ-আপদ নেই।

যদি তুমি গরীব হও অথবা দুঃখী, রোগী হও অথবা কাফেরের ফিতনার পাত্র, তুমি জান্নাতের কথা মনে কর। গাছের ছায়ার মত ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে ভুলে গিয়ে চরম সুখের পরম জীবনকে স্মরণ কর। স্মরণ কর চিরস্থায়ী সেই বিলাস রাজ্যের কথা, যেখানে পৌঁছে যেতে পারলে সেটাই হবে জীবনের মহাসাফল্য।

পরকালে যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই হল চিরসুখী ও সফল মানুষ। আসলে শান্তি ও আনন্দ বেহেশ্তের জিনিস। তা দুনিয়াতে থাকলেও তার পরিপূর্ণরূপ বেহেশ্তেই পাওয়া যাবে, দুনিয়াতে নয়।

মহান আল্লাহ বলেন, "বল, আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও করুণা নিয়ে সকলেরই খুশী হওয়া উচিত। আর তা এ (পার্থিব সম্পদ) হতে বহুগুণ উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।" *(সূরা ইউনুস ৫৮ আয়াত)*

"বল, আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্তরূপে পাবে। জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" *(সূরা যুমার ১৫ আয়াত)* অর্থাৎ, দুনিয়ার কোন ক্ষতি আসলে ক্ষতি নয়। আসল ক্ষতি হল পরকালের, যেখানে মানুষ বেহেশ্ত্ থেকে বঞ্চিত হয়ে দোযখে যাবে। আর যারা এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে, তারাই হবে সফলকাম ও আসল সুখী।

"যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দোযখে এইরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। --- পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা থাকবে বেহেশ্তে; তাতে তারা অনন্তকাল বাস করবে---।" *(সূরা হূদ ১০৬, ১০৮ আয়াত)*

দুনিয়া মুমিনের আখেরাতের চাষখেত। ফসল তুলবে আখেরাতে। দুনিয়ায় মুমিন সুখী হলেও আসলে দুনিয়া তার জন্য জেলখানার মত। যেহেতু প্রকৃত সুখ দুনিয়াতে নেই। সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এখানে পাওয়া যায় না। মুমিন যত বড়ই সুখী হোক, বেহেশ্তের তুলনায় ইহকালের জীবন তার জন্য কারাগার তুল্য। পক্ষান্তরে একজন কাফের এ দুনিয়ায় যত বড়ই দুর্ভাগা ও দুঃখী হোক, দোযখের তুলনায় ইহকালের জীবন তার জন্য বেহেশ্ত্ স্বরূপ।

মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষের জন্য রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত অশ্ব, পালিত পশু ও শস্যক্ষেত্রের মত আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ সুশোভিত (মোহনীয়)

করা হয়েছে। এ হল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই আছে উত্তম আশ্রয়। বল, আমি তোমাদেরকে এ সবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেব কি? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্ত; যার তলদেশে একাধিক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। তারা সেখানে বাস করবে অনন্তকাল। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা সঙ্গিনীগণ। আর থাকবে আল্লাহর (চির) সন্তুষ্টি।” *(সূরা আলে ইমরান ১৪-১৫ আয়াত)*

যারা পরকালের আসল সুখের সন্ধান পায়, তাদের কাছে এ দুনিয়ার সুখ অতি তুচ্ছ। আর সেই সুখ লাভের জন্য তাদের তর সয় না। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সেই জীবন পাওয়ার আশায়।

বদর যুদ্ধে বিশাল জান্নাতের বয়ান শুনে সেখানে প্রবেশ করার আশায় এক সাহাবী খেজুর খেতে খেতে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘এ খেজুরগুলো যদি খেয়ে শেষ করতে যাই, তাহলে তো তা অনেক দীর্ঘ জীবন!’ এই বলে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। *(মুসলিম)*

উহুদ যুদ্ধে আনাস বিন নাযর বললেন, আমি উহুদের অপর পাশ হতে বেহেশ্তের সুগন্ধ পাচ্ছি। এই বলে যুদ্ধে রত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। *(বুখারী)*

সুখান্বেষী বন্ধু আমার! বেহেশ্তের পরম সুখের কথা একটু মন দিয়ে শোন ঃ-

জান্নাতীর স্বাস্থ্য ঃ

জান্নাতীদের দেহ হবে আদি পিতা হযরত আদম ﷺ-এর সমতুল্য ষাট হাত দীর্ঘ। *(বুখারী ৩৩২৬, মুসলিম ২৮৪১নং)* শোভনীয় লোম ছাড়া দেহে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় লোম এবং শ্মশ্রু থাকবে না। চক্ষু হবে সুর্মাবরন। বয়স হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ। *(তিরমিযী ২৫৪৫নং)* অনন্তকাল ধরে তারা এই বয়স নিয়েই চির সুন্দর যুবক হয়ে থাকবে। *(মুসলিম ২৮৩৬নং)* সেখানে যৌন-মিলনে অধিক তৃপ্তিলাভ করবে। প্রত্যেক জান্নাতীকে একশ জন পুরুষের সমান যৌন-শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা প্রদান করা হবে। *(তিরমিযী ২৫৩৬নং)*

জান্নাতের প্রশস্ততা ঃ

জান্নাতের প্রস্থ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমান। *(কুরআন ৩/১৩৩)* সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতীকে পৃথিবীর দশগুণ পরিমাণ স্থান দেওয়া হবে। *(মুসলিম ১৮৬নং)*

জান্নাতের মহল ঃ

জান্নাতে বিভিন্ন সৌন্দর্যখচিত হিরন্ময় মহল ও কক্ষ, বহুতল বিশিষ্ট সু-উচ্চ প্রাসাদ আছে। *(কুরআন ৩৯/২০)* সে সব মহল পাশাপাশি একটি সোনার ও অপরটি চাঁদির ইঁট এবং মধ্যখানে সংযোজক মিস্‌ক দ্বারা নির্মিত। *(তিরমিযী ২৫২৬, মুসনাদ আহমাদ ২/৩০৫)*

জান্নাতের তাঁবু ও আরামের ব্যবস্থা ঃ

জান্নাতে একটি মুক্তানির্মিত তাঁবু আছে। যার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। *(মুসলিম ২৮৩৮নং)* জান্নাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশ। *(কুরআন ৫৫/৫৪)* স্বর্ণখচিত আসন, *(কুরআন ৫৬/১৫)* উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। *(কুরআন ৮৮/১৩-১৬)*

জান্নাতের গাছ-পালা ঃ

জান্নাতের উদ্যান ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। *(কুরআন ৫৬/৪৮)* সেখানে থাকবে কন্টকহীন বদরীবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা ও সম্প্রসারিত ছায়া। *(কুরআন ৫৬/২৮-৩০)*

জান্নাতে এমন এক সুবৃহৎ বৃক্ষ আছে যার নিচে আরোহী একশত বৎসর চললেও তার ছায়ার সমাপ্তি হবে না। *(বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭নং)*

জান্নাতের ফল-মূল ঃ

নাম এক হলেও দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে জান্নাতের কোন জিনিসের কোন মিল নেই, কোন তুলনাই নেই। *(কুরআন ২/২৫, তফসীর ইবনে কাষীর ১/৬২-৬৩)*

জান্নাতের নদীসমূহ ঃ

জান্নাতের মাটি জাফরান। তার নিম্নদেশে চারটি নহর প্রবাহিত। নির্মল পানির নহর, দুগ্ধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুস্বাদু সুধার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। *(কুরআন ৪৭/১৫)* জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। *(কুরআন ৫৬/১৯)*

জান্নাতীর পানাহার ঃ

বেহেশ্তের খাবার পর্যাপ্ত পছন্দমত ফল-মূল, ইপ্সিত পাখির মাংস। *(কুরআন ৫৬/২০-২১)*

সেখানে প্রত্যেক ফল দু'-প্রকার থাকবে। *(কুরআন ৫৫/৫২)* রকমারি ফলের বৃক্ষে ফল ঝুলে থাকবে। *(কুরআন ৫৫/৫৪)* যা সম্পূর্ণরূপে জান্নাতীদের আয়ত্তাধীন করা হবে। *(কুরআন ৬৯/২৩, ৭৬/১৪)* জান্নাতীগণ বসে বা শয়ন করেও ফল তুলে খেতে পারবে।

জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে একপ্রকার মাছের কলিজা দ্বারা। *(বুখারী ৩৩২৯, মুসলিম ৩১৫নং)*

জান্নাতের সুগন্ধি ঃ

জান্নাত সুগন্ধিতে এত ভরপুর হবে যে, তার সুগন্ধ ৫০০ বছরের দূরবর্তী পথ থেকেও পাওয়া যাবে। *(ত্বাবারানী)*

জান্নাতীর প্রয়োজন ঃ

জান্নাতীদের কোন কফ-থুথু নেই। জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। *(মুসলিম ২৮৩৫নং)*

জান্নাতী জীবন এক চিরস্থায়ী বিলাসরাজ্য। যেখানে কোন দুঃখ-দুর্দশা নেই। কোন দুশ্চিন্তা, ক্লেস ও ক্লান্তির স্পর্শ নেই। *(কুরআন ৪৪/৫৬)* চিরসুখ ও আনন্দোপভোগের স্থান জান্নাত। সেখানে আর মৃত্যু নেই। সেখানে নিদ্রাও নেই। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৮৭নং)* সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ মুমিন তার সঙ্গিনীদের সহিত তথায় ইচ্ছাসুখে অফুরন্ত মহানন্দে অনন্তকাল বাস করবে।

সেখানে কোন কর্মব্যস্ততা কিংবা কোন পালনীয় ইবাদত-বন্দেগী থাকবে না। শ্বাসক্রিয়ার ন্যায় সদা তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) তাদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তাদের পরষ্পরের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। শান্তিবাক্য ছাড়া তারা কোন অসন্তোষজনক বা অসার বাক্য শুনবে না। *(কুরআন ১০/১০, ৫৬/১৪-২৬, মিশকাত ৫৬২০নং)*

জান্নাতীর পরিচ্ছদ ঃ

জান্নাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। *(কুরআন ২২/২৩)* তাদের বসন হবে সুক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে। *(কুরআন ৭৬/২১)* তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। *(বুখারী, মুসলিম)*

জান্নাতী স্ত্রীগণ ঃ

সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্রা সঙ্গিনী। *(কুরআন ২/২৫)* বেহেস্তী পত্নী বা হুর। তাঁদের সহিত জান্নাতীদের বিবাহ হবে। *(কুরআন ৪৪/৫৪,৫২/২০)* (অতএব তাদেরকে স্বর্গ-বেশ্যা বা স্বর্গীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভুল)। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়।

প্রত্যেক জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেস্তী স্ত্রী পাবে। সপত্নী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না। *(কুরআন ৭/৪৩, ১৫/৪৭)* পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহেস্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্নীর খিদমত করবে।

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, মাসিক স্রাব ইত্যাদি কিছু থাকবে না। *(বুখারী ৩৩২৭, মুসলিম ২৮৩৫)* স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। *(তিরমিযী ২৫৬৩, মুসলিম ৩/৮০ দারেমী)*

বেহেস্তী হুর। লজ্জা-বিনম্র, আয়তলোচনা তন্বীগণ; সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। *(কুরআন ৩৭/৪৮-৪৯)* সে আয়ত নয়না তরুনীগণ -যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি। *(কুরআন ৫৫/৫৬, ৫৮)* বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। *(মুসলিম ২৮৩৪নং)*

সম্ভ্রান্তা শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা *(কুরআন ৫৬/৩৪-৩৭)* এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী। *(কুরআন ৭৭/৩৩)* সেই বেহেশ্তবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন তরুণী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। অনন্ত যৌবনা -এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মূল্যবান। *(বুখারী ৬৫৬৮নং)*

জান্নাতের খাদেম ঃ

সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর (গিলমান)রা স্বর্ণনির্মিত পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পাত্র নিয়ে জান্নাতীদের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকবে। *(কুরআন ৫৬/১৭। ৪৩/৭১, ৭৬/১৯, ৫২/২৪)*

জান্নাতীর চরিত্র ঃ

জান্নাতীদের মাঝে আপোসে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সকলেই ভাই-ভাই হয়ে সেখানে বসবাস করবে। *(সূরা হিজ্‌র ৪৭ আয়াত)* তাদের সকলের হৃদয়-মন একটি মানুষের হৃদয়-মনের মত হবে। *(বুখারী)*

জান্নাতের বাজার ঃ

জান্নাতীগণ তো এমনিতেই শোভা, সৌন্দর্য ও সৌরভের রাজা। তা সত্ত্বেও যখন তারা জান্নাতের বাজারে প্রতি শুক্রবার বিহারে (ভ্রমণে) যাবে, তখন এক প্রকার সুবাসিত উত্তরী বাতাস চলবে। যাতে তাদের মুখমন্ডল ও পোশাকাদি সুরভিত হয়ে উঠবে এবং তাদের অধিক সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। অতঃপর তারা যখন স্ব-স্ব বাসস্থানে স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসবে, তখন দেখবে তাদেরও রূপ-লাবণ্য অধিকরূপে বৃদ্ধি হয়েছে। *(মুসলিম ২৮৩৩নং)*

জান্নাতের সুখ অকল্পনীয় ঃ

সেখানকার সব কিছুই ভোগ-বিলাস ও অতুল সুখ-সম্ভোগের উপকরণ। সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় এমন সমস্ত কিছু। সেখানে কারো কোন বস্তুর প্রতি আশা, আকাঙ্খা, বা অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকবে না। *(কুরআন ৪৩/৭১, ৭৬/২০, ৪১/৩১, বুখারী ৭৫১৯, মিশকাত ৫৬৪৮)*

জান্নাত এমন সৌন্দর্যময় বাসস্থান; যার নিয়ামত কোনদিন কোন চক্ষু দর্শন করেনি, যার কথা কোন কর্ণও শ্রবণ করেনি এবং কারো ধারণায়ও আসেনি। 'যত তুমি ভাবতে পারো, তার চেয়ে সে অনেক আরো' সৌন্দর্য ও শ্রীতে ভরা। কারো কল্পনা ও খেয়ালে সে সৌন্দর্য কোন দিন অঙ্কিত হয়নি এবং হবেও না। *(কুরআন ৩২/১৭, মুসলিম ২৮২৪, বুখারী ৭৪৯৮)*

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন। *(সূরা ফুসসিলাত ৩১-৩২ আয়াত)*

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ ঃ

এ সমস্ত সম্পদ অপেক্ষাও এক বৃহত্তর সম্পদ রয়েছে বেহেশ্তীদের জন্য; মহান প্রতিপালক রব্বুল ইযযাত অল-জালালের চেহারা করীম দর্শনের তৃপ্তি ও সৌভাগ্যলাভ। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ পাক জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, "আরো অধিক (উত্তম সম্পদ) এমন কিছু চাও, যা আমি তোমাদের প্রদান করব।" তারা বলবে, 'আপনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছেন, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন। (এর চেয়ে আবার উত্তম কি চাই প্রভু?)' ইত্যবসরে (ঊর্ধ্বদিকে) জ্যোতির যবনিকা উন্মোচিত হবে। তখন জান্নাতীরা সকলে আল্লাহর চেহারার প্রতি (নির্নিমেষ) দৃষ্টিপাত করবে। (তাতে

তাদের নিকট অন্যান্য সব কিছু অবহেলিত হবে) এবং সেই দর্শন সুখই হবে জান্নাতীদের সর্বোৎকৃষ্ট মনোনীত সম্পদ। *(কুরআন ৫০/৩৫,৭৫/২২-২৩, ১০/২৬, মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৩২)* আর এক উত্তম সম্পদ যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর চির সন্তুষ্ট হবেন। কোন কালে আর অসন্তুষ্ট হবেন না। *(মুসলিম ২৮২৯নং)*

এবার বল তো কোন্ সুখ তোমার বাঞ্ছিত? ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী? কিঞ্চিৎকর না অকিঞ্চিৎকর? আবিল না অনাবিল? আর কোন্ সুখের জন্য তোমার আয়ু বেশী ক্ষয় হওয়া উচিত?

সুখের প্রতিবন্ধকতা

সুখের যেমন প্রস্তুতি আছে, সুখী জীবন গড়ার যেমন অনেক সহায়ক বিষয় ও কর্ম আছে, তেমনি তাতে বাধাদানকারীও অনেক বিষয় ও কর্ম আছে। সেই সকল প্রতিবন্ধক উপেক্ষা ও বর্জন করে যারা চলতে পারবে, তারাই হবে সুখের অধিকারী। এস, আগামীতে আমরা সেই সব প্রতিবন্ধক বিষয় ও কর্মের কথাই আলোচনা করি।

পাপাচরণ

সাপের কামড়ে যেমন মানুষের স্বস্তি চলে যায়, তাকে মরণের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনিই পাপের কামড়েও মানুষের সুখ চলে যায়, বরং তাকে দুঃখ পেতে হয়, শাস্তি পেতে হয়। পাপের লেশ যেখানে, সুখের শেষ সেখানে।

'যে করে পাপ সে সাত বেটার বাপ, যে করে ধম্ম, তার কাঁদতে যায় জম্ম।' -এ বাস্তব কথাটি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হলেও সবক্ষেত্রে সত্য নয়। পাপী পাপাচরণের সময় সাময়িক সুখ উপভোগ করে থাকে। কিন্তু কিছু পরে সুখ ও তৃপ্তি চলে যায়। তখন বাকী থেকে যায় পাপ ও তার প্রতিক্রিয়া, লাঞ্ছনা এবং সর্বশেষে দোযখের আগুন। আর সেই খুশীর জন্য কোন স্বাগতম নয়, যার পশ্চাতে রয়েছে কষ্ট। সেই সুখে উন্মত্ত হয়ে কি লাভ, যার পর দুঃখের অন্ধকার আসে? কষ্টের পর যদি সুখ লাভ হয়, তবে সেটাই হল কাম্য।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! সওয়াবের কাজ না করতে পারলেও পাপ যেন করো না। কারণ, পুণ্যের কাজ করে সুখ নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও অন্ততঃ পাপ করে অশান্তি ভোগা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। হযরত আলী ﷺ বলেন, পুণ্য অর্জন করা অপেক্ষা পাপ বর্জন করা অনেক ভালো।

পাপ গোপনে কর অথবা প্রকাশ্যে তোমার রব সর্বদ্রষ্টা সদাজাগ্রত। আর মানুষ যত গোপনেই পাপ করুক না কেন, তার শাস্তি সে প্রকাশ্যেই পায়। অন্য দিকে পাপ যত গোপন করা যায়, সে ততই বেড়ে চলে। পাপী লোক-সমাজে গুপ্ত হতে চায়। প্রতিটি মানুষ চাঁদের মত, যার একটা অন্ধকার দিক আছে; যেই দিক সে কাউকে দেখাতে চায় না। কিন্তু 'যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে।' এক সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে লোক-সমাজে। আর তখনই সে হয় লজ্জিত, অপমানিত ও দন্ডিত। এ ছাড়া পাপের রয়েছে নানান পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।

পাপের প্রতিক্রিয়া ঃ-

পাপ মনে ভয় হয়। পাপী সর্বদা মনের ভিতর অশান্তি ভোগ করে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ। পাপী ভয় করে লোকসম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়াকে। পাপী ভয় করে শাস্তিকে। পাপ করলে ভুগতে হয়। অপরাধীর বিবেক সর্বদাই আতঙ্কের শিকার থাকে। তার সাহস বলতে কিছুই থাকে না।

বলাই বাহুল্য যে, মাদকদ্রব্য সেবনে, চুরি-চামারিতে, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায়, ব্যভিচার ও হস্তমৈথুন প্রভৃতি পাপে সুখ উৎসন্নে যায়।

পাপের কুফল স্বরূপ আমাদের মাঝে তার কারেন্ট শাস্তি আসে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, মহামারি ও দাঙ্গা-যুদ্ধ প্রভৃতি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় এবং যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। *(সূরা রূম ৪১ আয়াত)*

﴿ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُواْۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ ٥١ ﴾

অর্থাৎ, ওরা ওদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করেছে, আর ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে তারাও তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে এবং আল্লাহর শাস্তি ব্যাহত করতে পারবে না। *(সূরা যুমার ৫১ আয়াত)*

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের স্বকৃত কর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মাফ করে দেন। *(সূরা শূরা ৩০ আয়াত)*

পূর্ববর্তী বহু জাতির ধ্বংসের কারণ যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে জানতে পারব যে, তারা সকলেই তাদের পাপ ও অবাধ্যাচরণের ফলেই ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٤٠ ﴾

অর্থাৎ, ওদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; ওদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, কাকেও আঘাত করেছে মহাগর্জন, কাকেও আমি প্রোথিত করেছি ভূগর্ভে এবং কাকেও করেছি পানিতে নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুলম করেননি; আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল। *(সূরা আনকাবূত ৪০)*

পাপের কারণে মানুষের হৃদয় কালো হয়ে যায়। আর হৃদয় কালো হলে মানুষ সঠিক পথ পায় না। ভালো-মন্দের বিবেক নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী পাপ আরো তুচ্ছ হয়ে যায়। পাপাচরণে উন্নাসিকতা আসে। ফলে পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর ভালো কাজ করার

তওফীক লাভ করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

অর্থাৎ, কক্ষনো না। ওদের কৃতকর্মই ওদের হৃদয়ে জং (মরিচা) ধরিয়েছে। *(সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ১৪ আয়াত)*

পাপী সমাজের চোখে ঘৃণ্য হয়। পাপের কারণে মানুষ চিরলাঞ্ছিত হয়। অপমানিত হয় ইহ-পরকালে। পাপের বিভিন্ন শাস্তি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, পৃথিবীতে এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। *(সূরা মাইদাহ ৩৩ আয়াত)*

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾

অর্থাৎ, যারা অপরাধী তাদের উপর আল্লাহর নিকট থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি আপতিত হবে। *(সূরা আনআম ১২৪ আয়াত)*

পাপের কারণে মানুষ ইল্‌ম ও রুযী থেকে বঞ্চিত হয়।

পাপে দুশমন হাসে।

পাপীর লজ্জা থাকে না।

পাপী অভিশপ্ত।

পাপী ফিরিশ্তা ও মহানবী ﷺ-এর দুআ থেকে বঞ্চিত।

পাপী আল্লাহর সুদৃষ্টি, সাহায্য ও হিফাযত থেকে বঞ্চিত হয় এবং সে শয়তানের তাবেদার সওয়ারী হয়ে যায়।

পাপী অনেক সময় (পাপরত অবস্থায়) ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

পাপরত অবস্থায় পাপীর দুআ কবুল হয় না।

পাপে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়।

পাপে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষয় হয়।

পাপে মানুষের অর্থ-সম্পদ নষ্ট হয়।

পাপ অপর পাপকে আকর্ষণ করে।

পাপে এমন ত্রুটি সৃষ্টি হয়, যা বংশানুক্রমে অনেক বংশধরকেই বহন করতে হয়।

পাপের প্রভাব অনেক সময় পরিবারের উপর পড়ে থাকে। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, আমি কোন সময় পাপ করে ফেললে, তার প্রতিক্রিয়া আমার সওয়ারী ও ক্রীতদাসীর চরিত্রে লক্ষ্য করি।

পাপের ফলে আল্লাহ বান্দার নিকট থেকে দেওয়া নিয়ামত ছিনিয়ে নেন। নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা-ধনবত্তা, মান-ইজ্জত সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বলেন,

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এমন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে অনায়াসে জীবিকা আসত, অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির আস্বাদ গ্রহণ করালেন। *(সূরা নাহল ১১২ আয়াত)*

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, এ জন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করে, তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের যে সম্পদ দান করেন তিনি তা পরিবর্তন করবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা আনফাল ৫৩ আয়াত)*

পাপের কারণে পাপীর জীবন সংকীর্ণ হয়ে যায়। সুখের সর্বপ্রকার সামগ্রী থাকতেও মনে হয় তার যেন কিছুই নেই।

পাপের কারণে পাপীর দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের বর্কত চলে যায়।

পাপ সাধারণতঃ তিনটি কারণে ঘটে থাকে; অমূলক বিশ্বাস, শক্তি এবং কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ পাপ করে থাকে।

পাপ কখনো কর্তব্য পালন না করে ঘটে। আবার কখনো অকর্তব্য করে বসার ফলে হয়ে থাকে। আর উভয় প্রকার পাপ কখনো প্রকাশ্যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ঘটে। কখনো ঘটে মনের ভিতরে গোপনে।

আবার এই পাপ হয় কখনো আল্লাহর হক নষ্ট করে। কখনো হয় বান্দার হক নষ্ট করে।

যেমন পাপাচরণে মানুষ কখনো সমকক্ষতায় অংশী করে বসে, কখনো বা সে তাতে শয়তানের ভূমিকা পালন করে, কখনো পালন করে হিংস্র জন্তুর ভূমিকা, আবার কখনো করে নিছক পশুবৎ আচরণ।

তদনুরূপ পাপরাশির স্তর অনুযায়ী সব পাপ সমান নয়। কিছু আছে অতি মহাপাপ, কিছু হল মহাপাপ এবং বাকী হল উপপাপ বা লঘুপাপ।

কিন্তু পাপ যেমনই হোক, তা পাপই। বেলাল বিন সা'দ বলেন, তুমি যে পাপ করছ, তার ক্ষুদ্রতা দেখো না। বরং যার অবাধ্যতা করে পাপ করছ, তার বিশালতা দেখ!

আর পাপ করলেও ঠিক তত পরিমাণের পাপ কর যত পরিমাণের শাস্তি তুমি কাল সহ্য করতে পারবে।

শেখ সা'দী বলেন, পাপ যত ছোটই হোক তা খারাপ। আলেমের পক্ষে পাপ অধিক অশোভনীয় এবং অধিক সাম্ভাব্যও। কারণ, ইল্‌ম শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার। তাই শয়তান চেষ্টা করে, যার হাতে হাতিয়ার তাকেই প্রথমে প্রতিহত করা।

পাপ থেকে বড় পাপ ঃ

পাপ করা অবস্থায় ডাইনে-বামে কিরামান কাতেবীন ফিরিশ্তাদ্বয়কে লজ্জা না করা ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপ করে খোশ থাকা, আল্লাহর শাস্তি থেকে বেপরোয়া হওয়া ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপ করতে পেরে আনন্দিত হওয়া ও নিজেকে সাফল্যমন্ডিত মনে করা ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপ না করতে পেরে পস্তানো এবং তাতে দুঃখিত হওয়া ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপ করে গর্ব করা ও তা প্রকাশ ও প্রচার করা ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

যে পাপ করে, সে সাধারণ মানব। যে পাপ করে অনুতাপ করে, সে সাধু ব্যক্তি। আর যে পাপের বড়াই করে, সে শয়তান।

পাপ করার সময় দরজা-জানালা বা আর কিছুর শব্দে ভয় পাওয়া অথচ আল্লাহকে ভয় না পাওয়া ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপ করা অবস্থায় আল্লাহর দৃষ্টি তার প্রতি জেনেও হৃদয় বিচলিত না হওয়া ঐ পাপ থেকে বড় পাপ।

পাপের ফুলশয্যায় সুনিদ্রিত বন্ধু আমার! যত পরিমাণের শাস্তি ভোগ করতে তুমি সক্ষম ঠিক তত পরিমাণের পাপ কর। এমন জায়গায় পাপ কর যেখানে তোমাকে তোমার প্রতিপালক দেখতে পান না। পাপে থেকে আল্লাহর ক্ষমার আশায় ধোকায় জীবন কাটিও না। একটি পাপের কারণেই ইবলীস অভিশপ্ত, বিতাড়িত ও জাহান্নামী হয়েছে। একটি পাপের কারণেই আমাদের পিতা আদমকে সুখের রাজ্য বেহেশ্ত্ থেকে বের করে এ দুঃখের দুনিয়ার নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যভিচারের মত একটি পাপের কারণেই ব্যভিচারীকে হত্যা করা হয়। মদ্যপান বা অপবাদের মত একটি পাপের কারণেই পাপীকে কশাঘাত খেতে হয়। মাত্র তিন দিরহাম পরিমাণ অর্থ চুরি করার জন্য চোরের হাত কাটা যায়।

একটি বিড়াল বেঁধে রেখে খেতে না দিয়ে হত্যা করার জন্য এক মহিলাকে দোযখ যেতে হয়েছে। একটি কথার জন্য কোন কোন মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম দূরবর্তী জায়গা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

একটি সৎলোক ষাট বছর ধরে ভালো কাজ করে মরণের পূর্বমুহূর্তে অসিয়তে অন্যায় কিছু লিখে গেলে তাকে দোযখে যেতে হয়। জীবনের শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কিন্তু শেষ মন্দ হলে সবই মন্দ।

ঐ দেখ না, চার রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরার পূর্বে তোমার হাওয়া বের হয়ে গেলে পুরো নামাযটাই বাতিল হয়ে যায়। সারা দিন রোযা রেখে ইফতারীর সময় হওয়ার ২/১ মিনিট পূর্বে ইফতার করে নিলে তোমার রোযা বাতিল গণ্য হয়।

তুমি কি তোমার এত পাপ নিয়ে ইহ-পরকালে সুখের আশা কর? এত সামান্য পরিমাণ ঈমান নিয়ে পরিত্রাণের আশা রাখ? ভেজাল-মার্কা আমল নিয়ে হিসাবে তরে যাওয়ার আশা পোষণ কর? হৃদয় অনুপস্থিত রেখে ইবাদত করে তা নিয়ে তরে যাওয়া সহজ ভাব?

উদাসীন বন্ধু আমার! এখনো সময় আছে; ঘুম থেকে জাগো। সুখের রঙ-তামাশা ছেড়ে আসল সুখের জন্য সুপথে এসে নিজেকে পবিত্র কর।

'পরিত্রাণ ও সুখ চাও চল না তার পথে,
পানির জাহাজ তো বন্ধু চলে না ডাঙ্গাতে।'

রিপুর তাড়না

রিপু মানে শত্রু। মানব-মনে মানবেরই ছয়টি এমন শত্রু আছে, যারা তাকে উন্নতির পথে, সৎচরিত্রতার পথে এবং সুখের পথে বাধা দেয়। শত্রুর মত মানুষের মনে অশান্তি সৃষ্টি করে। এই জন্যই এদেরকে ষড়্‌রিপু বলা হয়।

রিপুর তাড়নায় মানুষ অশান্তি পায়, সুখ হারায়। রিপুকে দমন না করতে পারলে মানুষ পূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

পশু অবাধ্য হলেও মানুষের বুকে এই রিপু ও প্রবৃত্তি বড় অবাধ্য ও অদম্য। বলা বাহুল্য, এই পশুর নাকে যে লাগাম দিতে পারবে, সেই হবে বিজয়ী সুখী মানুষ। রিপুর তাড়না থেকে যে মানুষ মুক্ত সেই মানুষই প্রকৃত শান্তিময় মানুষ। আসলে ষড়্‌রিপু জয়ী বিশ্ববিজয়ী। প্রকৃত শক্তিমান (বলবান) সেই, যে নিজের প্রবৃত্তি বা রিপুকে দমন করতে পারে।

মানুষের মধ্যে রয়েছে হিংস্র জন্তুর স্বভাব, পশুর স্বভাব এবং শয়তানের স্বভাব। এই তিন স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও রিপু গঠিত। আর বল বন্ধু! যার বুকে হিংস্র জন্তু, পশু ও শয়তানের আস্তাবল আছে সে কি সুখের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে?

যে প্রবৃত্তির (রিপুর) পূজারী নয়, সেই প্রকৃত স্বাধীন মানুষ। এ দুনিয়ায় যে রিপুকে দমন করে সে পরাধীন নয়। আর যে রিপুর বাসনা অনুযায়ী চলে সে নিজেকে স্বাধীন মনে করলেও, আসলে সে কিন্তু রিপুর দাস। স্বাধীনতা মানে এই নয় যে, তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে, যা ইচ্ছা তাই বলবে। এ ধরনের স্বাধীনতা কেবল পশু, শিশু ও পাগলদেরই আছে। আসলে আল্লাহর নির্দেশিত জীবন-ব্যবস্থা বিনা বাধায় বাস্তবায়ন করতে পারার নামই হল আসল স্বাধীনতা।

মানুষের অশান্তি ও অনিষ্টের মূল হল ৩টি; অহংকার, হিংসা ও লোভ। অহংকার ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল, ফলে সে আদমকে সিজদা করেনি, লোভ আদমকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং হিংসা কাবিলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল; ফলে সে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল।

৩টি জিনিসকে হিফাযত করা জরুরী; দ্বীন, দেশ ও ভ্রাতৃত্ব। আর ৩টি জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী; জিভ, রাগ ও প্রবৃত্তি। তিনটি কর্ম মানুষের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করে; কার্পণ্য, লোভ ও ক্রোধ। আর এ হল মানুষের এক একটি রিপু।

প্রবৃত্তির দমন ছাড়া শান্তি কোথায়? আরাম কোথায়? সেখানে শান্তি নেই; যেখানে মানুষ মানুষকে করে ঘৃণা, একজন আর একজনের মাথায় দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে চায়, যে পরিবেশ অর্থের অহংকারে দিবানিশি মত্ত, যেখানে দীন-দরিদ্র মানুষ পশুর চেয়েও অধম, যেখানে গরীবের মাথার ঘাম দ্বারা ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মেতে থাকে। সে পরিবেশ, সে রাজপুরী যতই সুখেরই হোক তবুও বলতে পার, না, সেখানে শান্তি নেই।

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের জন্য যে জিনিস সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল, তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।" *(আহমাদ ৪/৪২০, ৪২৩)*

কাম বা সম্ভোগ-লালসা

যুবকের যৌন-জ্বালা, যৌন-চিন্তা, সম্ভোগেচ্ছা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা একটি কষ্টকর ব্যাপার। এমন জ্বালা, চিন্তা, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে বড় অশান্তি সৃষ্টি করে।

মনে এই শ্রেণীর মন্দ কল্পনা এলে তা দূর করে ফেলা উচিত। যদি তা না করা হয়, তাহলে তা চিন্তায় পরিণত হয়। চিন্তাকে মনে স্থান দিলে কামনা ও বাসনায় পরিণত হয়। এই কামনাকে নিবৃত্ত না করলে দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হয়। এই পরিকল্পনাকেও প্রতিহত না করলে তা কর্মে পরিণত হয়। এই কর্মকেও ব্যাহত করতে হয়, নচেৎ তা অভ্যাসে পরিণত হয়। আর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে তা আর বর্জন করতে পারে না কেউ। *(আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়েম)*

যদি তোমার বিবাহ হয়ে থাকে, তাহলে কাম দমন করা কঠিন নয়। অবশ্য ভোগের নিশায় স্বাস্থ্য হারানো, দূরে থাকলে কর্তব্য ফেলে কামজ্বরে অস্থির হয়ে স্ত্রীর কাছে ছুটে আসা, পড়াশোনায় থাকলে তার ক্ষতি করে স্ত্রীর প্রেমকোলে আশ্রয় নেওয়া, অর্থ নষ্ট করে প্রেয়সীর আঁচলে আশ্রয় নেওয়া কোন সচেতন মুসলিম যুবকের উচিত নয়।

এ সময়ে ধৈর্য হল বড় ওষুধ। কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে কিছু কষ্ট তো বরণ করতেই হয়। কোন কল্যাণের খাতিরে যদি স্ত্রী ছেড়ে দূরে প্রবাসে থাকতেই হয়, তাহলে ধৈর্য ছাড়া আর উপায় কি বন্ধু?

কিন্তু তুমি যদি অবিবাহিত হও, তাহলে তোমার জন্য বড় ওষুধ হল বিবাহ। তা সম্ভব না হলে ধৈর্য। আর তাতে সাহায্য নিতে নবীজীর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোযা গ্রহণ কর। ইন শাআল্লাহ তোমার যৌনজ্বালা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হবে।

যে কোন প্রকারে হোক ইন্দ্রিয়জ্বালা দমন কর। মনের শান্তি পেতে বৈধ পথে তার উপশম খোঁজ। মন থেকে নারীর নেশা দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাও। খবরদার! কক্ষনো যেন অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারের পথে পা না বাড়ে। অগ্রসর না হও কৃত্রিম কোন মৈথুন, সমকাম প্রভৃতি যৌনাচারের দিকে। নচেৎ সে সবে সাময়িক সুখ থাকলেও পরক্ষণে মনের বড় অশান্তি তোমাকে দগ্ধ করবে। অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে পাঁকে হাতি পড়ার মত তোমার অবস্থা হবে; উঠতেও পারবে না, স্বস্তিও পাবে না। বরং আরো অধিকরূপে তলিয়ে যাবে।

যৌন-জীবনের বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পড়ো না, সিনেমা বা ফিল্ম্ দর্শন করো না, যেখানে অর্ধনগ্ন নির্লজ্জ নারী নজরে আসে, সেখানে বেড়াতে যেও না, একাকী থেকো না, তাহলে অনেক শান্তি পাবে। (এ ব্যাপারে আরো জানতে 'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান' দ্রষ্টব্য)

রাগ ও ক্রোধ

মানুষের মাঝে ক্রোধ হল সুখহরি একটি রিপু। আসলে ক্রোধ বা রাগ হল আগুনের এক প্রকার শিখা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। যেহেতু শয়তানও আগুন থেকে সৃষ্ট।

মানুষ হল মাটির তৈরী। আর মাটির প্রকৃতি হল শান্ত ও গম্ভীর। পক্ষান্তরে আগুনের প্রকৃতি হল জ্বালাময়, সর্বনাশী ও উর্ধ্বগামী।

মানুষের রাগ হলে মনে শান্তি পায় না। বরং অশান্তি সৃষ্টি করে অপরের জন্য। ক্রোধে মানুষ দিগ্‌বিদিগ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রোষানলে দগ্ধ হয়ে কত শত ক্ষতি করে বসে নিজের। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে। কোপে উত্তপ্ত হয়ে সামান্য জিনিসকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে মারামারি হয়, কোর্ট-কাছারি হয়, অর্থ ব্যয় হয়। ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ স্ত্রীকে মারধর করে, তালাক দিয়ে বসে। নিজের সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে বিকলাঙ্গ করে বসে। আর অবস্থা বিশেষে মানুষও হিংস্র জন্তু মাত্র।

মানুষ যখন খুব রেগে যায়, তখন তার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। মনে থাকে না তার নিজের আত্মসম্মানের কথা, ধর্মের কথা। তাই সে তখন কারো খাতির রাখতে চায় না। এমন কি যদি তলোয়ার হাতে করে থাকে এবং তার কামনা সিদ্ধি করতে পারে না, সেই সময় রাগ চরমে উঠে গিয়ে তাকে অধীর করে ফেলে। ফলে দৈবাৎক্রমে একটি মাছি নাকে বসলে, মাছিটিকে তলোয়ার দ্বারা কাটতে উদ্যত হলে নিজের নাক কেটে বসে!

ক্রোধ আত্মপর মর্যাদা বিস্মৃত করে এবং যাবতীয় উপকার সমাধিস্থ করে। অনেক সময় পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি অসমীচীন আচরণ করে বসে ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তি।

আসলে রাগ বোকামি থেকে উৎপত্তি হয়, কিন্তু অনুতাপে শেষ হয়। ক্রোধের প্রথমটা পাগলামি এবং শেষটা লাঞ্ছনা। ক্রোধ দূর হলে অনুতাপ আসে।

সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি সেই, যে তার গুপ্ত ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। আর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হল সেই, যে তার ক্রোধ দমন করতে পারে। মহানবী ﷺ বলেন, "শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুস্তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ২৬০৯, মিশকাত ৫১০৫নং)*

রাগ হলেও রাগ সংবরণ করার মাহাত্ম্য আছে ইসলামে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহ্বান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (বেহেশতের) সুনয়না হুরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ৩৯৯৭ নং)*

যে মানুষের রাগ নেই, সে মানুষ অনেক অশান্তি থেকে বাঁচতে পারে। রাগের পর নামায হয় না ঠিকমত। রাগের কথা নিয়ে মনের ভিতরে আলোচনা করতে করতে ঘুম আসে না রাতে। অথচ যে রাগে না সে আরামসে ঘুমায়। যে মানুষ কোন কথায় রাগে, সে মানুষকে নিয়ে লোকে ব্যঙ্গ করে। যে রাগে তাকে লোকে রাগায়ও বেশী। আর তাতে তার মনে দুঃখ অবশ্যই হয়। এই কারণেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খাস অসিয়ত হল, 'রেগো না।'

এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে অসিয়ত চাইলে তিনি তাকে বললেন, "তুমি রাগ করো না।" সে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অসিয়ত চাইলে তিনি তাকে ঐ একই অসিয়ত করেন। *(বুখারী)*

রাগের সময় শয়তান মানুষকে কাবুতে পায়। এই সময় সে তার জ্ঞান ও বিবেক নিয়ে ঠিক সেই রকম খেলা খেলে, যে রকম ছোট বাচ্চারা খেলে বল নিয়ে। এই জন্য এ সময়ে শয়তান থেকে পানাহ চাইলে রাগ প্রশমিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমার অভ্যাস বানাও, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯-২০০ আয়াত)*

একদা মহানবী ﷺ-এর কাছে দুই ব্যক্তি গালাগালি করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে; আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।"

লোকটি বলে উঠল, 'আপনি আমাকে কি পাগল মনে করেন?' তা শুনে তিনি ঐ আয়াত পাঠ করেন,

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ ﴾

(হাকেম ২/৪৭৮)

মহান আল্লাহর "উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর" -এই বাণীর ব্যাখ্যাতে ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, অর্থাৎ, রাগের সময় সবর এবং দুর্ব্যবহারের সময় ক্ষমা দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর। এতে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে। *(বুখারী)*

রাগী বন্ধু আমার! রাগে মজা নেই। মজা আছে সুস্থ ও শান্ত বিবেকে। ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতায়। অতএব রাগের মাথায় পাগ না দিয়ে, আগে থেকেই তার বাঘ বা নাগকে দমন কর। এতে তোমার লাভ আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, (ক্ষমা ও বেহেশ্ত্ প্রস্তুত রাখা আছে তাদের জন্য) যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

আলী ؓ বলেন, চারটি কাজ চার সময়ে করা বড় কঠিন; ক্রোধের সময় ক্ষমা করা, অভাবের সময় দান করা, নারী-সংস্রবে সাধুতা বজায় রাখা এবং যাকে ভয় করা হয় তাকে হক কথা বলা।

আর তার জন্যই ক্রোধের সময় ক্ষমাশীলতার রয়েছে বড় মাহাত্ম্য।

ক্রোধের সময় দেহের রক্ত শিরা-উপশিরার ভিতরে ফুটতে থাকে, শরীর কাঁপতে থাকে। অপ্রকৃতস্থ হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে দেয়। আর সেই জন্য রাগের সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যেতে এবং বসে থাকলে শুয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন দ্বীনের নবী ﷺ। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রেগে যাবে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে যায়। এতে তার রাগ দূরীভূত হলে ভাল, নচেৎ সে যেন শুয়ে যায়।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৯৪নং)*

মানুষের রাগ হলে দেমাগ চলে যায়। ঠান্ডা মাথায় যে কাজ হয়, রাগের মাথায় তার বিপরীত হতে পারে। কারো সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হলেও রাগলে প্রতিপক্ষকে সঠিক জবাব দিতে পারা যাবে না। রাগ করে কিছু ত্যাগ করলে, যে রাগ করে তার ভাগ যায়। তাতে নিজের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু হয় না।

রাগের সময় মানুষ অশ্লীল বলে। এই জন্য রাগের সময় কথা বলতে হয় না। সেই সময় ক্রোধের একমাত্র ঔষধ হল নীরবতা অবলম্বন। মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ রেগে যাবে, তখন সে যেন চুপ থাকে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৬৯৩নং)*

যে ক্রোধে ধীর, সে বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে যে চট্‌রাগী সে অজ্ঞানী। রাগের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে অথবা তার প্রতিক্রিয়া শুরু করলে পরে পস্তাতে হয়। আর এই সময় রাগের সবচেয়ে বড় প্রতিকার হল, বিলম্ব করা। স্ত্রীর নিকট থেকে কোন অপ্রীতিকর কিছু দেখলে বা শুনলে রেগে চট্ করে তালাক দেওয়া বৈধ নয়। বিবেকের সাথে বুঝে আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী পরপর; উপদেশ -বিছানা পৃথক - প্রহার - সালিসী পদ্ধতি প্রয়োগ করার পর তালাকের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নচেৎ চট্ করে না বুঝে অথবা পরের কথা শুনে দূর থেকে রাগের মাথায় তালাক দিলে অবশ্যই পরে পস্তাতে হবে।

কারো কাছ থেকে তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলেছে শুনলে তার প্রতিবাদ চট্ করে করতে যেও না অথবা তা প্রচার ও অভিযোগ করে কাউকে বলতে যেও না। ভেবে দেখ, তা সে কেন বলেছে? কোন উত্তম ব্যাখ্যা পেলে তাই করে ক্ষান্ত হয়ে যাও। নচেৎ একান্ত অপবাদ হলে প্রতিবাদ কর ঠান্ডা মাথায়। জোশ ও রোষের সাথে কিছু করলে মানুষ হুঁশ হারিয়ে বসে। ক্রোধের সময় মানুষ নির্বুদ্ধি হয়ে যায়। আর তাতে সুফল তো হয়ই না; বরং কুফল অনিবার্য।

ছুঁড়া ঢিল যেমন ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব বলা কথা ঘুরিয়ে নেওয়া। সে ক্ষেত্রে হয় তোমাকে অপমানিত হয়ে মাফ চাইতে হবে। আর না হয় ঘুরিয়ে মিথ্যা বলতে হবে। আর নিশ্চয় উভয় কর্মই ভালো নয়। অতএব রাগের মাথায় কিছু বলার আগে ভালো করে ভেবে নিও।

আবার তার থেকে বেশী অপমানকর কাজ হল রাগে কিছু লিখা। কথা তো কোন রকম দূর ব্যাখ্যা বা সুর পাল্টিয়ে বলে নিস্তার পেতে পার বিপক্ষের কাছে। কিন্তু রাগের মাথায় আবোল-তাবোল লিখে পাঠালে তা আর প্রত্যাহার করা সহজ হয় না। তাছাড়া তুমি যা লিখবে তা দলীল হয়ে যার উপর রাগ ঝাড়বে তার নিকট চিরদিন থেকে যাবে। আর স্মৃতি প্রীতির

হোক অথবা ঘৃণার, উভয়ই বড় প্রতিক্রিয়াশীল। স্মৃতি শুধু বেদনা।

আর এ সবের তাসীর তোমার তো জানাই আছে, তরবারির আঘাতের ব্যথা দেহ থেকে দূর হয়ে যায়; কিন্তু জিভের দংশন-জ্বালা হৃদয় থেকে দূর করা মুশকিল থেকে বড় মুশকিল।

রাগের মাথায় মা-বাপ ছেলের উপর বদ্দুআ করে ছেলের জীবন নষ্ট করে। কারণ মা-বাপের দুআ ছেলের হক্কে কবুল হয়ে যায়। আর এই জন্যই দয়ার নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততির উপর, তোমাদের ভৃত্যদের উপর এবং তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্দুআ করো না। যাতে আল্লাহর তরফ হতে এমন মুহূর্ত তোমাদের অনুকূল না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে কিছু প্রার্থনা করা হলে তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করা হয়।" *(সহীহুল জামে ৭ ১৪৪নং)*

ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। বিবেচনা-বোধকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। মনুষ্যত্বের আলোকশিখা নির্বাপিত করে দেয়। অন্যায় ও অত্যাচার হয়। ক্রোধ বাঘ না হলেও বাঘের চেয়ে বেশী হিংস্র হয়। আসলে 'রাগ না চন্ডাল।'

মানুষ ক্রোধান্বিত হলে চিত্তপ্রশান্তি হারায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ হারায়, বিচার-ক্ষমতা হারায়, পরিস্থিতির দখল হারায় এবং অপরের কাছে প্রায়ই মান হারায়।

ক্রোধে মানুষ অনেক সময় নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে। রাগে ভাঙ্গচুর করলে, কাপড় ছিঁড়লে নিজেরই ক্ষতি। কথায় বলে, 'ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে।'

তুমি যদি শান্তি পেতে চাও এবং অপরের কাছে ভালো হতে চাও, তাহলে কারো প্রতি কোন প্রকার ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করো না। ক্রোধ পান করার অভ্যাস বানিয়ে নাও। তোমার ভিতরে আগুন লাগলেও তার ধোঁয়া বাইরে বের হতে দিও না।

আর খবরদার তুমি সেই মানুষের মত হয়ো না, যার জন্য প্রবাদ আছে, 'নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।' 'বিষ নাই তার কুলোপানা ফনা।' অথবা 'বিষহারা ঢোঁড়া, গর্জন মুলুকজোড়া।'

রাগ ভালো নয়। তবে সাপের ফোঁশ থাকা অবশ্যই দরকার। যে মানুষের মোটেই রাগ নেই, সে মানুষও পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন মানুষ নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'রাগের কথায় যে রাগে না সে আসলে গাধা, আর রাগ মানালে যে মানে না সে আসলে শয়তান।'

আমাদের আদর্শ মহানবী ﷺ ছিলেন, তিনি প্রয়োজনে রাগ করতেন। এমনকি রাগান্বিত হলে তাঁর চেহারা বেদানার দানার মত লাল হয়ে উঠত।

মানুষ রাগের সময় ইনসাফ ভুলে যায়, অন্যায় আচরণ করে বসে, অসমীচীন ও অন্যায় কথা বলে ফেলে। তার জন্য এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ কর ঃ-

[illegible]

হে আল্লাহ ! আমি অবশ্যই ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই।

লোভ-লিপ্সা-লালসা

যে অল্পে তুষ্ট নয়, প্রয়োজনের তুলনায় যে বেশী আকাঙ্ক্ষা করে সে লোভী। লোভ হল কিছু পাবার তীব্র বাসনা, কিছু লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা ও স্পৃহা পোষণ করার নাম।

আকাঙ্ক্ষার ধন যত দুর্লভ হয়, আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ে। ভোগেরও একটা তীব্র নেশা আছে। এক পাত্র নিঃশেষ করে অবিলম্বে ভোগী আর এক পাত্রের দিকে হাত বাড়ায়। যত ভোগ করে, ভোগের বাসনা ততই বেড়ে চলে। লোভনীয় বস্তু লাভের জন্য লোভী মানুষের লোভও উৎকট হয়ে ওঠে। লাভে লোভ বাড়ে। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

'লুভল বন্ধু কচু পেয়ে, নিতুই যায় কোদাল নিয়ে।' অথচ জানা কথা যে, 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।' চালাক মাছি ধারে বসে রসগোল্লার ঝোল খায়। আর বোকা মাছি লোভে পড়ে ঝোলের মাঝে বসে সব খেতে চায়। আর তাতেই তার ধ্বংস আসে।

লোভাতুর মানুষ এক প্রকার দরিদ্র মানুষ। যে অনেক কিছু পাওয়া সত্ত্বেও আরো কিছু পাওয়ার লোভ করে, সে মহাভিখারী। তার মত দুঃখী মানুষ আর কেউ নেই।

যার মনে লোভ আছে, তার মনে শান্তি থাকতে পারে না। লোভ ও আনন্দের কোনদিন সাক্ষাৎ সম্ভব নয়; এক হৃদয়ে বাস করা তো বহু দূরের কথা।

পক্ষান্তরে গরীব হলেও যে অল্পে তুষ্ট সে আসলে সুখী মানুষ। অধিক চাইলেও যদি ভোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, তবুও মঙ্গল। কিন্তু লোভী মানুষ সর্বস্ব চায়, এমন মানুষ অনেক পেয়েও সন্তুষ্ট নয়। লোভীর অর্থাঙ্কের সংখ্যার ডান দিকে যত শূন্য বসে, তার মনের শূন্যতা তত আরো পূর্ণ হতে চায় না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয় তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।" *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯নং)*

লালসায় মানুষের অপমান থাকে। তিনটি কর্ম মানুষের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করে; কার্পণ্য, লোভ ও ক্রোধ। আর অনিষ্টের মূলও ৩টি; অহংকার, হিংসা ও লোভ। অহংকার ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল, ফলে সে আদমকে সিজদা করেনি, লোভ আদমকে জান্নাত থেকে বের করেছিল এবং হিংসা কাবিলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ফলে সে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল।

মন্দ সঞ্চার ও সঞ্চয়কারী লোভ ৬টি; বিষয়াসক্তি, নেতৃত্বলোভ, যশলোভ, উদরপরায়ণতা, নিদ্রাবিলাসিতা ও আরাম-প্রিয়তা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর খ্যাতিলোভ মানুষের অধিক বিনাশ সাধন করে।" *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০নং)*

লোভী লোভ করে অতিরিক্ত কিছু অর্জন করতে পারে না। যেহেতু রুযী বিতড়িত, লোভী বঞ্চিত, হিংসুক চিন্তিত এবং কৃপণ ঘৃণিত।

লিপ্সার কারণে মানুষ মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়। লোভী মানুষকে কেউ দুচোখে

দেখতে পারে না। যেহেতু লোভের লালা মানুষের মুখে নয়, বরং পশুর মুখেই অধিক শোভনীয়।

'বন্ধু তোমার বুকভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।'

লালসাপূর্ণ মানুষদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে থাকে। লোভে পড়ে লোভনীয় বস্তু অর্জনের পথে কোন প্রকার ন্যায়পরায়ণতা থাকে না। উমার বিন খাত্তাব বলেন, লোভের চাইতে খারাপ এমন কোন জিনিস নেই, যা বিবেকবানদেরকে বিবেকশূন্য করে দেয়।

মানুষের ক্রোধ তার জ্ঞানকে ধ্বংস করে, হিংসা তার ধর্ম ধ্বংস করে, পরনিন্দা তার পুণ্যকে ধ্বংস করে, আর লোভ তার লজ্জাকে ধ্বংস করে।

জ্ঞান যেখানে মারা পড়ে, লোভ সেখানে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। লোভ যেখানে লীলা খেলে মান সেখান থেকে বিদায় নেয়। লোভী মানুষ অপমানকে ভয় করে না। কানমলা খেলেও বলে, জুতোর বাড়ি তো খাইনি! পক্ষান্তরে নির্লোভ ব্যক্তির মাথা সর্বদা উঁচু থাকে।

হৃদয়ে লোভ স্থান পেলে মানুষ নীচ কাজ করতেও পিছপা হয় না। হীন আচরণ করতেও দ্বিধা করে না। তখন এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে।

যার কোনও লোভ নেই সে স্বাধীন। যে নিজ প্রবৃত্তি ও ইবলীসের কাছে দুর্বল নয় সেই প্রকৃত বীর। লোভী মানুষ আসলে পরাধীন, লোভের লাগাম থাকে তার চরিত্রের নাকে।

নেতৃত্ব লোভও বড় সর্বনাশী মানুষের জন্য। যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমাদের নিকট সর্বাধিক অসাধু ব্যক্তি সেই যে নেতৃত্ব চেয়ে থাকে।" *(সহীহুল জামে ১০২নং)*

"তোমরা নেতৃত্বের জন্য লোলুপ থাকবে। অথচ তা কিয়ামতে লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের বিষয় হবে। সুতরাং তা কত (ইহলোকে) উৎকৃষ্ট ও (পরলোকে) নিকৃষ্ট বিষয়!" *(বুখারী ৭১৪৮নং)*

ইউসুফের মত হাফীয ও আলীম (বিশ্বস্ত রক্ষক ও অভিজ্ঞ) তুমি হতে পারবে বন্ধু? আবূ যার্রের মত তুমি দুর্বল নও তো? নাকি তুমি তাঁর থেকেও সবল? আবূ যার্রকে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি যা পছন্দ করি নিজের জন্য। তুমি দুই জনের উপর আমীর (নেতা) হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।" *(মুসলিম ১৮২৬নং, আবূ দাউদ প্রমুখ)*

তিনি আব্দুর রহমান বিন সামুরাহকে বলেছিলেন, "তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ, চেয়ে নেতৃত্ব নিলে তোমাকে তার উপর সোপর্দ করে দেওয়া হবে। আর না চেয়ে নেতৃত্ব পেলে তার উপর তোমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং নেতৃত্ব না পেলে দায়িত্ব, দল বা জামাআত ত্যাগ করা, তার জন্য ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হওয়া, নেতৃত্বের জন্য নতুন দল সৃষ্টি করা কি তোমার জন্য বৈধ ও উচিত কাজ হতে পারে?

বল বন্ধু! লোভী হলে কি সুখী হতে পারে কেউ? মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ ﴾

অর্থাৎ, আমি ওদের (কাফেরদের) মধ্যে কাউকে কাউকে যে বিষয়-সম্পদ দিয়েছি, তুমি তার প্রতি স্বীয় চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না।---- *(সূরা কাহফ ৮৮ আয়াত)*

মোহ-মায়া-প্রেম-প্রীতি

মোহ-মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসা এ সবই দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয়। কিন্তু অতির ক্ষতি এবং অবৈধতার অপবিত্রতা এ সব কিছুকে অপবিত্র ও নষ্ট করে ফেলে। আর যখনই তা অতিরিক্ত পরিমাণে অথবা অবৈধ পদ্ধতিতে হয়, তখনই হৃদয় কষ্ট পায়। তাতে বাধা পড়লে মন পীড়িত হয়।

সংসার করতে মানা নেই। কিন্তু সংসার-প্রীতি ও বিষয়াসক্তি বেশী হলে তাতে যে ক্ষতি আছে তা স্বীকার করতে তুমি রাযী কি?

যাকে ভালোবাসবে তাকে বাস। কিন্তু সেই ভালোবাসার অতিরঞ্জনে তোমার অন্য ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত কি?

দুনিয়াকে ভালোবাস। কিন্তু অতি ভালোবাসায় তোমার মান-ইজ্জত সব যাবে, তাতে তুমি রাযী কি?

মহানবী ﷺ বলেন যে, "অদূর ভবিষ্যতে চতুর্দিকের সকল জাতি পরস্পরকে আহবান করে তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে যেমন ভোজনকারীরা ভোজনপাত্রের উপর একত্রিত হয়ে এক সাথে মিলে ভোজন করে থাকে।" কোন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "না, কিন্তু তোমরা হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। তোমাদের শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতি ত্রাস ও ভীতি তুলে নেওয়া হবে এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত হবে। আর সে দুর্বলতা হল, দুনিয়াকে ভালোবাসা ও মরণকে অপছন্দ করা।" *(আহমাদ, আবূদাঊদ, সহীহুল জামে' ৮ ১৮৩ নং)*

বিষয়াসক্তি মুসলিম জাতিকে কুহকাচ্ছন্ন করে রাখবে। ধনের মোহ ও গদীর মায়া তাকে বিজাতির কাছে দুর্বল করে রাখবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "দুটি জিনিসের জন্য বৃদ্ধের হৃদয় যুবকের মত; দুনিয়ার মহব্বত এবং দীর্ঘ আশা।" *(বুখারী)*

পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য আমাদের কাছে মৃত ছাগশিশুর মত। আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোন মূল্য থাকলে কাফের পান করার জন্য এক ঢোক পানিও পেত না।

সুখ-সন্ধানী বন্ধু আমার! কোন কিছুকে ভালোবেসো না, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তুমি কষ্ট পাবে না। আর অর্থ-লালসা হৃদয়ে রেখো না, তাহলে নিজেকে কখনো গরীব ভাববে না।

পরন্তু পার্থিব বিষয়-বিতৃষ্ণা রাখলে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং লোকেদের মাল-ধনে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলে লোকেরা ভালোবাসে।

হযরত ঈসা (আঃ)কে মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মাল-ধনে কোন মঙ্গল নেই।

বলা হল ঃ তা কেন হে আল্লাহর নবী?

বললেন ঃ কারণ, হারাম ছাড়া ধন হয় না।

বলা হল ঃ যদি হালাল হয়?

বললেন ঃ তার হক (যাকাত) আদায় হয় না।

বলা হল ঃ যদি তার হক আদায় করা হয়?

বললেন ঃ মালদার অহংকার থেকে বাঁচতে পারে না।

বলা হল ঃ যদি বাঁচতে পারে?

বললেন, মাল আল্লাহর যিক্র থেকে বিরত রাখে।

বলা হল ঃ যদি তা না রাখে?

বললেন ঃ কিছু না হলেও কিয়ামতে মালদারের হিসাব লম্বা হবে।

বস্তুতঃ ধন-পিপাসা পানি-পিপাসা থেকেও কঠিনতর। অতএব যার জীবনে এত পিপাসা সে কি সুখে জীবন-যাপন করতে পারে?

সাংসারিক মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির সুখী হওয়া তো দূরের কথা; বরং সে আফশোস নিয়ে সংসার করে। পার্থিব বিষয়াসক্ত মানুষ তিনটি আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে; তার মনের চাহিদা মোতাবেক ধন উপার্জন ও সঞ্চয় না করতে পারার আক্ষেপ, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার আক্ষেপ এবং পারলৌকিক পাথেয় অর্জন না করতে পারার আক্ষেপ। সুতরাং যার আক্ষেপে কালক্ষেপ হয়, তার কি সুখ থাকতে পারে?

পক্ষান্তরে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাজ্য নয়। ত্যাজ্য হল তার প্রতি আসক্তি।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ--।'

মুসলিমের কাছে প্রাধান্য পাবে পরকালের জীবন। ইহকালের জীবন তো পরকালের খেত স্বরূপ।

কিন্তু মাছি দুই প্রকার; এক প্রকার মাছি হল বোকা মাছি। যে রসগোল্লার পাত্রে মিষ্টি ঝোলের লোভে লোভে ঠিক মাঝখানে বসে। আর বসা মাত্রই ঝোল তার ডানায় জড়িয়ে যায়। আর কি সে সেখান থেকে উঠতে পারে?

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার মাছি হল, চালাক মাছি। এ মাছি পাত্রের কিনারায় বসে শুঁড় নামিয়ে ঝোল টানে। আর পেট ভরা মাত্র অনায়াসে উড়ে যায়।

বলা বাহুল্য, মুসলিম হল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণীভুক্ত। দুনিয়া তার নিকট গাছের ছায়ার মত। পথে পথিকের পান্থনিবাস বা মুসাফিরখানার মত।

আসলে দুনিয়া বুড়ি বেশ্যার মত। যে তার প্রলোভনে পরে সে ধোকা খায়।

গায়রুল্লাহর প্রতি আসক্তি থাকলে হৃদয় কলুষিত হয়। কাল-পাত্র ভেদে হৃদয়ের ৬টি অবস্থা আছে; জীবিত-মৃত, সুস্থ-অসুস্থ, জাগ্রত ও নিদ্রিত। তার জীবন হল হেদায়াত এবং মরণ হল ভ্রষ্টতা। সুস্থতা হল আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি আসক্তিহীনতা ও তাঁর (প্রেমের) জন্য অনাবিলতা এবং অসুস্থতা হল গায়রুল্লাহর প্রতি আসক্তি ও প্রেম। জাগরণ হল যিক্র এবং নিদ্রা হল গাফলতি ও তাঁর যিকরে ঔদাস্য।

যার হৃদয়ে আল্লাহর যিক্রের আসন আছে, সে হৃদয়ে আর কারো স্থান হতে পারে না। আর যার কাছে গায়রুল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর প্রেম আছে, সেই হল আসল প্রেমী ও আসল সুখী। একদা এক বাদশা তাঁর ক্রীতদাসীদের সামনে কতক দীনার ছুঁড়ে বললেন, যে যতটা পারে

কুড়িয়ে নিতে পারে, ততটা তার হয়ে যাবে। সকলে ছুটল, কিন্তু এক কালো কুশ্রী দাসী কুড়াতে না গিয়ে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বললেন, ওরা দীনার কুড়াতে গেল, আর তুমি গেলে না কেন? বলল, 'দীনার আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য দীনার-ওয়ালা। ওরা দীনার নিয়ে খোশ হোক। আমি খোশ দীনার-ওয়ালা নিয়ে!'

বলা বাহুল্য, বাদশা যে সেই দাসীর প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হবেন -তা অনুমেয়। আর বাদশা যদি তার হন, তাহলে দীনারের ভান্ডারের অধিকারী সে। সুতরাং জ্ঞানী তুচ্ছ দীনারের প্রেম বর্জন করে দীনার-ওয়ালার মন জয় করতে পারে। আর এতেই আছে তার পরম সুখ। দাস-দাসীর দাসত্বেই আছে চরম আনন্দ।

হৃদয় যখন আল্লাহ-প্রেম থেকে খালি হয় তখন পার্থিব নানা আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়। অনেক অবৈধ প্রেমে সে পড়তে বাধ্য হয়। নারীপ্রেম এমনই একটি প্রেম। আর যে নারীপ্রেমে ফাঁসে তার কি কোন সুখ থাকতে পারে?

'শুনতে যে পাই আমি তোমার পায়ের নুপুর-ধ্বনি তাই তো অনুক্ষণ,
তোমার পথের পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদে আমার মন।'

অবৈধ ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে কেড়ে নেয় বেশী। তাতে সাময়িক সুখ ও তৃপ্তি থাকলেও চিরসুখের আমেজ নেই।

প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মত, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ।

ভালোবাসা বসন্তের পুষ্প নয়, বরং চোখের পানি।

প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না।

প্রেমের ব্যথা দারুণ, যার কোন ঔষধ নেই।

প্রেমের আনন্দ থাকে স্বল্পক্ষণ, আর তার বেদনা থাকে সারাটি জীবন।

প্রেম-পীড়িত মানুষ সুখী নয়, বরং সে একজন দুঃখী।

'আসক্তির ছয় চিহ্ন জেনো হে তনয়!
দীর্ঘশ্বাস, ম্লানমুখ, সিক্ত অক্ষিদ্বয়।
জিজ্ঞাসিলে, অন্য তিন লক্ষণ কোথায়?
স্বল্পাহার, স্বল্পাভাষ, বঞ্চিত নিদ্রায়।'

আসলে মানুষ নানা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলেই দুঃখ পায়। যে ব্যক্তি কোন মায়ায় কবলিত নয়, এ পৃথিবীতে তাকে কোন দিনই দুঃখের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে হয় না। যার কিছুর কামনা-বাসনা নেই, সে দুঃখের মুখ দেখে না।

'পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার,
একদল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়?
ইহারে উহারে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।।'

মদ-গর্ব-অহংকার

যে মানুষের মনে অহংকার আছে, সে সুখী হতে পারে না। অহংকার এক প্রকার মনের আগুন। সেই আগুনে জ্বলতে থাকে অহংকারী। অতএব সুখ পাবে কোথায়?

অহংকার বলে আমিত্ব ও আত্মাভিমানকে। কেউ নেই, আমিই একা। আমিই সর্বেসর্বা। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমিই যথেচ্ছ আচরণের ক্ষমতা-সম্পন্ন। আমি -- আমি--।

অহংকার হল সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করার নাম। নিজেকে হিরো এবং অপরকে জিরো, নিজেকে সর্বোচ্চ এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম।

মহানবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

আত্মপ্রশংসা করে গর্ব প্রকাশ যারা করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি সাবধানীকে সম্যক জানেন। *(সূরা নাজম ৩২ আয়াত)*

মিসকীন মানুষ। কি নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করে সে? অস্থি-মাংসের দেহ নিয়ে? যে দেহ একদিন ঘৃণিত শুক্রবিন্দু ছিল এবং তার উল্লেখযোগ্য বলতে কিছুই ছিল না; যে দু-দুবার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়েছে। তাহলে তার গর্ব কিসের?

সালমান ফারেসী ؓ বলেন, 'আমি নিকৃষ্ট বীর্য হতে সৃষ্টি হয়েছি। পুনরায় দুর্গন্ধময় মরা লাশে পরিণত হব। অতঃপর (কিয়ামতে নেকী-বদী ওজন করার) মীযানের কাছে উপস্থিত হব। অতএব মীযানে নেকীর পাল্লা ভারী হলে তবেই আমি সম্মানিত মানুষ, নচেৎ আমি অধম ও হীন মানুষ।'

'মাটি হতে হে মানব তোমার জনম,
আগুনের মত কেন হওহে গরম?
এত গরম তব সমুচিত নয়,
মাটি সম রহ নত সকল সময়।'

বলা বাহুল্য, অহংকার যে মহাপাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অহংকারী মানুষকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। *(সূরা নাহল ২৩ আয়াত)*

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকায়ো না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা লুক্বমান ১৮ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সহিত চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" *(আহমদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/১৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।" *(বুখারী ৫৭৮৪নং, মুসলিম ২০৮৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, "গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম ২৬২০নং)*

অহংকারীর উপযুক্ত ঠিকানা হল জাহান্নাম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা বলে দেব না কি? প্রত্যেক রূঢ়-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪৯১৮, মুসলিম ২৮৫৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, অহংকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষের আকৃতিতেই পিঁপড়ের মত ছোট আকারে জমা করা হবে। তাদেরকে সর্বদিক থেকে লাঞ্ছনা ঘিরে ধরবে। তাদেরকে 'বূলাস' নামক দোযখের এক কারাগারে রাখা হবে। আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ পান করানো হবে।" *(তিরমিযী ২৪৯২নং, হাকেম)*

জান্নাতের অধিবাসী হবে প্রত্যেক দুর্বল শ্রেণীর বিনয়ী মানুষ। আর জাহান্নামের অধিবাসী হবে প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত মানুষ। *(বুখারী)*

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম অহংকার প্রদর্শন করে শয়তান। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ۝ ﴾

অর্থাৎ, (আদমকে সিজদার আদেশ করলে) ফিরিশ্তাদের সকলেই সিজদাবনত হল। কিন্তু ইবলীস হল না; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল। আল্লাহ বললেন, 'ওরে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোকে বাধা দিল কে? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, না তুই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?' ইবলীস বলল, 'আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। *(সূরা স্বাদ ৭৩-৭৬ আয়াত)*

এর ফলে সে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়েছে।

যেমন অহংকার প্রদর্শন করেছিল ফিরাউন। মূসা ﷺ-এর মারফৎ এত সব নিদর্শন দেখেও সে সত্য স্বীকার করল না। মেনে নিল না আল্লাহর নবীকে। ফলে তার পরিণাম ছিল সলিল-সমাধি।

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾

অর্থাৎ, ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে প্রত্যয় রেখেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল! *(সূরা নাম্‌ল ১৪ আয়াত)*

অহংকার প্রদর্শন করেছিল কারূন। ফলে তাকে তার ঘর-বাড়ি সহ ভূতলে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যার ইতিহাস মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে *(সূরা কাসাস ৭৬-৮২ আয়াতে)* উল্লেখ করেছেন।

গর্ব করেছিল অলীদ বিন মুগীরাহ। অহংকার করেছিল আবূ লাহাব কিন্তু তাদের সে ধন ও জনের অহংকার কোন কাজে আসে নি। বরং তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে উল্টা শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾

অর্থাৎ, (বেহেশ্ত ও দোযখের মধ্যবর্তী জায়গা) আ'রাফবাসীগণ কিছু (দোযখবাসী) লোকের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে তাদেরকে ডেকে বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।' *(সূরা আ'রাফ ৪৮ আয়াত)*

কেউ বা করে মান, পজিশন ও পদের অহংকার। কেউ বা ফেটে পড়ে উর্দির অহংকারে। এরা কি আসলে সুখী বলছ? না কোনদিন না। সুখী নয় তারা, যাদের কাছে অহংকার প্রদর্শন করা হয়।

কেউ বা দাদাজানের ধন-জ্ঞানের গর্ব করে কেউ বা ভুয়ো বংশের অহংকার প্রদর্শন করে। অথচ নিজে কিছুই না হলে এবং তার বংশের লোকে বহু কিছু হলে তার লাভ কি? উচ্চ বংশের হয়ে হীন কাজ করলে সে গর্বের মূল্য কি?

পক্ষান্তরে বংশ নিয়ে গর্ব করা জাহেলী যুগের মানুষদের কাজ; সভ্য মুসলিমের কাজ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে চারটি কর্ম রয়েছে যা জাহেলিয়াতের বিষয়ীভূত; যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (অন্যের) বংশে খোঁটা দেওয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মাতম করে কান্না করা।" *(মুসলিম, বাইহাকী ৪/৬৩)*

"লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

বলা বাহুল্য, মানুষের উত্তম বংশ-পরিচয় হল যে, সে আদমী। উচ্চ বংশের পরিচয় হল ইসলাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের পদবী হল মুত্তাকী।

সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতম মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী (পরহেযগার)।" *(সূরা হুজুরাত ১৩)*

মানবতার নবী ﷺ বলেন, "আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমদ ৫/৪১১)*

বলা বাহুল্য, গদির অহংকার ও তার দাপট, দেশ, ভাষা, জাতি, বর্ণ বা রঙের অহংকার মানুষের জন্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। অবশ্য প্রত্যেক অহংকারই পতনের মূল। গর্ব মানুষকে খর্ব করে, দর্প চূর্ণ করে। অহংকারে ছারখার।

কিছু লোক ও বিশেষ করে মহিলাদের আছে রূপের অহংকার। নিজে পরিষ্কার ও অপরে কালো বলে তার প্রতি ইঙ্গিত করে নাক সিঁটকায়। কিন্তু

'সৌন্দর্য-গর্বিতা ওগো রানী
তোমার এ কমনীয় রম্য দেহখানি
এই তব যৌবনের আনন্দ-বাহার
জান কি গো নহে তা তোমার?'

এই রূপের অহংকার ও গর্ব থাকে বলেই একে অপরকে উপহাস করে। কষ্ট দেয় তাকে, যাকে আল্লাহ রূপ দেননি। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন কোন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। *(সূরা হুজরাত ১১ আয়াত)*

শুধু রূপই নয়, বরং স্বামী, বাড়ি, গাড়ি, পোশাক, অলংকার ও প্রসাধন নিয়ে গর্ব হয় মহিলাদের। অনেকে আবার ধার করে পরে যাওয়া পোশাক-অলংকার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে। কেউ গর্ব করে ইঙ্গিতে আঙ্গুলের আংটি দেখালে তার জবাবে অনেকে বাজু খুলে বাহুর বাউটি দেখিয়ে গর্বে জিততে চেষ্টা করে। অন্যের দেহে দেখার মত পোশাক থাকলে মহিলাদের প্রকৃতিগত ঈর্ষা জেগে ওঠে। কাফনই হল একমাত্র এমন কাপড়, যে কাপড় এক মহিলা অপর মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখলে তার ঈর্ষা হয় না।

বয়স নিয়েও গর্ব করতে দেখা যায় অনেককে। কেউ চায় না তার বয়স বাড়াতে। বয়স বেশী বললে রেগে ওঠে। অনেকে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশার অপচেষ্টা করে। অথচ মিথ্যা

গর্বের সাজা তাদের অজানা নয়। প্রায় সব মহিলাই চায় নিজেকে বয়সে ছোট ভাবতে। এ জন্যই বিশ্বের জ্ঞানীরা বলেছেন, মহিলাদের বয়স বিয়োগ করে হিসাব করতে হয়, যোগ করে নয়। মহিলার যদি আসল বয়স জানতে চাও, তাহলে তার ভাবীকে জিজ্ঞাসা কর। আর যদি চাও যে মহিলা মিথ্যা বলুক, তাহলে তার বয়স জিজ্ঞাসা কর।

সবাই নিজের ভালোবাসা জিনিসের প্রশংসা করে।

'সকল পীড়ার ঔষধের সার সুরা, সুরপায়ী কয় রে,
যে যাহার বশ গায় তার যশ শুনে মূঢ় বশ হয় রে।'

নিজের ঘোল কেউ টক বলতে রাযী নয়। সব ছেলের কাছেই নিজের বাপ-মা, সব বাপ-মায়ের কাছে নিজের ছেলেমেয়ে এবং সব মহিলার কাছেই আপন স্বামী গর্বের সময় সর্বোত্তম হয়। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ও অন্য সময়ে তারা অনেকেই উত্তম নয় বলে মনে মনে ভালোরূপেই জানে। অতএব এ শ্রেণীর গর্ব যে একটি মিথ্যা গর্ব তা বলাই বাহুল্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "---আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এক সতীন আছে। অতএব স্বামী আমাকে যা দেয় না তা নিয়ে যদি (সতীনের সামনে) পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যারা জ্ঞানের অহংকার দেখায় তাদের জেনে রাখা দরকার যে, তার থেকেও বড় জ্ঞানী মানুষ ছিল এবং আছে। আর এক বিষয়ে সে জ্ঞানী হলেও অন্য অনেক বিষয়ে সে অজ্ঞ। তবে অহংকার কিসের?

হক মানতে অহংকার প্রদর্শন অধিকাংশ লোকের গুণ। নিজেদের কোন স্বার্থের খাতিরে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে চায় না। এরা সুখী তো দূরের কথা এদের অবস্থা নেহাতই নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَآئِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে। অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' বরং (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রসূলের সত্যতা স্বীকার করেছে। তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে। *(সূরা সাফ্ফাত ৩৩-৩৮ আয়াত)*

﴿ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

অর্থাৎ, যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। *(সূরা গাফের ৩৫)*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার যা সফল হওয়ার নয়। অতএব তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(ঐ ৫৬ আয়াত)*

অনেকে অহংকার প্রদর্শন করে মহান আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করতেও নাক সিঁটকায়। তারা আসলে অমুখাপেক্ষী নয় তবুও। সুতরাং তাদের সেই অহংকারের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। *(ঐ ৬০ আয়াত)*

অহংকারী মানুষকে লোকে ভয় করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। উপর উপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও মনে মনে তাকে নিকৃষ্ট জানে।

হাসান বাসরী বলেন, অহংকারী ব্যক্তি পর্বতের সুউচ্চ শিখরে চড়ে থাকা মানুষের মত, যে নিচের সকল লোককে ছোট দেখে এবং লোকেরাও তাকে ছোট দেখে।

অহংকারী মানুষ ভদ্র হয় না। আর সেই জন্য সে সম্মানিত নয়। বরং মানুষের কাছে সে ঘৃণ্য হয়। মানুষ তাকে পছন্দ করে না। কারণ সে সব কাজে সকলের নিকট বড় হতে চায় তাই।

হযরত আলী ﷺ বলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক সেই, যে মনে করে - আমিই বড়।'

যে নিজেকে সবার চেয়ে বড় বলে গর্ব করে সে আসলেই বড় নয়।

'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।'

যে নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করে সে আসলে খাঁটি লোক নয়। বড়র বড়ত্ব তো লোকমাঝে এমনিই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা লোকমাঝে প্রকাশ হয় না দেখে নিজে নিজে প্রকাশ করতে গিয়ে মনের ভেজাল প্রকাশ করে দেয়।

'কত বড় আমি' কহে নকল হীরাটি,
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।'

যে নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে, তার দ্বারা বহু লোক বিপথগামী হয়। আসলে জ্ঞান বাড়লে মানুষের বিনয় বাড়ে। নচেৎ 'অল্প জলে পুঁটিমাছ ফর্‌ফর্‌ করে। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। ফাটা ঢেঁকির শব্দ বড়, অকর্মের গর্ব বড়।'

অহংকারে মানুষ ফুলতে পারে, কিন্তু প্রসারিত হতে পারে না। জগতের এ কয়দিনকার সংসারে গর্ব করে কি কেউ চিরসুখী হতে পেরেছে? যত বড় অহংকারী হোক, তার সমস্ত দর্প বিচূর্ণ করে দিবে মরণ এসে।

'ধন-জন-যৌবনের গর্ব কর মন,
জান না নিমেষে হরে সকলই শমন।'

অহংকার যেমনই হোক বন্ধু! তা মনের সুখ হরণ করে, সমাজের শান্তি নষ্ট করে। অতএব তুমি সমাজের মাঝে সাধারণ লোক হয়েও যদি সবার চোখে বড় হয়ে থাক, তাহলে তুমি নিজের চোখে ছোট হও। অহংকারী না হয়ে বিনয়ী হও। মনে সুখ পাবে, হৃদয়ে শান্তি পাবে। আর তোমার পরিবেশের লোকও সুখ-শান্তির আলো-বাতাস পাবে।

আর মনে রেখো বন্ধু! শয়তান তোমার চরম শত্রু। সে তোমার মাঝে বিপদ আনার চেষ্টা করে বিভিন্ন ছিদ্র পথে। তোমার অনেক কান্ড দেখে সে হেসেও থাকে। বিশেষ করে ছয় সময়ে তোমার উপরে শয়তানের হাসি থেকে সতর্ক থেকো; রাগের সময়, গর্বের সময়, তর্কের সময়, লোকমুখে তোমার প্রশংসার সময়, বক্তৃতাকালে উত্তেজনার সময় এবং নসীহতকালে কাঁদার সময়। আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন আমীন।

মাৎসর্য-পরশ্রীকাতরতা-হিংসা-ঈর্ষা

রাগ যখন মানুষ ঝাড়তে পারে না, প্রতিশোধ যখন নিতে পারে না এবং মনের ভিতরে সেই রাগ আসন পেতে থাকে, তখন তা হিংসায় পরিণত হয়।

হিংসা পরের ক্ষতি করার প্রবৃত্তি অথবা পরের ক্ষতি কামনা করার নাম। পরের (পার্থিব অথবা দ্বীনী) ঐশ্বর্য বা উন্নতি দেখে ঈর্ষা করা, নিজের ঐরূপ হোক তা কামনা করা এবং পরের ধ্বংস হয়ে যাক এই কামনা করাই হল হিংসা। পরের শ্রী দেখে কাতর হওয়া পরশ্রীকাতরতা।

হিংসার মূল কারণ হল, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। অবশ্য অহংকারের ফলেও হিংসা হয় মানুষের।

হিংসা সাধারণতঃ সমপর্যায়ভুক্ত মানুষের মাঝেই বেশী হয়। একই শ্রেণীর মানুষের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশী নজরে আসে। তাই দেখা যায় যে, আলেম আলেমের, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীর, চাষী চাষীর, শিল্পী শিল্পীর হিংসা করে থাকে।

হিংসুক বিপক্ষের কোন দিন প্রশংসা করে না, পরন্তু বিপক্ষের প্রশংসা শুনলে মনে মনে জ্বলে ওঠে, কখনো বা বাহ্যিকভাবেও তেঁতে ওঠে। পরন্তু কারো বদনাম শুনলে খোশ হয়। কখনো কারো জন্য হাসলেও কষ্টহাসি হাসে। 'হিংসে হাসি চিমসে বাঁকা, কাল কুট্‌কুট্‌ গরল-

মাখা।' বেশীর ভাগ সময় হিংসিত ব্যক্তির বিপদ, ক্ষতি বা অপমান দেখলে মিষ্টিহাসি হাসে। হিংসিতের ভালো কথায় গরম হয়। তার কথা শুনলে গা জ্বলে। তার সাথে কথা বলার স্পৃহা রাখে না। কথা বললে ব্যঙ্গ ছলে বলে। সম্মানী হলেও তাকে সম্মান দেয় না। সালাম ও তার জবাব দিতে আগ্রহী হয় না। এক রাস্তায় আসতে দেখলে অন্য রাস্তা ধরে। প্রয়োজন পড়লে তার সহযোগিতা করে না। সর্বদা তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় থাকে। আর যখন তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন সে তার গীবত করে বেড়ায়; তার খারাপ দিকটা প্রচার করে।

হিংসুকের মনে পরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি মোটেই সহনীয় নয়। 'দেখতে লারি চলন বাঁকা'র আচরণ সর্বদা তার ব্যবহারে ফুটে ওঠে। আর যার সে হিংসা করে, তার ক্ষতি বা সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত সে খোশ হয় না। অপরের সুখ দেখে সে শুকিয়ে যায়। এই জন্য হিংসা সাপের বিষ অপেক্ষা বেশী মারাত্মক। কেননা, সাপ কখনো নিজের বিষে মরে না; কিন্তু হিংসার আগুন খোদ হিংসুককে ছারখার করে ছাড়ে।

হিংসায় হিংসুক নিজে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতি হয় তার দুনিয়ায়; আরাম ও চয়নে সে কালাতিপাত করতে পারে না, মনে সুখ পায় না। কাজে-কর্মে স্ফূর্তি পায় না। ক্ষতি হয় তার আখেরাতে; হিংসা করার পাপের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

পক্ষান্তরে হিংসার দরুন হিংসুক তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, যার প্রতি সে হিংসা করছে। হিংসুক আগুন তো জ্বালায় পরের জন্য, কিন্তু পুড়ে মরে নিজে। পরের উন্নতি দেখে নিজের হৃদয়ের দাবানলকে প্রজ্জ্বালিত করে পরকে জ্বালাতে পারে না; বরং সে নিজেই জ্বলে ছাই হয়। উল্টে পরই লাভবান হয় আখেরাতে।

হিংসুকরা মানুষের নিকট শুধু অপমান ও অপদস্থ হয়, ফেরেশ্তাদের নিকট থেকে শুধু অভিশাপ পায় এবং সে যখন নির্জনে থাকে তখন মনে দুশ্চিন্তা আর কষ্ট পায়। আর জাহান্নামে পাবে জ্বালা ও যাতনা।

বলা বাহুল্য হিংসুক নিজের আত্মার দুশমন এবং তার দুশমনের বন্ধু। দুশমনের ক্ষতি কামনা করে ক্ষতি করে নিজের এবং লাভ দেয় দুশমনকে। 'পরের দেখে তুলো হাঁই, যা আছে তাও নাই।' হিংসায় নির্বংশ হয় মানুষ। হিংসুক আসলে মযলুমের লেবাসে যালেম এবং বন্ধুর পোশাকে বড় শত্রু।

হিংসুক ব্যক্তি নেতা হতে পারে না। হিংসা করেও নেতৃত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় না। কারণ, তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না, ভালোবাসে না মানুষেও। আরবীতে প্রবাদ আছে,

[illegible]

মনুষ্য-সমাজে হিংসা না থাকলে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকে। হিংসা না থাকলে বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। থাকবে না এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির প্রতি, এক জাতির অন্য জাতির প্রতি, এক দেশের অন্য দেশের প্রতি কোন প্রকার হানাহানি ও খুনাখুনির আচরণ।

"হিংসা যেদিন যাইবে দুনিয়া ছাড়ি,
সব তরবারি হইবে সেদিন কাষ্ঠের তরবারি।"

হিংসুক ব্যক্তি আসলে আল্লাহর নিয়ামতের দুশমন, আল্লাহর ফায়সালায় নারাজ এবং আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের মাঝে রুযী-বন্টনে অসন্তুষ্ট।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হিংসা করে ইবলীস। হিংসা করে আদমের প্রতি; ফলে সে তাঁকে বেহেশ্ত্ থেকে বের করে ছাড়ে। আর হিংসা করে কাবিল হাবিলের প্রতি; ফলে সে তাঁকে হত্যা করে ফেলে।

আমাদের দ্বীন আমাদেরকে হিংসা করতে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা ঈর্ষাকারীর নিন্দা করে বলেন,

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴾

অর্থাৎ, নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে আপন অনুগ্রহে দান করেছেন সে নিজেদের জন্য মানুষের প্রতি হিংসা করে। *(সূরা নিসা ৫৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

"তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা (রিষারিষি) করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহ বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---" *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কি?' বললেন, "যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, হিংসা নেই।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "সুন্দর চরিত্রের মুমিন।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৩২৯১নং)*

বলা বাহুল্য, হিংসা করা হারাম। কারণ, এটা একটি নোংরা ও হীন চরিত্রের মন্দ কামনা। এই কামনাতে যেমন শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হয়, তেমন দ্বীন ও দুনিয়াও বিনষ্ট হয় এবং অপর মুসলিম ভাইয়ের উপর অত্যাচার করা হয় ও তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর তা হতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল ﷺ আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা প্রকাশ্যে পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

নাফরমানির বড় বড় ৪টি এমন স্তম্ভ আছে, যার প্রভাবে মানুষ ভ্রষ্টতা থেকে নিস্তার পায় না। সে ৪টি স্তম্ভ হল কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য। মানুষের মনে কাম থাকলে ইবাদতে মন বসাতে পারে না। ক্রোধ থাকলে মানুষ ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে বসে, মদ বা অহংকার থাকলে আনুগত্য ও হক গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। আর মাৎসর্য বা হিংসা থাকলে উপদেশ দান ও গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধকতা আসে।

আসলে কোন ব্যক্তির প্রাপ্ত নিয়ামতের উপর হিংসা করার অর্থ হল, আল্লাহর ভাগ্য বণ্টনের বিরোধিতা করা। কারণ, যে অপর জনের আল্লাহর দেওয়া প্রাপ্ত নিয়ামতের উপর হিংসা করল, সে যেন আল্লাহর নিয়ামতকে অন্যের জন্য অপছন্দ করল এবং আল্লাহর

ফায়সালাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল। এই জন্য কোন এক বিদ্বান বলেছেন, হিংসুক পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহর বিরোধিতা করে থাকে ঃ-

(১) সে আল্লাহর ঐ সকল নিয়ামত অপছন্দ করে, যা তার ভাইয়ের উপর প্রকাশ পেয়েছে।

(২) সে আল্লাহর রুযী-বন্টনে অসন্তুষ্ট হয়, সে যেন আল্লাহকে প্রতিবাদ সুরে বলতে চায় যে, 'কেন এইভাবে বন্টন করলেন?'

(৩) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ বিতরণ করেন। আর সে তাঁর অনুগ্রহে কৃপণতা করে।

(৪) আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে ধন-সম্পদ ও সম্মান প্রদান করেন। আর সে তাকে ঘৃণা করে অপমান করতে চায়।

(৫) সে আল্লাহর শত্রু ইবলীসকে সাহায্য করে।

হিংসার মধ্যে সবচেয়ে বড় হিংসা হল সহোদর ভায়ে-ভায়ে হিংসা। আর সবচেয়ে তিক্ত ও স্বাভাবিক হিংসা হল সতীনে-সতীনে হিংসা।

হিংসুটে বন্ধু আমার! আমাদেরকে জেনে রাখা দরকার যে, হিংসা আমাদের অন্তরের একটা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাধি; যে ব্যাধির উপর মানুষের কোন সওয়াব লাভ তো হয়ই না; বরং তাতে পাপই হয়ে থাকে। আর এই ব্যাধি দূর করার ঔষধ হচ্ছে শরয়ী ইল্‌ম ও তদনুযায়ী আমল।

পক্ষান্তরে কোন মানুষ যদি অপর ভাইয়ের প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনষ্ট কামনা না করে তার অনুরূপ নিয়ামত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেটা হিংসা বা ঈর্ষা হবে না। বরং সেটাকে সমকামনা বলা যাবে। এই রকম সমকামনা করা বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "শুধু দুই বস্তুতে (দুই ব্যক্তির) ঈর্ষা করা যায়। প্রথম ঐ ব্যক্তির যাকে আল্লাহ তাআলা মাল ধন দিয়েছেন। আর সে ঐ মাল ধন আল্লাহর রাস্তায় রাত-দিন ব্যয় করে। দ্বিতীয়- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা (হিকমত) কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর সে তার দ্বারা রাতদিন (ফায়সালা) তিলাঅত করে সওয়াব উপার্জন করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আরো একটি পবিত্র ঈর্ষা হল, স্ত্রী-কন্যা বা মা-বোনের ব্যাপারে পুরুষের ঈর্ষা। এদের কাউকে যদি এমন পুরুষের সাথে বেপর্দা হতে দেখে অথবা কথা বলতে দেখে যার সাথে বিবাহ বৈধ অথবা কারো সাথে কোন অবৈধ প্রণয়ে জড়িত হওয়ার কথা আশঙ্কা করে, তাহলে হৃদয় ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে এবং তাতে বাধা দেওয়ার শত প্রচেষ্টা চালায়। এমন হিংসার জন্য সে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

পক্ষান্তরে যে পুরুষের সে ঈর্ষা নেই সে পুরুষকে ভেড়ুয়া বা মেড়া পুরুষ বলা হয়। আর এমন পুরুষের জন্য বেহেশ্তে জায়গা নেই। আর এই আচরণের জন্য যে অশান্তি দেখা দেয় সংসারে তা বলাই বাহুল্য।

আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত বন্ধু আমার! প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিংসিত হয়। অতএব যদি তুমি কারো হিংসার কুদৃষ্টিতে পড় তাহলে হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার উপায় জেনে নাও।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ)-এর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার উপায় নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহর কাছে হিংসুকের হিংসা থেকে পানাহ চাও। আর সে জন্য প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত সূরা ফালাক ও নাস পাঠ কর।

২। আল্লাহর তাকওয়া মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং ধৈর্য অবলম্বন কর। মহান আল্লাহ বলেন, "আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(সূরা আলে ইমরান ১২০ আয়াত)*

৩। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। যেহেতু যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হন।

৪। হিংসার আলোচনা থেকে মনকে খালি রাখ। হিংসুকের প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করো না। 'হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

৫। আল্লাহ-অভিমুখী হও। মনের কষ্টের কথা তাঁকেই জানাও।

৬। গোনাহ থেকে তওবা কর। হতে পারে যে, তোমার পাপের কারণে লোকে তোমার প্রতি হিংসা করছে।

৭। সততা ও দানশীলতা ব্যবহার কর। তাতে অনেক হিংসুকের হিংসা দূর হয়ে যাবে।

৮। কঠিন হলেও হিংসুকের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন কর। তার যথাসাধ্য উপকার কর। হিংসার আগুন নিভে যাবে। *(বাদাইয়ুল ফাওয়াইদ)*

কামনা-আশা-দুরাশা

এ সংসারে বহু মানুষ আছে, যারা কোন না কোন আশার আশায় কালাতিপাত করে। বড় হওয়ার আশায়, সুখী হওয়ার আশায়, ধনী হওয়ার আশায়, সুস্থ হওয়ার আশায়, বিপদ কাটার আশায় দিবারাত্রি গণনা করে। আশাতেই মানুষ নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে, তবুও নিরাশ হয় না। মানুষের সর্বস্ব চলে গেলেও তার আশাটুকু যায় না। মানুষ ধ্বংসোন্মুখ হলেও তার আশা থাকে। আবার আশা ফুরিয়ে গেলে মানুষ ফুরিয়ে যায়।

জীবন মানেই আশায় আশায় বেঁচে থাকা। আশা এমন একটা জিনিস, যাকে কোনদিন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।

সংসারে সমস্ত ভাবনারই একটা ধরন আছে। যার মনে আশা আছে, সে এক রকম করে ভাবে। আর যার আশা নেই, সে অন্য রকম ভাবে। পূর্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে, সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, উৎকণ্ঠা আছে। কিন্তু আশাহীনের সুখ নেই, তৃপ্তি নেই, উৎকণ্ঠা নেই। ভাবতে ভাবতে হাল্কা মেঘের মত যথা-তথা ভেসে বেড়ায়। যেখানে বাতাস লাগে না সেখানে দাঁড়ায়, আর যেখানে লাগে সেখান হতে সরে যায়। পরক্ষণে আশার আলো দেখলে ভাবনার ধারা পাল্টে যায়। নতুন করে বাঁচার আশা হয়, সুখের উন্মেষ ঘটে মনের গহীন কোণে।

'পাওয়া যদি হারিয়ে যায় দূরের কোন গহন বনে
আবার যখন ফিরে পাওয়া কতই খুশী নিরাশ মনে।'

মানুষ যদি সমুদ্রে পড়ে তবে নিরাশায় তার দেহ ও মন হতে সমস্ত শক্তি হরণ করে তাকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর করে দেয়, সে বাঁচবার চেষ্টাও করতে পারে না। কিন্তু সে যদি নিকটে কূল দেখে তবে তার বাঁচবার চেষ্টা হয়।

সংসারে বহু মানুষই অপরের আশা-ভরসায় বেঁচে থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি, মা-বাপ ছেলের প্রতি, ছোট ভাই-বোন বড় ভায়ের প্রতি বুকভরা আশা রেখে থাকে।

'সংসার সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।'

কিন্তু সেই আশা কারো পূরণ হয়, কারো বা চিরদিনের জন্য অপূরণ থেকে যায়। আসলে ঘোড়-দৌড়ে যে ঘোড়ার উপর বাজি রাখা হয়, সেই ঘোড়াই যখন ডিগবাজি দেয়, তখনই নামে হতাশার অন্ধকার।

'আশার আনিত ফুল
আনত হইয়া ঝরিতেছে ঐ
মাটির বক্ষে হইয়া আকুল।'

তবুও কেউ হাল ছাড়ে না। আবারও আশার বীজ বপন করে যত্নের সাথে হৃদয়ে প্রতিপালিত করা হয়। উত্থান-পতন ও ভালো-মন্দের সকলের ক্ষেত্রে মনে বল যোগায় আশা। আশা বলে,

'অসতের শত্রু আমি মহতের সখা,
যেভাবে খুঁজিবে পাবে সেইভাবে দেখা।
রাখালের বেণু আমি কিশোরের হাসি,
কোট্‌নার কুমন্ত্রণা দস্যুর অসি।
ধীমানের মেধা আমি পামরের পাপ,
সুশীলের চরিত্র আমি শয়তানের বাপ।'

পক্ষান্তরে সাধ ও কামনা হল এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধি। যা হৃদয় ও সময়কে ধ্বংস করে এবং মানুষকে স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মানুষকে দীর্ঘ জীবনের আশা দেয়, প্রেরণা দেয়।

আল্লাহর নবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ-কে বলেছিলেন, "তুমি এমনভাবে দুনিয়ায় অবস্থান কর যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথিক।" আর ইবনে উমার ؓ বলতেন, 'সন্ধ্যা হলে সকালের প্রতীক্ষা (বা আশা) করো না। আর সকাল হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা (বা আশা) করো না। তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর।' *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত ১৬০৪নং)*

'প্রভাতে অধরে হাসি, সন্ধ্যায় মলিন মুখ,
উদ্যম ফুরায়ে যায়, ভাঙ্গে আশা ঘুচে সুখ।'

নিন্দনীয় বাসনা প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) বলেন, '---চিত্ত বিনষ্টকারী দ্বিতীয় বিষয় হল, বাসনার সমুদ্রে হৃদয়ের সন্তরণ করা, যে সমুদ্রের কোন কূল-কিনারা নেই। যে সমুদ্রে পৃথিবীর নিঃস্ব ও দরিদ্ররা সাঁতার কেটে বেড়ায়। যেহেতু নিঃস্বদের কেবল কামনাটাই সম্বল ও পণ্যদ্রব্য। শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন এবং অবাস্তব কল্পনা ও অলীক খেয়াল। যাদের সকল আশাই দুরাশা। মিথ্যা বাসনার তরঙ্গমালা এবং অমূলক কল্পনার ক্ষিপ্ত ঢেউ যাদেরকে নিয়ে খেলতে থাকে, যেমন কুকুর খেলে থাকে কোন পশুর শবদেহ নিয়ে। আর ঐ পণ্যদ্রব্য প্রত্যেক নিকৃষ্ট, দীন-হীন-ক্ষীন মানুষেরই যার এমন কোন হিম্মত ও উদ্যম থাকে না যার

দ্বারা সে বাইরের বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে। বরং তার পরিবর্তে কেবল নিকৃষ্ট কামনাই সদা জাগরিত রাখে।

বাসনাকারী অভিলষিত বস্তুর ছবি নিজ মানসপটে অঙ্কন করে থাকে। কখনো বা কল্পনাকে বাস্তবজ্ঞান করে তার সাক্ষাৎলাভ করে থাকে এবং তা মনে মনে অর্জনও করে থাকে। তা নিয়ে সুখ আস্বাদন করে থাকে, আর মনের সাধও মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এই ভাবোচ্ছ্বাস ও তন্ময়তায় কিছুকাল থাকার পর যখন তার ঘোর অথবা নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন হাত শূন্য দেখে এবং নিজেকে দেখে সেই জীর্ণশীর্ণ পাতার কুটীরে চাটাই এর বিছানায়।' *(মাদারেজুস সালেকীন ১/৪৫৬)*

আবু তামাম কি সুন্দরই না বলেছেন, 'যার ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা ও ইচ্ছার চারণভূমি কামনা ও বাসনার উদ্যান হয় সে সর্বদা উপহাস্য থাকে।'

কোন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে দুরবস্থাগ্রস্ত মানুষ কে?' তিনি বললেন, 'যার হিম্মত ভেঙ্গে গেছে, বাসনার গৃহ প্রশস্ত হয়েছে, উপকরণ হারিয়ে গেছে এবং সামর্থ্য কমে গেছে।'

অন্য এক জ্ঞানী বলেন, 'কামনা হতে দূরে থাক। কারণ কামনা তোমাদের মালিকানাভুক্ত বস্তুর সৌন্দর্য অপসারিত করে। আর তারই কারণে তোমাদের উপর আল্লাহ নেয়ামতকে তুচ্ছ ও ছোট জ্ঞান কর। *(আদাবুদ দুনয়্যা অদ্দীন ৩০৮ পৃঃ)*

বিজ্ঞগণ এ কথায় একমত যে, 'আশাই পরম দুখ, নৈরাশ্য পরম সুখ।'

জ্ঞানিগণ আরো বলেন ঃ-

'সেই প্রকৃত সুখী, যে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আশা করে না।

তুমি যদি চাও যে, তোমার সকল আশাই পূরণ হোক, তাহলে অসম্ভব আশা করো না।

জীবনে দুটো দুঃখ আছে; একটি হল ইচ্ছা অপূর্ণ থাকা। অন্যটি হল ইচ্ছা পূরণ হলে অন্যটির প্রত্যাশা করা।

জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যন্ত্রণা। কামনা-বাসনা হল যন্ত্রণার কারণ। আর বাসনা-মুক্তিই হল প্রকৃত মুক্তি এবং সুখের মূল কারণ।

সব পেয়েও মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন কিছুই পাইনি।

আমরা প্রত্যেকেই জীবনে চাই। আর সেই চাওয়া থেকে আমাদের সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

চাহিদার অন্ত নেই। একটি চাহিদা মেটাতে আর একটি চাহিদার উদ্রেক হয়।

আশা এমন গভীর সমুদ্র, যার কোন তলদেশ নেই।

হুতাশনের দাহন আশা, ধরণীর জল-শোষণ আশা, ভিখারীর অর্থ আশা, চক্ষুর দর্শন আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ আশা, ধনীর ধন-বৃদ্ধি আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্য-বিস্তার আশা, হিংসাপূর্ণ পাপ-হৃদয়ে দুরাশার তেমনি নিবৃত্তি নাই, ইতি নাই।'

অনেক সময় মানুষের এমন বস্তুর সাধ হয়, যা অর্জন করতে তার সাধ্য থাকে না এবং তা লাভ করার লক্ষ্যে সাধনা করতেও সক্ষম হয় না। তার মন বলে, 'সাধ আছে সাধ্য নাই, আশা আছে সম্বল নাই। আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নাই।'

কোন কোন আশা বৈতরণী নদী (ধ্বংসের পথ)। আশায় মরে চাষা। বড় আশায় অনেক চাষী নিঃস্ব হয়ে বসে।

সাধারণতঃ যার বাসনা ও কামনা দীর্ঘ ও বিশাল হয়, তার কর্ম মন্দ হয়। আর যার কর্ম মন্দ হয়, তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ ও পন্ড হয়।

কামনা এক মন্দ সওয়ারী। যে তাতে সওয়ার হয়, সে লাঞ্ছিত হয় এবং যে তার সাথী হয়, সে ভ্রষ্ট হয়।

বাসনা হল মরীচিকাসম। যে তার পশ্চাতে ছোটে, সে ধোকা খায়।

'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

আশাধারী বন্ধু আমার! আশার এক মজার গল্প শোন ঃ-

এক আশাবাদী বাসনার বড় স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাটে যাচ্ছিল। মাথায় ছিল মাটির কলসী ভরা মধু। বড় সুখের বাসনায় সে মনে মনে পরিকল্পনা শুরু করল; বলল, 'মধুর কলসীটিকে ১০ দিরহামে বিক্রি করে ৫টি ছাগল কিনব। সেগুলি বছরে ২বার বিয়বে। ২ বছরে ২০টি ছাগল হবে। তখন প্রত্যেক ৪টির বিনিময়ে ১টি করে (মোট ৫টি) গরু কিনব। সেখান হতে আমার অর্থ বৃদ্ধি পাবে। কিছু জমি কিনে চাষ শুরু করব। তারপর সুন্দর একটি ঘর বানাব। ঘরে দাস-দাসী রাখব। সুন্দরী দেখে একটি বিয়ে করব। আমার ছেলে হবে, তার নাম রাখব অমুক। তাকে উত্তম আদব শিখাব। সে আমার কথা না মানলে লাঠি করে মেরে শিক্ষা দেব।'

লোকটির হাতে ১টি লাঠি ছিল। কিভাবে ছেলেকে মারবে তা দেখতে গিয়ে মনের আবেগে লাঠি তুলল উপরে। আঘাত লাগল মাটির কলসীতে। ভেঙ্গে গেল কলসী। মাথায় বয়ে গেল মধু। মনের আশা থেকে গেল মনের গহীন কোণেই। *(উয়ূনুল আখবার ৩/২৬৩)*

এখান থেকে শিক্ষা নাও যে, কোন কিছুর আশা করলেও তার নেশা হওয়াটা বড় ক্ষতিকর। যে আশা মিটবার নয়, তার কল্পনার বন্যায় ভেসে লাভ কি বন্ধু? পরিশেষে তুমিও বলবে,

'শ্বেত হল শ্যাম কেশ   নিশ্বাস হতেছে শেষ
মনের বাসনা মোর   অদ্যাপি না পুরিল,
যতনে দুরাশাভরে   ডুবিলাম না রত্নাকরে
যাতনা হইল সার   রতন না মিলিল।'

অবশেষে অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে,

'ক্ষুদ্র জীবনে মোর অনন্ত পিপাসা
মিটিল না, মিটিছে না, মিটিবে না আশা।'

আর আরবী কবি সত্যই বলেছেন,

ما كل ما يتمنى المرء يدركه   تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

অর্থাৎ, মানুষ যে সব আশা করে, তার সবটাই পূরণ হয় না। (অনেক সময়) পাল-তোলা জাহাজের প্রতিকূলেই হাওয়া চলে থাকে।

সাধ ও কামনার কিছু প্রশংসার্হ। প্রশংসার্হ সাধ হল, সৎ ও উত্তম কাজের অভিলাষ করা। যার তিনটি শর্ত রয়েছে।

১। সেই কর্ম করার জন্য পাক্কা সংকল্প রাখা, যখনই তা করা সম্ভব হবে, তখনই করে ফেলার পূর্ণ ইচ্ছা রাখা।

২। তা শরয়ী (ধর্মীয়) গন্ডীভুক্ত হতে হবে। যেমন মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণের কামনা করা, বড় আলেম হওয়ার আশা পোষণ করা।

৩। তা যেন মানুষের স্বভাব ও অভ্যাস না হয়।

যে কোনও সৎ পরিকল্পনায় মানুষের মনে আশা থাকলে উদ্যম জন্মে এবং সৎ হলে তা সফল হয়।

আর এই শ্রেণীর কামনা ভালো বলেই তা বড় করে করতে হয়। এ জন্যই বলা হয়, 'আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।'

পরের উপর আশা করে পরমুখাপেক্ষী হওয়া নিন্দনীয় কর্ম। তাতে পরের প্রতি মনের আকর্ষণ থাকে এবং তার নিকট থেকে সে আশা পূরণ না হলে দুঃখ পেতে হয়।

কোনও ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী না হওয়াই সচ্ছলতা। আর অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মানেই হল দরিদ্রতা।

ক্ষীণবল বন্ধু আমার! যদি পার তাহলে কোন বিষয়ে লোকের প্রত্যাশা করো না। কোন সৃষ্টির নিকট থেকে কোন মঙ্গলের প্রত্যাশা করো না। কারো কাছ থেকে একান্ত নিরুপায় না হলে কিছুও চেয়ো না।

একদা মহানবী ﷺ এই কথার উপর বায়আত করতে উদ্বুদ্ধ করেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ অক্ত নামায আদায় কর। আনুগত্য কর এবং লোকের কাছে কোন কিছু চেয়ো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি যে, তাঁদের কারো কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তা তুলে দেওয়ার জন্যও কাউকে বলতেন না। (বরং সওয়ারী থেকে নিজে নেমে গিয়ে তা তুলে নিতেন।) *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮০৯নং)*

কোন সময়েই পরের খিদমত বা সেবা পাওয়ার আশা করো না। পারলে অপরের খিদমত করো সেটাই সুখের কারণ। এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও নয়; যদিও তোমার খিদমত করা তার পক্ষে ওয়াজেব। যেহেতু তোমার আশানুরূপ সে খিদমত না পেলে তোমার মন ব্যথা পাবে। শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধুর কাছে খিদমতের আশা করে এবং তা পায় না বলেই বধুর চর্চা করে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে বধুর সাথে কলহ হয়।

বউ শ্বশুর ঘরে অতিরিক্ত আদর বা সম্মান কামনা করে বলেই তা না পেলে দুঃখিতা হয়।

তুমি পথ চলছিলে। এক লোকের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে সে তোমাকে সালাম দিল না। তাতে তোমার মন কষ্ট পেল। কিন্তু তোমাকে তার সালাম না দেওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়তো বা সে অন্য কোন ব্যগ্রতা, ব্যস্ততা বা ধ্যানে ছিল, তাই খেয়াল করেনি। অথবা সে অহংকারী। অথবা সে অন্য কিছু। কিন্তু তুমি কে? তুমি নিজেকে কেন সালামের উপযুক্ত মনে কর? তুমি বড় বলে তোমার অধিকার আছে? কিন্তু কেউ যদি অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তুমি কি করতে পার?

সম্মানিত বন্ধু আমার! তুমি নিজেকে ছোট ভাব। তোমাকে লোকে সালাম দিয়ে সম্মান

প্রদর্শন করবে তার অযোগ্য ভাব। প্রতিযোগিতা করে আগে সালাম দাও। তাহলেই তো ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হবে না এবং মনে ব্যথাও পাবে না।

কেউ তোমার বক্তৃতা শুনল না, কেউ তোমার পরামর্শ নিল না বা মানল না, কেউ তোমার উপদেশ গ্রহণ করল না বা সেই অনুযায়ী আমল করল না, কেউ তোমাকে দাওয়াত দিল না, কেউ তোমার কদর করল না, সম্মান দিল না, তাতে তোমার দুঃখের কি আছে? এটাই তো স্বাভাবিক যে তুমি এ সবের যোগ্য নও। আর যোগ্য হলেও পরের মনের উপর কি জোর আছে বন্ধু? যদি কেউ তোমার মূল্যায়ন করে, তাহলে জানবে সেটা অস্বাভাবিক ও আদর্শগত ব্যাপার। অতএব বাস্তবকে অস্বীকার করে নিজেকে নিপীড়িত করা কি আহম্মকি নয় বন্ধু?

তুমি কাছের হয়েও তোমার কাছে কেউ মনের কথা বলল না, অথবা সহযোগিতা কামনা করল না, অথচ দূরের কারো নিকট থেকে তা কামনা করল, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেল, এতে তোমার মন দুঃখিত হলেও সেটাকেই বাস্তব ও স্বাভাবিক মনে কর।

স্ত্রী যদি তোমার মনের মত না হয় এবং স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি অতিরিক্ত প্রেম ও খিদমত কামনা কর অথচ তা না পাও, তাহলে মন বিষন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাভাবিক এটাই যে, সে তোমাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে পারবে না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী তোমার মনমত চলে না, কথা মানে না। তাতেও তুমি দুঃখিত। কিন্তু মনমত না চলাটাই তো স্বাভাবিক বন্ধু। টেরা হয়ে চলা এদের প্রকৃতি। সে কথার সাক্ষী দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তার দূত। অতএব দুঃখ করে কি করবে?

আনোয়ারা, মনোয়ারা, সালেহা প্রভৃতি উপন্যাস বা রূপকথা পড়ে তুমি কি মনে করছ তোমার স্ত্রীও সেই কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীর নায়িকা আনোয়ারা-মনোয়ারা-সালেহার মতই হবে? এমন আকাশ-কুসুম কল্পনা, এমন অসম্ভব আশা, এমন অস্বাভাবিক প্রেম প্রার্থনা কি তোমার জন্য হাস্যকর নয় বন্ধু?

পূর্বে স্থানপ্রাপ্ত মনের ভিতরকার সমস্ত কল্পনা ও কামনাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দাও। অতঃপর বাস্তবকে বরণ ও স্বীকার করে নাও এবং নিজের ভাগ ও ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আর অস্বাভাবিক প্রেম, রোমান্স্ বা খিদমত কামনা করো না, তাহলেই তুমি দুঃখ পাবে না এবং তোমার দাম্পত্য সুখের হবে।

বহু স্ত্রী আছে, যারা স্বামীর কাছ থেকে অনুরূপ অস্বাভাবিক প্রেম ও খিদমত কামনা করে। ফলে তা না পেলে তারা মনে মনে বড় কষ্ট পায় এবং অপরের স্বামী সেই রকম হলে কথায় কথায় তার প্রশংসা করে নিজের স্বামীর কাছে। আর তাতে ফল হয় ডবল বিপরীত।

স্বাভাবিক ও ওয়াজেব হল এই যে, স্বামীর খিদমত করবে স্ত্রী। সংসারের কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করা আদর্শ স্বামীর একটি গুণ। তা বলে নিছক মেয়েলি গৃহস্থালী কাজ স্বামী করে দেবে এটা তো অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব স্বামী শাড়ী ধুয়ে দেয় না অথবা বাসন-প্লেট ধুয়ে দেয় না বলে স্ত্রীর দুঃখ করা আহাম্মকি। আর কোন অসাধারণ স্বামী যদি অস্বাভাবিকরূপে তা করেই থাকে, তাহলে তার প্রশংসার কি আছে? স্ত্রী হয়তো জানে না যে, ঐ কাজ ও প্রশংসাই পুরুষদের কাছে নিন্দনীয়। যেহেতু তাতে রয়েছে স্ত্রৈণতার গন্ধ। যে

স্ত্রী ঐরূপ স্বামীর প্রশংসা করে মহিলা মহলে গর্ব করে নিজের সৌভাগ্য প্রকাশ করতে চায়, আসলে সে কিন্তু তার অজান্তে স্বামীর গর্বকে খর্ব করে তার অপমান করে থাকে।

সংসারী বন্ধু আমার! নিজের কাজ নিজে কর। স্ত্রীর ভরসা করো না। নিজের হাতে কাজ করার মত শান্তি নেই বন্ধু! অপরের কাছ থেকে খিদমত কামনা করে সংসার করায় সুখ নেই মোটেই।

'আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্য মূল্য নয়।
যদিচ বল্কল পর রহ উপবাসী,
হয়ো না হয়ো না তবু পরের প্রত্যাশী।'

পরপ্রত্যাশী বন্ধু আমার! পরের উপর নির্ভর করে তীর্থের কাক হয়ে বসে থেকো না। পরান্নভোজী বা ভুক্তভোজী হওয়ার মত হীন প্রত্যাশা নিয়ে জীবন ধারণ না করে স্বনির্ভরশীল হতে চেষ্টা কর। তাতে পরম সুখ পাবে, আনন্দ পাবে। তোমার পিতার হাজার থাকলেও তুমি সেই মীরাসের ভরসা করো না। নিজে কিছু করার মত সামর্থ্য তৈরী কর। তুমিই হবে সফল যুবক।

হ্যাঁ, আর কোন সৎকাজে নিরাশ হয়ো না। সফলতা আসবে, বিপদের মেঘ কেটে শান্তির সূর্যালোক দেখা দেবে, দারিদ্র দূর হয়ে সুখ আসবে, রোগ ভালো হয়ে আরোগ্য আসবে, আল্লাহর সাহায্য আসবে - এতে কোন প্রকার সন্দেহ করো না। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

যে কখনো নিরাশ হয় না, সেই প্রকৃত সাহসী। সেই পায় বাঁচার প্রেরণা। পক্ষান্তরে নিরাশ হলে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। যেহেতু নৈরাশ্য এক প্রকার মৃত্যুই।

নিরাশ মানুষের মনে কোন উদ্যম থাকে না। কোন কর্মে তার উৎসাহ থাকে না। নিরুৎসাহ মনে কোন প্রকার হিম্মত থাকে না, ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা থাকে না। আর সে জন্যই নিরাশ হওয়া বৈধ নয়।

যার কোন আশা নেই সে পথ চলবে কেমন করে? যার কোন উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্যস্থল নেই সে কোন্ পথ ধরবে?

সীমাহীন পাপ করে ফেলেছ, মুক্তির আশা নেই মনে করে নিরাশ হয়ো না। আশা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থাৎ, বল, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সমস্ত পাপরাশিকে মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

বিপদগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাঁচার বা পুনরায় লাভের পথ না দেখে নিরাশ হয়ো না। তোমার নবী ﷺ বলেন, "সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও

ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, '(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)' বরং বলো, 'আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে 'যদি-যদি না' (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।" *(আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫০ নং)*

জীবনে সুখ না দেখে, আত্মীয়-স্বজনকে ধ্বংস দেখে হতাশ হয়ে বলো না যে,

'ফুরাল সকল আশা মিটিল না প্রাণ-তৃষা
যেন কোথা ভেসে চলে যাই,
না জানি কি ভাগ্য-দোষে সকলি ফুরাল শেষে
কোথা যাব দিশা নাহি পাই।
আত্মীয়-স্বজন শূন্য চৌদিকেতে দুঃখ-দৈন্য
হৃদয়ে আগ্নেয়গিরি কেমনে নিভাই।'

যেহেতু তোমার নবী ﷺ বলেন, "কোনও মুসলিমের উপর যখন কোন বিপদ আসে এবং সে যদি আল্লাহর আদেশমত 'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন। আল্লাহুম্মা আ-জিরনী ফী মুসীবাতী অআখলিফলী খায়রাম মিনহা।' বলে তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদ অপেক্ষা উত্তম বিনিময় দান করেন।" *(মুসলিম, আহমাদ, বাই হাকী ৪/৬৫)*

সুখ, সমৃদ্ধি, সন্তান বা কোন সম্পদ না পেয়ে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কাফের ও পথভ্রষ্ট জাতি ছাড়া আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না। তোমার প্রতিপালক প্রভু ইয়াকূব নবীর কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, (হে আমার পুত্রগণ! তোমরা হারানো ইউসুফ ও তার সহোদর ভাই বিনয়ামিনের অনুসন্ধান কর) এবং আল্লাহর করুণা হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ, কাফেরগণ ব্যতীত আল্লাহর করুণা হতে কেউ নিরাশ হয় না। *(ইউসুফ ৮৭ আয়াত)*

আর ইবরাহীম নবীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

﴿ قَالُواْ بَشَّرۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡقَٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ
مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, (ফিরিশ্তারা বলল, তোমাকে আমরা সুসন্তানের সুসংবাদ দিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের খবর শুনে অবাক হয়ো না।) আমরা তোমাকে সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না। (ইবরাহীম) বলল, যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? *(সূরা হিজ্র ৫৫-৫৬ আয়াত)*

অতএব বন্ধু আমার! নেক আশা কর। দুরাশা করো না এবং পরের প্রত্যাশায় থেকো না। আর আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ে তোমার বিপদে হতাশ হয়ে বসে যেয়ো না।

কার্পণ্য বা বখীলী

এ সংসারে মানুষ আছে চার শ্রেণীর; দয়ালু, দাতা, আত্মকেন্দ্রিক ও কৃপণ। যে নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়ায় সে দয়ালু। যে নিজেও খায় এবং অপরকেও খাওয়ায় সে দাতা। যে নিজে খায়, কিন্তু অপরকে খাওয়ায় না সে আত্মকেন্দ্রিক। আর যে নিজেও খায় না এবং অপরকেও খাওয়ায় না সে হল কৃপণ।

বখীল, কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, কিপটে, বা কনজুস যাই বল না কেন; এরা হল তারা, যারা নিজেদের মাল ব্যয় করতে চায় না। এরা নিতান্ত অনুদার এবং অত্যন্ত সংকীর্ণমনা হয়। অনেক সময় এরা নিজেরা না খেয়ে এবং না পরেও সঞ্চয় করতে চায়। এদের জন্য কথিত আছে যে, এরা নাকি পিঁপড়ের পেট থেকেও গুড় বের করে খায়। আর এরা নাকি সিন্দুকের কাছে টাকা ধার নেয়! একটি পয়সা পকেট থেকে গেলে, মনে বলে, 'গেল গেল।'

ধন-সোহাগী মরে কুড়োর যাউ খেয়ে। এদের অবস্থা হল 'আপন বেলায় চাপন-চোপন পরের বেলায় ঝুড়ঝুড়ে মাপন।' 'আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গন্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গন্ডা।' 'আপনারটা ঢাকা থাক, পরেরটা বিকিয়ে যাক।'

কিন্তু সব থেকে বড় কথা এই যে, এরা নিজেদের প্রতিপালকের রাস্তায় ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। এরা হযরত উমারের দোহাই দিয়ে ছেঁড়া-ফাটা পোশাক পরে অর্থ বাঁচায়, কিন্তু সে অর্থ উমারের মতই দান করে না কাউকে। এরা অপব্যয় করা হারাম - তা খুব ভালোভাবে জানে। কিন্তু কার্পণ্য করা হারাম সেটা শুনতে চায় না। এরা মিথ্যা বলে, নানা বাহানা করে ধন গোপন করে, তবুও আল্লাহর হক আদায় করতে অকুণ্ঠ হয় না। কত এল আর কত গেল - এই হিসাব রেখেই এদের খাঁটি সুখ মাটি হয়ে যায়।

পরন্তু কার্পণ্য অবশ্যই ভাল নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

"পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর সদ্বিষয়ে মিথ্যারোপ করলে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে।" *(সূরা লাইল ৮-১১ আয়াত)*

"আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে; তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থানদিবসে ওটাই তাদের গলার বেড়ী হবে; আল্লাহ নভোমন্ডলের ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী। আর যা তোমরা করছো আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।" *(সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াত)*

"দেখ তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কার্পণ্য করে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত। আর তোমরাই অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।" *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৮ আয়াত)*

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না। যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হতে যা দান করেছেন তা গোপন করে। আর আমি সে অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" *(সূরা নিসা ৩৬-৩৭ আয়াত)*

"আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্য করতে নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত প্রশংসিত।" *(সূরা হাদীদ ২৩-২৪ আয়াত)*

কৃপণতা কত বড় ঘৃণ্য আচরণ এবং তার যে কি শাস্তি হতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন আমাদের মহানবী ﷺ।

একদা নবী ﷺ (পীড়িত) বিলাল ؓ-কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য এক স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী ﷺ বললেন, "হে বিলাল! একি?!" বিলাল বললেন, 'আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বিলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।" *(আবূ য়্যা'লা, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯০৯নং)*

দানশীলের মনে তৃপ্তি আছে, সুখ আছে, তার মর্যাদা আছে। পক্ষান্তরে কৃপণের মনে কোন সুখ নেই, তার কোন মর্যাদাও নেই। যে ৩টি জিনিস বর্জন করবে, সে ৩টি জিনিস অর্জন করবে; যে অপব্যয় বর্জন করবে, সে ইজ্জত অর্জন করবে। যে কৃপণতা বর্জন করবে, সে মর্যাদা অর্জন করবে। আর যে অহংকার বর্জন করবে, সে সম্মান অর্জন করবে।

সৃষ্টিজগতের রুযী বিতড়িত, লোভী বঞ্চিত, হিংসুক চিন্তিত এবং কৃপণ ঘৃণিত।

বখীল তার মাল হিফাযত করতে পারে, কিন্তু নিজ মান-সম্ভ্রম হিফাযত করতে পারে না।

বখীল ধনী পরকালেও ঘৃণ্য। মহানবী ﷺ বলেন, "ধনবানরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন মানের হবে। তবে সে নয়, যে তার মাল দান করবে এবং তার উপার্জন হবে পবিত্র।" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমদ ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ২/৭২, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

কৃপণতা নিঃসন্দেহে মন্দ চরিত্রের পরিচায়ক। ধনী হয়েও বখীল হওয়া অবশ্যই ভালো মানুষের গুণ নয়। দশ বস্তু দশ ব্যক্তিতে তুলনামূলক অধিক মন্দ ও নিন্দনীয়; রাজায় যুলমবাজি, কুলীনে ধোকাবাজি, আলেমে দারিদ্র ও লোভ, বিচারকে মিথ্যাবাদিতা, জ্ঞানীতে ক্রোধ, বৃদ্ধে নির্বুদ্ধিতা ও ব্যভিচার, ডাক্তারে রোগ, গরীবে অহংকার এবং ধনীতে কার্পণ্য।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ

কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।" *(আহমদ ২/৩২০, আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৩৭০৯নং)*

বিশেষ করে গরীব আত্মীয়কে দান দিতে বখীলী করলে তার জন্য রয়েছে পৃথক শাস্তি।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি 'শুজা' নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিভ বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

শেখ সা'দী বলেন, দুই ব্যক্তি চরম কষ্ট ও পরিশ্রম করে অথচ তাতে নিজে উপকৃত হয় না; প্রথম হল সেই ব্যক্তি যে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করে অথচ (কার্পণ্য করে) নিজে খায় না। আর দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি যে ইল্ম শিক্ষা করে তার আলোকে নিজের জীবনের অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে না।

তিন ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বাদ পায় না; কৃপণ, মূর্খ ও পাগল। কারণ, বখীলের মাল যত বেশীই হোক, আসলে সে কিন্তু ফকীর। সে নিজেও খায় না, আর অপরকে খেতেও দেয় না।

পক্ষান্তরে সুখী মানুষের নিদর্শন এই যে, তার আয়ু লম্বা হলে লালসা কমে যায়, তার ধন যত বেশী হয় তত সে দান করে। যত তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তত সে বিনয়ী হয়। পক্ষান্তরে দুঃখী মানুষের চিহ্ন এই যে, তার আয়ু যত লম্বা হয় তার লালসা তত বৃদ্ধি পায়। তার ধন যত বৃদ্ধি পায় তত সে বেশী কৃপণ হয়। আর যত তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ততই সে বেশী অহংকারী হয়ে ওঠে।

বখীলের চিন্তা বড়, ধন কিরূপে বাঁচবে। সে গরীবকে দান দেবে না, পরন্তু আল্লাহর হাওয়ালা দিয়ে তাকে বিদায় করবে। এক বখীল ফকীরদের জ্বালায় অন্য গ্রামে ঘর করল। দরজায় ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইল। বখীল বলল, ঘুরে দেখ। আল্লাহর কাছে রুযী চাও। দ্বিতীয় ভিক্ষুক এলে তাকে বলল, ঘুরে দেখ। আল্লাহই রুযীদাতা। তৃতীয় ভিক্ষুক এলে বলল, ঘুরে দেখ বাবা! আল্লাহই যাকে ইচ্ছা রুযী দিয়ে থাকেন। রাত্রিবেলায় বখীল তার মেয়েকে বলল, এ গ্রামে ভিক্ষুকের বাড় খুব বেশী, এ গ্রামে বাস করা ঠকা। মেয়ে বলল, আব্বা! ভিক্ষা যদি ঐ হয়, তাহলে ক্ষতি কি আমাদের?

বখীলের ধন ভূতে খায়। এরা সেই লোক যাদের ব্যাপারে বলা হয়, 'খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে, তার ধন খায় চোরে আর পরে।' আর সাধারণতঃ 'বখীল বাপের উড়ুনি বেটা'ই হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ কৃপণের মৃত্যুর পর তার ওয়ারেস সেই ধন উড়িয়ে দেয়। অথবা কোন যালেম তার ধন ছিনিয়ে নেয়। অথবা কুপ্রবৃত্তিবশে নিজেই সে মাল অসৎপথে নষ্ট করে ফেলে। অথবা কোন খারাপ মাটিতে গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে তাতে ধন নষ্ট করে ফেলে। অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা ধ্বংস হয়ে যায়। অথবা বড় রোগে পড়ে চিকিৎসায় তার অর্থ খরচ হয়ে যায়। অথবা এমন জায়গায় রাখে যেখানে থেকে তা নষ্ট অথবা চুরি হয়ে যায়।

'বুখ্ল' শব্দটিতে 'বা'-এ রয়েছে বালা-মসীবত, 'খা'-এ রয়েছে খাসারা (খেসারত) বা

ক্ষতি এবং 'লাম'-এ রয়েছে লা'নত বা অভিশাপের প্রতি ইঙ্গিত।

বখীল সেই গাধার মত, যে নিজের পিঠে মণিমুক্তা বহন করে। কিন্তু খায় সে শুকনো ঘাস ও খড়। থাকতে যে খায় না, তার মুখে ছাই। আর না থাকতে যে খেতে চায়, তার মুখেও ছাই।

বখীলদের ব্যাপারটাই অবাক হওয়ার মত। গরীব হওয়াটাকে তারা পছন্দ করে না। ধনী হয়ে জীবন-যাপনও করতে চায় না। গরীবের মতই কালাতিপাত করে। অথচ পরকালে তাকে ধনীর মতই হিসাব দিতে হবে!

বলা বাহুল্য, বখীল মন নিয়ে দুনিয়া করলে সুখ পাবে না বন্ধু! যতটা পার উদার হও, দানশীল হও। তোমার ভাতের চাল থেকে এক মুঠি তুলে রাখলে তো আর তোমার ও তোমার পরিবারের ভাত কম হয়ে যাবে না। তাছাড়া আল্লাহর ওয়াদা তো রয়েছেই, দান করলে তিনি বর্কত দেবেন। এ ছাড়া ফরয যাকাত তো তোমাকে দিতেই হবে।

সন্দেহ ও কুধারণা

মনে ও সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ হল, কারো প্রতি কুধারণা, অনুমান ও আন্দাজ করে কোন কথা বলা বা মন্তব্য করা।

মানুষ অনেক সময় আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণ করে। আর তখন আল্লাহর নারাজ হন। যেমন অনেকে ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করবেন না, আল্লাহর দ্বীন মিটে যাবে, ইসলামের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে মুছে যাবে, মুসলমানরা চিরদিন দুশমনদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাবে, পুনরুত্থান, কিয়ামত-হিসাব-বিচার হবে না, আল্লাহ এত সকল মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম নন, আল্লাহর সন্তান আছে, মসীবতে কোন মঙ্গল নেই, মানুষকে মসীবতে ফেলার পিছনে আল্লাহর কোন হিকমত নেই, আল্লাহ খামাখা মানুষকে বিপদে ফেলেন, আল্লাহ হয়তো তাকে কঠিন আযাব দেবেন, বিশ্ব সৃষ্টির পিছনে কোন হিকমত নেই, আল্লাহ ধনীকে ধনী ও গরীবকে গরীব করে এবং পথপ্রাপ্তকে পথপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টকে পথভ্রষ্ট করে ইনসাফ করেননি, কিছু বিষয় আছে যা আল্লাহর অজানা, আল্লাহ দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের মত, তাঁর বিচারে পার পেতে হলে উকীল বা অসীলা ধরতে হবে, আল্লাহ তার দুআ শুনবেন না, আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন না, কাবীরা গোনাহ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে, যে কেউ তাঁর দরবারে সুপারিশ করবে এবং তাঁর সুপারিশবলে বেহেশ্ত্ চলে যাবে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তা কম, সে আরো বেশী পাওয়ার অধিকারী, ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিবিধ ধারণা যে অমূলক ও অন্যায় এবং তা যে একেবারেই মূল্যহীন সে কথা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ

সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের কোনই মূল্য নেই। *(সূরা নাজম ২৮ আয়াত)*

উক্ত শ্রেণীর কিছু ধারণা হল জাহেলী যুগের জাহেল মানুষদের। সে কথা আল্লাহ বলেন,

﴿ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ ﴾

অর্থাৎ, একদল লোক নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিল। তারা প্রাগ-ইসলামী অজ্ঞদের মত আল্লাহ সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করছিল; তারা বলছিল, আমাদের কি কিছু করণীয় আছে? বল, সমস্ত বিষয় আল্লাহরই অধীন। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৪ আয়াত)*

সাধারণতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে যারা কুধারণা রাখে তারা হয় কাফের, না হয় মুনাফিক। আর তার জন্য তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী; যারা আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাদেরকে (তিনি) উচিত শাস্তি দেবেন। মন্দ পরিণাম ওদের জন্য, আল্লাহ ওদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তা কত নিকৃষ্ট আবাস! *(সূরা ফাত্হ ৬ আয়াত)*

উক্ত ধারণাবলীর মধ্যে এমন কিছু ধারণা আছে, যার ফলে মানুষ ধ্বংসগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। *(সূরা ফুস্সিলাত ২২-২৩ আয়াত)*

চিরবিদায়ের তিন দিন পূর্বে মহানবী ﷺ বলে গেছেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না মরে।" *(মুসলিম ২৮৭৭, আবূ দাঊদ)*

আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখলে সুফল, নচেৎ কুধারণা রাখলে কুফল পাবে বান্দা। আর সে জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি--।" *(বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)*

বিপদের সময় অধৈর্য হয়ে আর্তনাদ করা বৈধ নয়। কারণ, তাতে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়,

আল্লাহর প্রতি কুধারণা প্রকাশ পায় এবং দুশমনরা তা দেখে হাসে। আর এ জন্যই বিপদের সময় ধৈর্য ধরা এবং নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজেব।

কোন কিছুকে অমূলকভাবে অশুভসূচক বলে ধারণা করাও আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখার নামান্তর, আর অবশ্যই যার কোন তাসীর নেই, তাতে কোন তাসীর আছে বলে বিশ্বাস রাখা শির্ক। তাতে মানুষের মনে খামাখা ভয়, আশঙ্কা, উদ্যমহীনতা সৃষ্টি হয়। অশান্তি আসে মনে অকারণে। আর এ জন্য ইসলামে তা নিষিদ্ধ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৪৩৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয় মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।" *(আহমদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)*

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ বলেন, আমার মতে তাওয়াক্কুল হল, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখার নাম।

বলা বাহুল্য, আল্লাহর উপর আস্থাশীল মুসলিম কোন বস্তু বা ঘটনা বিশেষকে অশুভ লক্ষণ বলে মানে না। তার অন্তরে থাকে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা। কোন কিছুকে অশুভ ধারণায় সে কোন কাজে পিছপা হয় না। কোন বছর, কোন মাস কোন দিনই তার অশুভ নয়। কোন স্থান, প্রাণী বা ব্যক্তি বিশেষের কারণে কোন অমঙ্গল আসে না।

মঙ্গলামঙ্গল তো আল্লাহরই হাতে, তাঁর ইচ্ছাতেই এসে থাকে। তাই সে বলে না ও বিশ্বাস রাখে না যে, অমুক মাসে বিবাহ নেই, অমুক দিনে ধান দিতে নেই, বাঁশ কাটতে নেই, যাত্রা নেই ইত্যাদি। সকাল বেলায় অমুক দেখলে সারাদিন অমঙ্গলে কাটে। অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় অমুক করলে অমুক হয় ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কপাল চাঁদা হলে অশুভ ধারণা, কুকুরের কান্নাসুরে ডাক শুনে বা দাঁড় কাকের 'কা-কা' শুনে কোন দুর্ঘটনা বা আচমকা বিপদ আসন্ন ভাবা, কারো এক চক্ষু দেখলে ঝগড়া হবে ভাবা, বামচক্ষু লাফালে নোকসান হবে মনে করা মুসলিমের জন্য উচিত নয়। এ রকম অমূলক ধারণা করলে মানুষের মনে অমূলক ভয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে সৃষ্টি হবে মানসিক অশান্তি।

পক্ষান্তরে সময়ে কোন ভালো ও হৃদয়ের উৎফুল্লতাদায়ক কথাকে শুভ লক্ষণ বলে মানতে পারে। কারণ, তাতে তার মনোবল দৃঢ় হয় এবং কাজে উৎসাহ পায়। *(হাকেম)* উদাহরণ স্বরূপ একজন কোন অফিসে চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র পেশ করেছে। কিন্তু তা মঞ্জুর বা গৃহীত হবে কি না তা নিয়ে তার মনে খুবই সংশয় সঞ্চিত হয়েছে এবং তার ফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। সেই উদ্দেশ্যে যাবার পথে ঐ বিষয়ের কোন ভারপ্রাপ্ত

অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হল। তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, 'মনযুরুল হক।' তখন তার শুভ ধারণা হল যে, নিশ্চয়- আল্লাহ চাইলে তার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। অনুরূপভাবে সঙ্কট ও সমস্যার পথে কোন স্থানের নাম সমাধানপুর শুনলে সমাধানের আশা করা, ব্যবসার পথে মুনাফার কথা শুনলে লাভ হওয়ার আশা করা নিন্দনীয় নয়। কারণ, এতে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা হয় এবং কাজে উদ্যম পাওয়া যায়।

অশুভ বা কুলক্ষণীয় যদি কিছু হয় তবে তা, গৃহ, স্ত্রী এবং ঘোড়া। *(মুসলিম ২২২৫নং)* কিন্তু এসবও কুলক্ষণীয় নয়। অথবা এ সবের কুলক্ষণ বলতে বাহ্যিক ক্ষতির কথা ধরা যায়। যেমনঃ-

স্ত্রীর কুলক্ষণ ঃ সে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম থাকে, অথবা তার স্বভাব-চরিত্র মন্দ হয়, অথবা ঘরের লোকের সাথে তার বনে না, সংসারে চোখ-কান করে না, অথবা খরচ ও অপচয় করে বেশী, অথবা স্বামীর মনমত চলতে চায় না, স্বামীর মনকে খোশ করতে পারে না - করার চেষ্টা করে না, স্বামীর উন্নতির পথে বাধা দেয়, তার (স্ত্রীর) বেশী রোগ-বালা হয় ইত্যাদি।

গৃহের কুলক্ষণ ঃ সঙ্কীর্ণতা ও প্রতিবেশীর কদাচরণ এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ ঃ তার পৃষ্ঠে চড়তে না দেওয়া ও মন্দ আচরণ করা প্রভৃতি।

কোন বস্তু বিশেষকে অশুভ বা কুলক্ষণীয় বলে মানা বা বিপদ আসার কারণ মানাতে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হয়। অথচ মুসলিম আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে আদিষ্ট হয়েছে। তাই কিছু দেখে বা শুনে বিপদের আশঙ্কা না করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং আল্লাহ তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন না -এই ধারণা করাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা। অন্যথা কুধারণা ও পাপ।

মানুষের প্রতিও সুধারণা রাখা ইসলামের বাঞ্ছনীয় কর্তব্য। কারণ, ধারণা সব সময় সঠিক হয় না। আর সঠিক না হলে এবং ধারণাবশে অপরের বদনাম করলে অবশ্যই তা মহাপাপ।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান করা পাপ এবং তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---" *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

মুসলিমদের ব্যাপারে কুধারণা না রেখে সুধারণা রাখাই আবশ্যক। কোনও ত্রুটির কথা কর্ণগোচর হলে তার উত্তম কোন ব্যাখ্যা খোঁজা উচিত। যাকে আমরা ভাল লোক বলে জানি, সে হঠাৎ করে মন্দ হয় কি করে? এমনও তো হতে পারে যে, সে মন্দ নয়; বরং মন্দ ও নোংরা হল আমাদের মন।

মা আয়েশার চরিত্রে যখন মুনাফিকরা কলঙ্ক রটিয়ে দিল, তখন কিছু মুসলিমের মনেও তাঁর

প্রতি কুধারণা পোষণ করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের জন্যই বলেন,

﴿ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, 'এ তো নির্জলা অপবাদ।' *(সূরা নূর ১২ আয়াত)*

অনেক সময় কুধারণা প্রকাশ করে মানুষ আহাম্মকি ও বোকামির পরিচয় দেয়। যেমন, ট্রেনে একজন আলেমকে রোজার দিনে খেতে দেখে, অথবা বহিরাগত কোন আলেমকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায না পড়তে দেখে অনেকে তাঁকে বেআমল আলেম ধারণা করে বদনাম করে থাকে। অথচ তিনি মুসাফির। আর মুসাফিরের জন্য সে সুযোগ আছে।

কেউ কোন লোককে দেখল যে, সে এশার সুন্নতের পর বিত্‌রের নামায পড়ে না। তা দেখেই কুধারণাবশে তার বদনাম করতে শুরু করে দিল। অথচ লোকটি তাহাজ্জুদগুযার; সে ফজরের আগে বিত্‌র পড়ে।

একজন পুরুষ একজন যুবতীকে পাশে বসিয়ে রিক্সায় যাচ্ছে। তা দেখে নোংরা মনের মানুষরা ভাবে, ওরা হল প্রেমিক-প্রেমিকা। অনেক ক্ষেত্রে এই কুধারণায় শয়তান তাদের সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে যারা ভালো মনের মানুষ তারা মনে করে, হয় তারা ভাই-বোন, না হয় বাপ-বেটি যাই হোক।

কুধারণায় পড়ে অনেকে নিজেকে নিজে অপমানিত করে। যে নিজে চরিত্রহীন বেশীরভাগ সেই অপরের চরিত্রে সন্দেহ করে থাকে। 'আমি যেমন, দুনিয়া তেমন। আপনি যেমন ঢেমন, জগৎকে দেখি তেমন' -এর আচরণ হয় তার।

কুধারণার বশবর্তী হয়েই অনেক সময় বন্ধুকে শত্রু মনে করা হয়। অথচ বন্ধুত্বে সন্দেহ বা কুধারণা স্থান পেলে বন্ধু হারাতে হয়। বিশ্বাসে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়, সন্দেহে দুর্বল। যেহেতু বিশ্বাসের সঙ্গে সন্দেহ করা অবিশ্বাসেরই নামান্তর। অতএব নিছক অনুমান ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কারো সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম অথবা ছিন্ন করা কোন মুসলিমের উচিত নয়।

কুধারণায় ভালো লোককে মন্দ মনে করা হয়, সংসারে গৃহযুদ্ধ বাধে, ভায়ে-ভায়ে জায়ে-জায়ে দ্বন্দ্ব লাগে। এই কুধারণাই কলহ-বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে শান্তিপ্রিয় মানুষদের মাঝে।

সংসারে স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি চারিত্রিক কুধারণার জন্ম নিলে তা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে দাম্পত্য-সুখ ধ্বংস করে ছাড়ে। স্ত্রীর মনেও কুধারণা সাংসারিক সুখের বিল্ডিং-এ ফাটল সৃষ্টি করে। দাম্পত্য নষ্ট করে অনেক কুধারণাই। বস্তুতঃ বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে, আর অবিশ্বাস জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

বলা বাহুল্য যে, গুপ্ত অসন্তোষ রাখা তথা কুধারণাবশতঃ কারো প্রতি কোন রায় পোষণ করা উচিত নয়। কুধারণার সৃষ্টি হলে স্পষ্ট বোঝাপড়া হওয়া উচিত। ভুল ভেঙ্গে গেলে সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়।

পরন্তু যাদেরকে নিয়ে মন্তব্য হবে বলে আশঙ্কা হয় তাদেরও উচিত, সন্দেহকারীদের সন্দেহ ও মনের ভুল ভেঙ্গে দেওয়া।

একদা রাত্রিকালে সফিয়্যাহ (রাঃ) ই'তিকাফরত স্বামী মহানবী ﷺ-কে মসজিদে দেখা করার জন্য এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি বাসায় ফিরতে গেলে মহানবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। পথে আনসারদের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তারা লজ্জায় অন্য দিকে ফিরে গেল। মহানবী ﷺ বললেন, "ওহে! কে তোমরা? শোন। আমার সাথে এ মহিলা হল (আমারই স্ত্রী) সফিয়া বিন্তে হুয়াই।" তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?' মহানবী ﷺ বললেন, "আমি বলছি না যে, তোমরা কোন কুধারণা করে বসবে। কিন্তু আমি জানি যে, শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত করে দেবে।" *(বুখারী, মুসলিম ২১৭৪নং)*

যেমন ভালো লোকের জন্য উচিত নয় এমন জায়গা বা লোকের কাছে যাওয়া, যেখানে বা যার কাছে গেলে সাধারণতঃ তার প্রতি কুধারণা জন্মাতে পারে। মন্দলোকের সাহচর্য ভালো লোকদের প্রতি কুধারণা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। আর মুমিনের জন্য উচিত নয়, নিজেকে নিজে অপমানিত করা।

অনেক সময় সুধারণা বিপদের কারণ হয়। শত্রুর ব্যাপারে সুধারণা রাখা নিশ্চয়ই ভালো নয়। স্ত্রী-সন্তানের ব্যাপারে সব সময় সুধারণা রাখলে এবং আসলে তারা খারাপ হয়ে গেলে ফল বিপরীত হতে পারে। বাঘের মাঝে ছাগ ছেড়ে বাঘের প্রতি সুধারণা নিশ্চয় বোকামি, পর পুরুষদের মাঝে মহিলাকে চাকরী বা শিক্ষার জন্য ছেড়ে দিয়ে সুধারণা রাখা নিশ্চয় আহাম্মকি। কোন পর পুরুষের প্রতি সুধারণা রেখে তাকে নিজের স্ত্রী-ভগিনী-কন্যার মাঝে বেপর্দায় আসা-যাওয়া করতে দেওয়া অবশ্যই ঢিলেমি। আর তার ফল নিশ্চয় ভাল নয়।

"না কর ধারণা শূন্য রহে প্রতি বন,
থাকিতেও পারে ব্যাঘ্র করিয়া শয়ন।"

অন্যদিকে বিপদে অশুভ ধারণাটাই মা-বাপের মনে আগে আসে। কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রতি কুধারণা হয়। বিপদের সময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে বিপদ হবে না এই আশা করতে হয়।

কিছু ধারণা আছে, যা মানুষ উল্টভাবে ধারণা করে থাকে। তার সে অনুমান বিপরীত হয়ে যায়। কখনো বা ভালোকে মন্দ, আবার কখনো মন্দকে ভালো বলে ধারণা করে থাকে। এতে ফলও হয় বিপরীত। এমন ধারণা থেকেও দূরে থাকতে হবে মুসলিমকে। কারণ, তাতেও তার ক্ষতি হবে নিশ্চিতভাবে। মা আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক এল। কলঙ্ক আসা আমাদের ধারণাতে অবশ্যই খারাপ। কিন্তু সেই খারাপে ছিল ভালো সে কথা আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ﴾

অর্থাৎ, যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। *(সূরা নূর ১১ আয়াত)*

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

﴿ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যা পছন্দ কর না, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

﴿ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তাহলে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তা অপছন্দ করছ। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

কে জানে মানুষের জন্য কে উত্তম? কোন্ আত্মীয় তার জন্য উপকারী? সুধারণা বা কুধারণায় আর তো কেউ ভালো-মন্দ হয়ে যায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা তো জান না তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। *(সূরা নিসা ১১ আয়াত)*

কে জানে ছেলে ভাল, না মেয়ে ভালো? আল্লাহর ইলমে যেটা ভালো সেটাই বান্দার জন্য ভালো। যেটা ভাগ্যে আসে, সেটাকেই ভালো মনে করে বরণ করে নিতে হয়। ইমরান-পত্নী গর্ভজাত সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় বায়তুল মাকদেসের খিদমতে দেবার নযর মানলেন। মনে মনে ছিল ছেলে-সন্তান হবে এবং সেই হবে খিদমতের উপযুক্ত।

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ আল্লাহ সম্যক্ অবগত সে যা প্রসব করেছে। আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়। *(সূরা আলে ইমরান ৩৬ আয়াত)*

অর্থাৎ, যে ছেলে আমি চেয়েছিলাম সেই ছেলে এই মেয়ে অপেক্ষা উত্তম নয় যাকে আমি ভূমিষ্ঠ করেছি। কারণ, যেটা আল্লাহ দিয়েছেন সেটাই ভালো বলে জানতে হবে।

অতএব মেয়ে হলে অথবা বেশী ছেলে-মেয়ে হলে তোমার ক্ষতি হবে, তুমি কষ্ট পাবে, তুমি গরীব হয়ে যাবে এ সব কুধারণা আসলে আল্লাহর প্রতি। মুমিনের উচিত নয় এ ধরনের ধারণা রাখা।

পরিশেষে বলি, নিজের প্রতিও সুধারণা রেখো না যে, তুমি আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ, তুমি সবার চেয়ে ভালো লোক, তোমার মত আর কেউ নেই ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনি সাবধানীকে সম্যক্ জানেন। *(সূরা নাজ্ম ৩২ আয়াত)*

শান্তিপ্রিয় বন্ধু আমার! জেনে রেখো যে, কুধারণা করার যে ক্ষতি, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি তা প্রকাশ করায়। অতএব কারো প্রতি কুধারণা যদি হয়েও যায়, তবুও তা মুখ ফুটে অথবা

আকার-ইঙ্গিতে অথবা আচার-ব্যবহারে খবরদার কারো কাছে প্রকাশ করো না।

মান-অভিমান

অনেক সময় প্রিয়জন বা প্রত্যাশিত ব্যক্তির ত্রুটি বা অনাদরজনিত মনোবেদনা বা ক্ষোভ তোমার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানলে তুমি হয়তো দুঃখিত হবে। কিন্তু তাতে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয়। কারণ, যা ঘটা স্বাভাবিক তা ঘটতে দেখে অথবা যা পাওয়ার অধিকারী তুমি নিজেকে মনে কর তা আসলে তোমার প্রাপ্য না হলে তাতে তোমার দুঃখ হওয়ার কথা নয়।

মনে কর তুমি একটি লোককে প্রাণ থেকে উপদেশ দিলে বা নসীহত করলে। কিন্তু সে তোমার উপদেশ বা নসীহতকে অগ্রাহ্য করল। এখন তাতে তুমি যদি মন খারাপ কর, তাহলে কেন? তুমি কে? তুমি কত বড় মান্যগণ্য মানুষ যে, তোমার কথা লোকে অবশ্যই মানবে? তোমার হেদায়াত (নির্দেশ) লোকে না মানলে দুঃখ কিসের? হেদায়াত কি তোমার হাতে আছে?

তুমি তো দূরের কথা। মহানবী ﷺ চেয়েছিলেন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করুক। কিন্তু অনেকে তা করল না। মহানবী ﷺ তাতে দুঃখিত হলেন, আফশোস করতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে কখনো বললেন,

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনি তাকে হেদায়াত করতে পারেন না, যাকে আপনি পছন্দ করেন। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। আর তিনি হেদায়াতের অনুসারীদেরকে সম্যক জানেন। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৬ আয়াত)*

কখনো বললেন,

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, কাউকে যদি তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকর্ম করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করো না। তারা যা করে নিশ্চয় তা আল্লাহ জানেন। *(সূরা ফাত্বির ৮ আয়াত)*

কখনো বলেছেন,

﴿ فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। *(সূরা কাহাফ ৬ আয়াত)*

কখনো বলেছেন,

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেষ্টা মাত্র। ওদের কর্ম-নিয়ন্তা নও। *(সূরা গাশিয়াহ ২১-২২ আয়াত)*

কখনো বলেছেন,

﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝٤٨ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং ইউনুসের মত অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ-আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রার্থনা করেছিল। *(সূরা ক্বালাম ৪৮ আয়াত)*

আবার কখনো বলেছেন,

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ۝٣٥ ﴾

অর্থাৎ, যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আনআম ৩৫ আয়াত)*

অতএব বন্ধু আমার! তোমার দেশের লোক যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে তাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করো না; বরং ধৈর্য ধরে সহ্য করে নাও। তুমি ক্ষোভ প্রদর্শন করবে কিসের ভিত্তিতে? তুমি নিজেকে কি এত বড় মনে কর যে, তোমাকে কেউ কষ্ট দেবে না? মহানবী ﷺ সগোত্রের লোকের কাছে কষ্ট পেয়েছিলেন বলে দুঃখ করে বলেছিলেন, "সেই জাতি কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে, যে তাদের নবীকে রক্তাক্ত করে!" কিন্তু তাঁর এই কথার জবাবে আল্লাহ কি বলেছিলেন শোন,

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ۝١٢٨ ﴾

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে তোমার কিছু করণীয় নেই। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। কারণ তারা অত্যাচারী। *(সূরা আলে ইমরান ১২৮ আয়াত)*

প্রিয়জনের নিকটে অভিমান করলেও বড় দুঃখ পেতে হয়। প্রত্যাশিত ব্যক্তি তোমাকে সালাম না দিলে, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে ইমামতি করতে না দিলে, কেউ আসন না ছাড়লে, সীট না দিলে, কেউ তোমার প্রতি বেআদবী করলে, যথার্থ কদর না করলে তুমি তাতে অভিমান করো না বন্ধু! আর জেনে রেখো যে, 'পীর মানে না গাঁয়ে, পীর মানে না মায়ে। পীর মানে না গরুতে, পীর মানে না জরুতে (স্ত্রীতে)।'

কথায় আরো বলা হয় যে, মানুষ তিন জায়গায় বোকা হয়ে থাকে; আয়নার সামনে, স্ত্রী ও শিশুর কাছে।

চোখের পানির মর্যাদা যার কাছে নেই তার কাছে চোখের পানি ফেলা বৃথা। বেআদবের কাছে আদবের আশা করা ভুল। কাফেরের কাছে সম্মানের আশা করা দুরাশা। যে রাগ মিটায়

না তার কাছে রাগ করা, যে অভিমান মানায় না তার কাছে অভিমান করা আহাম্মকি।

হযরত আলী বলেন, ৪টি আচরণ মূর্খের; এমন লোকের উপর অভিমান করা, যে তাকে মানাবে না। এমন লোকের কাছে বসা, যে তাকে নিকট করে না। এমন লোকের নিকট অভাব প্রকাশ করা, যে তার অভাব পূরণ করে না। আর এমন কথা বলা, যা তার নিজের বিষয়ীভূত নয়।

সম্মানলোভী বন্ধু আমার! সম্মান আল্লাহর দান। সম্মান আল্লাহর কাছে অনুসন্ধান কর এবং তা মুমিনদের নিকট থেকে পাওয়ার আশা কর। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসলে, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে। তা বলে আল্লাহকে যারা ভালোবাসে না, তারা কি তোমাকে ভালোবেসে সম্মান দিবে ভেবেছ? কোন দিন না।

কিছু লোক আছে অভিমান করে মান নিতে চায়। তুলে না দিলে খেতে চায় না। দুদিন আগে না বললে দাওয়াত নেয় না। প্রশংসা না করলে খোশ হয় না। এমন অভ্যাস নিশ্চয়ই ভালো নয়। অতএব অভিমান ছেড়ে স্বাভাবিক মানুষ হও এবং মনের আঙিনা থেকে সকল প্রকার আমিত্বকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। তাতে তুমি সুখী হবে।

গুজবে থেকো না

শান্তিপ্রিয় বন্ধু আমার! যদি শান্তি চাও, তাহলে জনরবের কোন কথায় কান দিও না। বিশেষ করে কোন খারাপ বিষয়ে কে কি বলেছে ও বলছে সে বিষয়ে নানা বাচ-বিচারে থেকে অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং বিভিন্ন খোশগল্পে আসর মাত করা বড় বিপজ্জনক কর্ম শান্তির পরিবেশে। গুজবে কান দিয়ে বহু ভাল মানুষও ঠকে থাকে। পরের কথার খাল কেটে অশান্তির কুমির ডেকে আনে জীবনে। আর সে জন্যই আমাদের দ্বীন আমাদেরকে এমন কাজে বাধা দান করে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, (ঘৃণিত করেছেন এবং আমি নিষিদ্ধ করছি) তিনটি কর্ম ঃ জনরবে থাকা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা।" *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪৯১৫নং)*

তদনুরূপ রটা খবর রটিয়ে বেড়ানো এক প্রকার মানুষের স্বভাব। তাতে কোন প্রকার বিচার-বিবেক ও সত্য-মিথ্যা পরখ না করে বর্ণনা করতে এবং সত্বর অপরের কানে পৌঁছে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না এই শ্রেণীর লোকেরা। ফলে অনেকে 'কে বলেছে হুই তো মস্ত মোটা রুই' শুনে আগা-গোড়া না ভেবে প্রচার করে। দাদা বলতে গাধা শুনে গরম হয়। চিলে কান নিয়েছে শুনেই কানে হাত দিয়ে না দেখে চিলের পশ্চাতে ছুটতে শুরু করে। অনেক সময় হুযুরের কাছে 'বিয়ায হারাম হ্যায়' শুনে 'পিয়ায হারাম হ্যায়' ধরে নিয়ে পিয়াজ হারামের ফতোয়া প্রচার করে হুযুরের কান্ডজ্ঞানহীনতা প্রচার করে এক শ্রেণীর বেঅকুফ মানুষ।

যার ফলে তাদের পরিণাম লাঞ্ছনা ও আক্ষেপ ছাড়া কিছু হয় না। আবার এমন লোকেরা সত্যবাদী হলেও মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়। তাইতো উড়ো খবর না উড়িয়ে তা বিচার করে দেখা দূরদর্শী জ্ঞানী লোকের কাজ। বিশেষ করে সে খবর যদি ফাসেক ও কাফেরদের তরফ

থেকে উড়ে তবে।

আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই (অনুমান দ্বারা) তার পশ্চাতে পড়ো না। কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়; ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।" *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।" *(সহীহুল জামে৪৩৫৬, ৪৩৫৮নং)*

ইবনে অহহাব বলেন, আমাকে মালেক বলেছেন, "জেনে রাখ যে, যে মানুষ প্রত্যেক শ্রুত কথাই বর্ণনা করে সে নিরাপদে থাকে না এবং যা শোনে তাই বর্ণনা করলে সে কস্মিনকালেও ইমাম হতে পারে না।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)*

প্রকাশ যে, কোনও হাদীস পড়া বা শোনা মাত্র বর্ণনা করা এবং সহীহ-যয়ীফ না বুঝে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়াও ঐ গুজব রটানোর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এমন 'শুন মৌলবী ও শুন-মুফতী'র সংখ্যাই সমাজে অধিক। তাই মতভেদ ও বিপত্তিও অনেক। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এরই কারণে। এরই কারণে আজ আলেম সমাজ বদনাম নিয়ে লাঞ্ছনার শিকার।

অনুরূপভাবে ভিত্তি ও সূত্রহীন সন্দিগ্ধ কথা 'ওরা নাকি বলেছে, ওরা মনে করে, ধারণা করে' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা অশান্তি ডেকে আনার একটি পথ। বলা বাহুল্য, একমাত্র সুনিশ্চিত সত্য কথা ব্যতীত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কথা বা ঘটনা বর্ণনা ও প্রচার করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "'ওরা মনে করে' (এই বলে কোন কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা!" *(সহীহুল জামে ২৮৪৩নং)*

আর একথা বলো না যে, 'যা রটে, তার কিছু না কিছু বটে।' কারণ, তোমার অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝতে পার যে, 'যা রটে, তার কিছুই নয়ও বটে।'

উদাহরণ স্বরূপ মা আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক রটার খবর দেখ, তার কিছুও কি সত্য ছিল? তোমার ইসলামের কথা ভেবে দেখ, তোমার দুশমনরা তার নামে কত শত কলঙ্ক ও অপবাদ রটিয়ে থাকে, তার একটাও কি সত্য বটে?

বিজাতি-নিয়ন্ত্রিত প্রচার-মাধ্যমের প্রচারে তুমি যদি কান দিয়ে যা শুন তাই প্রচার কর, তাহলে তোমার নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারা হবে না কি?

কেন দুশমনের কথায় কান দিয়ে নিজের ভাইকে প্রহার করবে? কেন তোমার শত্রুর প্ররোচনায় পড়ে নিজের স্ত্রীকে নির্বিচারে আঘাত করবে অথবা তালাক দিবে? কখন তুমি চিনতে পারবে তোমার শত্রু ও তার দুরভিসন্ধিকে?

বিজাতির অপপ্রচারে তুমি নিজেকে ও নিজের ভাইকে নিকৃষ্ট মনে করে বসো না। শত্রু কি কখনো বিপক্ষের মঙ্গল চায়? বিজাতি কি মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণ পছন্দ করে? অতএব সে কি ইসলামের স্বার্থে কিছু বলবে ভেবেছ। বরং ইসলাম ও তার অনুসারীর ভাবমূর্তি বিকৃত করার জন্য সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। অতএব তুমি কি সতর্ক হবে না

বন্ধু?

তর্ক করো না

তর্ক ভালো জিনিস নয়। তর্কে সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ। কথায় কথায় তর্ক সাধারণতঃ অহংকারীরাই করে থাকে। পক্ষান্তরে শান্তিপ্রিয় নরম মানুষরা তর্ক পরিহার করে চলে। কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তর্কাতর্কি না করে বিনয়ের সাথে হক বর্ণনা করে। তর্ক এড়িয়ে সত্য জানিয়ে দেয়। কেউ তা না মানলে বিবাদে যায় না। আর এতে বজায় থাকে শান্তি।

দুটি মানুষের মন এক হতে পারে না। মেজাজ ও পছন্দ এক এক জনের এক এক রকম। সে ক্ষেত্রে মতবিরোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা বলে তা তর্কের পর্যায়ে যাবে, তা ঠিক নয়।

অবশ্য সত্যের স্বার্থে হকের সপক্ষে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার্থে বিতর্ক করা নিন্দিত নয়। তবে সে তর্ক হবে মার্জিত ভাষায়, সজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা, নম্র ও ঠান্ডা-মেজাজে। কিন্তু এর বিপরীত তর্কাতর্কি, অর্থাৎ বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করে অন্যায় প্রতিষ্ঠার্থে অথবা অজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতার সহিত তর্ক করা নিন্দনীয় এবং হারাম। বিশেষ করে আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ।

তর্ক-বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করাও বৈধ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা উলামাদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম।” *(সহীহ তারগীব ও তরহীব, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৬)*

ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, ‘তিন উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না; মূর্খদের সহিত বিতর্ক, উলামাদের সহিত বিতন্ডা এবং নিজেদের দিকে মানুষের মুখ ফিরাবার উদ্দেশ্যে। তোমাদের কথা দ্বারা আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা কর। কারণ সেটাই চিরস্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকবে এবং তাছাড়া সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে।” *(দারেমী ১/৭০)*

তর্ক ভালো জিনিস নয় বলেই প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “সৎপথে থাকার পর যে সম্প্রদায়ই ভ্রষ্ট হয়েছে তাকে প্রতর্ক দেওয়া হয়েছে।” অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করলেন, (যার অর্থ), “এরা কেবল বাগ্‌বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে, বস্তুতঃ এরা এক বাগ্‌বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।” *(সূরা যুখরুফ ৫৭, মুসনাদ আহমদ ৫/২৫২, ইবনে মাজাহ ১/ ১৯, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১০৩)*

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অত্যাধিক ঝগড়াটে ও অত্যন্ত কলহপ্রিয়।” *(বুখারী, মুসলিম)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “--যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।” *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৬১৯৬নং)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক বর্জন করে আল্লাহর রসূল ﷺ তার জন্য জান্নাতে এক গৃহের জামিন হয়েছেন। তিনি বলেন, “আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন হচ্ছি সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে, জান্নাতের মাঝে এক গৃহের জামিন হচ্ছি তার জন্য যে উপহাস ছলেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং জান্নাতের সবার

উপরে এক গৃহের জামিন হচ্ছি তার জন্য যার চরিত্র সুন্দর হয়।" *(আবু দাউদ ৪/৩৫৩)*

ফালতু ও বৃথা হুজ্জতের কারণ হল, হুজ্জতকারীর গর্ব, অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ। অথবা নিজের ইল্‌ম, বিদ্যা ও অনুগ্রহ জাহির। অথবা অন্যায়ভাবে অপরের অপমান ও কষ্ট কামনা। মুসলিম এগুলি থেকে বাঁচতে পারলে শান্তির সংসার লাভ করতে পারবে।

অনুরূপভাবে বৈধ নয় কোন বিষয়ে তর্কালোচনার সময় স্বমত বিরুদ্ধ কথা শুনে চট্ করে রেগে উঠে অশ্লীল ও অমার্জিত কথা বলা। কারণ এতে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আর তা ছাড়া এমন গুণ হল মুনাফিক (কপট)দের। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক--- (তন্মধ্যে একটি হল), তর্কের সময় অশ্লীল বলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ছোট-বড় যেই হোক, কারো সাথে তর্ক করো না; শান্তি পাবে, সুখী হবে তুমি।

কোন আহমক লোকের সাথে তর্কে জড়িয়ে যেও না বন্ধু, নচেৎ তোমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে। আরবী কবির উপদেশ শোন; তিনি বলেন,

إذا نطق السفيه فلا تجبه   فخير من إجابته السكوت

অর্থাৎ, কোন আহমক যখন কথা বলে, তখন তুমি তার উত্তর দিও না। তার কথার উত্তর দেওয়ার চাইতে চুপ থাকাই উত্তম।

তোমার থেকে সম্মানে যারা নীচে, তাদের সাথেও তর্ক করো না, তাদের ছোট কথায় উত্তর দিয়ে নিজের সম্মান নষ্ট করো না। মূর্খ ও মাতালের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে রেগে উঠে তুমি নিজেকে অপমানিত করো না।

'যদি কোন ছোট লোক বড় কথা কয় হে বড় কথা কয়,
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে কভু ভাল নয়।
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে প্রতিনাদ করে,
লক্ষ্য নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে ফেরু ডেকে মরে।'

আর উলামাগণ নসীহতে বলেন, 'তুমি কোন ধৈর্যশীল বা আহমকের সাথে তর্ক করো না। কারণ, ধৈর্যশীল তোমাকে পরাজিত করবে এবং আহমক তোমাকে ক্লিষ্ট করবে।

কোন বচনবাগিশ আর মূর্খের সাথে খবরদার তর্ক করো না। কারণ, প্রথমোক্তের কাছে তুমি পরাজিত হবে এবং দ্বিতীয়োক্তের কাছে হবে অপমানিত।'

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন বলেন, 'কারো সাথে হুজ্জত করো না। কারণ, হুজ্জত দ্বীন নষ্ট করে দেয় এবং হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।'

এ ব্যাপারে শেখ সা'দী নসীহত করে বলেন, 'মূর্খের সহিত তর্কযুদ্ধ বা বাকযুদ্ধ করার মানেই হল পাথরের উপর হাত দ্বারা আঘাত করা। হাতই ক্ষত-বিক্ষত হবে, পাথরের কি হবে? কারণ, তা তো নির্জীব।

জ্ঞানী যদি মূর্খের মোকাবিলায় পড়ে তবে তার নিকট থেকে সম্মানের আশা করা ঠিক নয়। আর কোন মূর্খ যদি জ্ঞানী লোকের মোকাবিলায় (তর্কে) জিতে যায়, তবে আশ্চর্যের কিছু নয়। কারণ, পাথরের আঘাতে মোতির বিনাশ সহজেই হয়ে থাকে।

একটি মূল্যহীন পাথর যদি সোনার বাটি ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তাতে পাথরের কোন প্রকার মূল্য বৃদ্ধি হয় না এবং সোনারও কোন প্রকার মূল্য হ্রাস হয় না।

মূর্খদের মজলিসে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা না চললে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নয়। কারণ, ঢাকের শব্দের কাছে তবলার শব্দ বিলীন হওয়া এবং রসুনের দুর্গন্ধের কাছে ধূপের সুগন্ধ বিলুপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

একজন মূর্খ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে তর্কে হারিয়ে দিলে সে আস্ফালন করতে থাকে। কিন্তু তার এ কথা জানা নেই যে, ঢাকের ঢপঢপে শব্দের মাঝে মোহন বাঁশীর সুর বিলীন হয়ে যায়।

মোতি যদি নর্দমায় পড়ে যায়, তবুও তা মূল্যবানই থাকে। কিন্তু পাথর যদি আকাশে উঠেও যায়, তবুও তার কোনও মূল্য নেই।'

অতএব সাবধান! সৌজন্যমূলক তর্কেও জড়িয়ে যেও না বন্ধু। আর মূর্খ বা আহমকের সাথে কোন তর্কই করো না। আল্লাহ তোমাকে শান্তিতে রাখুক।

আবেগাপ্লুত হয়ো না

বিপক্ষের কাছে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে যেমন সুমতি হারিয়ে এবং সুবুদ্ধি উড়ে গিয়ে সঠিক জবাব অথবা উচিত কর্তব্য নির্বাচন করতে মানুষ অক্ষম হয়, ঠিক তেমনি আবেগে আপ্লুত হয়ে হুঁশ হারিয়ে কর্তবাকর্তব্য নির্ণয় করতেও সক্ষম হয় না।

আবেগে পড়ে অতি ভক্তি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবেগে অন্ধ মানুষ সঠিক পথের দিশা পায় না। কোন ব্যক্তি বা জামাআতের ব্যাপারে কেবল আবেগ বশে এক তরফা অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করা এবং তারই কুফল স্বরূপ অন্য ব্যক্তি বা জামাআতকে নিজের দুশমন বা বিরোধী মনে করা জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। আর যার আবেগ উদ্বেলিত, তার জ্ঞান বহির্ভূত।

আবেগ-উচ্ছ্বাস সত্যকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয়। হককে হক রূপে চিনতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আবেগের সাথে যদি কিতাব ও সুন্নাহর লাগাম না থাকে, তাহলে মুসলিমের আবেগ ঝড়ের বেগ ধারণ করে সম্মুখের বহু কিছু ধ্বংস করে ছাড়ে।

আল্লাহর হাবীব ﷺ যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন এ সত্যকে উপলব্ধি ও স্বীকার করতে সক্ষম হলেন না হযরত উমার। হাবীবের প্রতি পরম ভক্তি রেখেই চরম আবেগে তাঁর বিরোধী মতাবলম্বীকে হত্যা করার ধমকি দিলেন। তরবারি তুলে বললেন, 'যে বলবে যে, তিনি মারা গেছেন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

কিন্তু পরক্ষণেই যখন কুরআনের আয়াত শুনলেন তখন তাঁর আবেগ দূর হয়ে গেল এবং সত্যকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন।

অতএব সৎসাহসী বন্ধু আমার! মনের কুপ্রবৃত্তি ও আবেগ বশে নয়; বরং তুমি কুরআন ও হাদীসের আনুগত্য বশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হও, তবেই শান্তি পাবে।

পরমতাসহিষ্ণুতা

সমাজে বাস করার সময় নানা মুনির নানা মত পরিলক্ষিত হয়। প্রতিকুল মতের সাথে একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হয় মানুষকে শান্তি বজায় রাখার জন্য। সামঞ্জস্য না হলে হয় আদেশ ও উপদেশের মাধ্যমে মত পরিবর্তন করে সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে

হবে। না হয় বিরোধী মত চোখ বুজে সয়ে নিতে হবে এবং মনে-প্রাণে সেই মতকে ঘৃণা জেনে তা হতে দূরে থাকতে হবে।

প্রয়োজনবোধে শান্তি বজায় রাখার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকারও করতে হবে। অবশ্য তারও একটা সীমা আছে। শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে মুমিন ঈমান কুরবানী দিতে পারে না। বেঈমান জীবনের কোন মূল্য নেই। অতএব ঈমান অপেক্ষা মুমিনের জান মূল্যবান হতে পারে না।

বল বন্ধু, কেউ যদি তোমাকে বলে যে, তোমার গায়ের শালটা আমাকে ভালো লাগে না। শালটা খুলে দাও, নচেৎ আমাদের সাথে তোমার হবে না।

তুমি তোমার প্রয়োজনে শাল খুলে দিয়ে সমাজকে মানিয়ে নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পার। একটু ঠান্ডা লাগলেই বা কি করবে বল? ঠান্ডা দূর করার অন্য ব্যবস্থা নিতে পার।

পরক্ষণে জামা খুলতে বললে এবং পরিশেষে গেঞ্জিটাও খুলতে বললে তাও হয়তো শান্তির কথা ভেবে মেনে নিতে পার। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে যদি তোমাকে তোমার পায়জামা বা আন্ডার প্যান্টটাও খুলে দিতে বলে, তাহলে তুমি কি করতে পার বল? তারপরেও যদি কেও তোমার জান চায়, তাহলে কি করবে বল?

তোমার রক্ত দিয়ে যদি কেউ আনন্দের হোলি খেলতে চায়, তোমার চামড়ার জুতো বানিয়ে যদি কেউ ফতোগিরি দেখাতে চায়, তাহলে তার সাথে শান্তি বজায় রাখবে কিভাবে বল?

অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য ঈমান গোপন রেখে মুমিন জান বাঁচাতে পারে। যদি কাউকে জোরপূর্বক কুফরী অথবা শির্কের উপর মজবুর করা হয়, তাহলে যদি তাতে সে মুখে ও অন্তরে সম্মত ও রাজী হয়ে যায় তবে সে মুরতাদ্ ও কাফের। কিন্তু হত্যা বা কষ্ট ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য যদি সে শুধুমাত্র মুখে বাহ্যিকভাবে সম্মত হয় এবং অন্তর আল্লাহর ঈমান ও ভক্তিকে পরিপূর্ণ ও অবিচলিত থাকে, তাহলে সে কাফের হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর প্রতি কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে। আর তার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত থাকে তার কথা ভিন্ন। *(সূরা নাহল ১০৬ আয়াত)*

অন্যায়ের সাথে আপোস করে শান্তির কোন মূল্য নেই। মনের ভিতরে অশান্তির ছাই চাপা আগুন রেখে মুখে শান্তির বহিঃপ্রকাশ কতদিন করতে পার?

তাগূতের সংসারে বসবাস করে নির্দ্বিধায় তাগূতের শাসন মেনে নেওয়ার মানেই হল নিজের স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের অস্তিত্বে বিলীন হওয়া। আর একমাত্র আল্লাহর গোলামি ছাড়া গায়রুল্লাহর গোলামিতে কোন শান্তি নেই, থাকতে পারে না বন্ধু।

বিবাদ দূর করে শান্তি আনার লক্ষ্যে তুমি তোমার মূলধন ঈমান এবং ইসলামী আদর্শের স্বকীয়তা হারালে নাকের বদলে নরুন পেয়ে কি খুশী হতে পারবে?

কলহ আসার ভয়ে শির্ক ও বিদআতকে দৃষ্টিচ্যুত করে কেবল ফযীলত এবং মাসায়েল (হারাম-হালাল) উপেক্ষা করে কেবল ফাযায়েল প্রচার করে দাওয়াত কিসের দাওয়াত? যেখানে মূল ভিত্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হল না, সেখানে আমল ও ইবাদতের গগণ-স্পর্শী ইমারত তুলে লাভ কি বন্ধু?

আম্বিয়াদের প্রারম্ভিক দাওয়াত ছিল তাওহীদের। আমল ও ইবাদতের মূল বুনিয়াদই হল তাওহীদ। অতএব তা ব্যতিরেকে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে গোড়া কাটা রেখে আগায় পানি ঢেলে লাভ কি বন্ধু? সতর খোলা রেখে মাথার পাগ নিয়ে এত সযত্নতায় ফল কি আছে বল? যে বাম হাতে মদ খাচ্ছে তাকে তা ডান হাতে খাওয়ার ফযীলত শিখিয়ে লাভ কি? সাপে কাটা রোগীর ফোঁড়ার চিকিৎসা আগে করলে রোগী বাঁচবে কি বন্ধু?

পরিবেশে বাস করার ব্যাপারে তুমি মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ কর। তিনি যে সমাজে যেভাবে বসবাস করেছেন, সেই সমাজে ঠিক সেইভাবে বসবাস কর, তাহলেই শান্তি পাবে।

তুমি যদি মক্কী সমাজে বাস কর, তাহলে তোমার নীতি হোক সূরা কাফেরূন। যে সূরার সুরে সুর মিলিয়ে তুমি বল,

"বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।"

এই অর্থে তুমি ধর্মনিরপেক্ষ হলে হতে পার। যদি তুমি ঈমান রাখ যে, ইসলামই শেষ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এ ধর্মের অনুসরণ ছাড়া কারো মুক্তি নেই। তবে ধর্মকে কারো ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। কেউ তা না মানলে এবং মক্কী সমাজে তার সাথে পাশাপাশি বাস করতে হলে তার সাথে কোন বিবাদ থাকার কথা নয়। মাদানী সমাজেও শুরুর দিকে ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বাস করেছিলেন আমাদের নবী ﷺ ও তাঁর সহচরগণ।

আর খবরদার! ধর্মহীনতার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ো না। ধর্মহীন জীবন লাগামহীন ঘোড়ার মত। সে জীবনের কোন মূল্য ও সুখ নেই বন্ধু।

আর সে অর্থেও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ো না, যে অর্থে বলা হয়, 'বর্তমানে যে কোন একটি ধর্মের অনুসরণ করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে।' কারণ, এতে তোমার ঈমান থাকবে না।

মক্কী সমাজে বাস করলেও হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না। নিজের সুন্দর চরিত্র নিয়ে মাথা উঁচু করে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করো।

অপরাধ না করে অপরাধ স্বীকার করে নিও না অথবা পাঁচ জনের বলাতে নিজেকে সত্যই অপরাধী বলে বিবেচিত করো না। যারা হিংসা ও বিদ্বেষবশে তোমার ইতিহাস বিকৃত করে তোমার বদনাম করতে চায়, তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। আর যদি অতীতে কোন জালেম জুলুম করেই যায়, তাহলে তার জন্য গোটা জাতির দোষ হবে কেন?

মা তোমার, মাটি তোমার। মা ও মাটির মায়া ত্যাগ করে পরাজয় বরণ করে নিও না। তুমি বহিরাগত নও। তুমি এই মাটির, তোমার পূর্বপুরুষরাও এই মাটির। ওদের থেকে তোমার পার্থক্য হল তুমি ঈমান এনে সত্যকে বরণ করেছ। তোমার পিতৃপুরুষ বহিরাগত হলেও

তোমার মা তো এ দেশেরই। তবে কি মায়ের কোন অধিকার নেই ওদের কাছে? বলা বাহুল্য, যে মাতৃভূমিতে তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে, সেই ভূমির বুকে বুক ফুলিয়ে বেঁচে থাক এবং মাথা উঁচু করে তারই স্নিগ্ধ কোলে মাথা রেখে মরণ বরণ কর।

মাতৃভূমির মান রক্ষা করতে তুমিও প্রাণ দিয়েছ, রক্ত দিয়েছ। অতএব তাতে তোমারও সমান অধিকার আছে। এ কথা অবুঝদেরকে বুঝিয়ে তোমার নিজের অধিকার নিজে প্রতিষ্ঠা করে নাও।

তুমি তোমার আখলাক-চরিত্রে অপরকে মুগ্ধ করে এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়ে দাও যে, তুমিই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের অধিকারী। তুমি কারো শত্রু নও, তুমি সন্ত্রাসী বা দেশদ্রোহী নও। দেশের নাগরিক হিসাবে যে অধিকার সকলে পাবে তুমিও তা পাওয়ার অধিকারী। 'রোটী-কাপড়া-মাকান' ও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক দেশবাসীর। যেমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আছে দেশবাসীরও।

ইসলামের প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদ ও সন্দেহ দূর কর। না জেনে মানুষ অপরের প্রতি কুধারণা রাখে। সন্দেহ ও কুধারণার অবসান ঘটলে মানুষ সেই অজানাকে ভালোবাসতে লাগে।

মানুষ একে-অপরকে না জেনে আপোসে বিদ্বেষ ভাব রাখে। একে-অপরকে জানতে শিখ। তোমার স্বরূপ অপরকে জানিয়ে দাও। যে ভুল বুঝে তোমাকে নিজের শত্রু মনে করে তার ভুল ভেঙ্গে দাও।

ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা কর মুখে, লিখে ও ব্যবহারে। তোমার চরিত্রে যেন আকর্ষণ থাকে এবং বিকর্ষণ না থাকে।

সমাজে বসবাস কর নিজের জীবনের মূলধন ঈমানী আদর্শ বজায় রেখে। তোমার জীবনের নীতি হোক ঃ-

- ❖ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করব।
- ❖ কোন সৃষ্টিকে ভয় করব না।
- ❖ কোন সৃষ্টিকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করব না।
- ❖ কারো প্রতি অন্যায় করব না।
- ❖ কারো কাছ থেকে অন্যায় মেনে নেব না।
- ❖ হক দ্বারা বাতিলের খন্ডন করব।
- ❖ আর এ সবের পশ্চাতে সর্বপ্রকার ধৈর্যধারণ করব।

আদর্শ মানব হও তুমি এ ভূবনে
ইহ-পরকালে চিরসুখী হও মনে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.